নিশিলতা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

শৈব্যা পুস্তকালয়
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রকাশক ঃ
রবীন বল
৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
অমিয় ভট্টাচার্য

প্রথম প্রকাশ ঃ
শ্রীপঞ্চমী, মাঘ ১৩৭১

মুদ্রক ঃ
ফিনিক্স প্রিন্টার্স
২, চোরবাগান লেন,
কলকাতা ৭০০০০৭

নিশিলতা

॥ এক ॥

লোচন আজ দারুণ অবাক হয়ে গেছে। তাই তার চোখে ঘুম নেই।

ওদিকে নিশি ঘুমের জন্য মধ্যরাত অব্দি এপাশ ওপাশ করছে। কারণ এই ঘুমটা পেরোলেই সকাল এসে যাচ্ছে। তারপর…ভাবতে গলা সুড়সুড় করে। বুকে পেটে কেমন শিরশির করে কাঁপন লাগে। আর সেই কাঁপন এলে আরও জড়োসড়ো হয়ে নিশি বিনোদিনীর গায়ে হাত রেখেছে চুপিচুপি। পিসি শান্তভাবে ঘুমোচ্ছে। ওই যে কী বলে, ভালুকজ্বর— মাঝেমধ্যে একটু আধটু হয়, কিন্তু সময় এলে তখন কোথায় কী—দিব্যি ফিটফাট মাজাঘষা শরীরটি নিয়ে ছটোপুটি, ব্যস্ততা—অরে অ লোচন, গাড়ি আসতে দেরী হচ্ছে কেন? কোন অনামুখোকে বায়না দিয়ে এলি বল দিকি? ইদিকে বেলা দুপহর গড়িয়ে গেল—বাবা শ্যামচাঁদ কষ্ট হচ্ছেন…

লোচন ফিকফিক করে হাসে। লুকিয়ে নিশিকে বলে—শ্যামচাঁদের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। আসলে দিদির ঘরে রইতে মন উচাটন, বুঝলি রে নিশি? এই বলে একটা জুতসই উপমা দেয় সে—আমার দিদিটি হচ্ছেন তোমার মশাই, মাছ…জলের মাছ। ডাঙায় থাকলে ধড়ফড় ছটফট, জলের পানেই চোখদুটি, জলবাগে মনের টান…

ওই রকম করে বলে লোচন আব মেয়ের কাছে সায় চায়। সায় না দিয়ে উপায় নেই। আস্ত জন্মদাতা বাপ। কিন্তু ওদিকে পিসিটি স্বয়ং কালী করালী নৃমুণ্ডমালিনী, লোলজিহ্বা বিস্তার করেই আছেন। তাতে মরসুম এসে গেলে তিনি তো ধরাছোঁয়ার অতীত—যেন একশো ঢাকীর সুমুখে তাধৈ তাধৈ নৃত্য করার তালে। হাঁকডাক দাপটে নিশি যত অস্থির, তার বাপ লোচনও ততখানি। তখন নিশিও ফিকফিক করে হাসে আর লুকিয়ে লুকিয়ে বাপকে বলে—পিসির চোখে ঘোর লেগেছে গো।

বিনোদিনীর চোখে সত্যি সত্যি ঘোর লাগে। তখন কোথায় জ্বর, কোথায় খুসখুসে কাসি-সর্দিপিত্তি-অম্বল, গাড়ির ওপর ছইয়ের ঠিক মুখটিতে বসে ঘোরলাগা চোখে দেখতে দেখতে যায়। অন্য কী দেখার আছে? ওই মাঠঘাট গাছপালা নদী, গ্রাম-গ্রামান্তর, ওই আকাশ, সবখানে একই। একই রোদ বাতাস, পাখিপাখালির কূজন, পথচারী মানুষের কণ্ঠে হঠাৎ চিনেফেলার একই আনন্দ···মেলায় চললে বুঝি, অ বিনোদপিসি!

বিনোদিনীও সুখ পায়। মুচকি হাসে শুধু। সঙ্গে লোচন থাকলে ঠারেঠোরে বলতে চায়, তুই আমাকে ঘরে বসে থাকতে বলিস ছোঁড়া। দেখ দিকিরে, ঘরে কী সুখ, ঘরে কী পাই। বাইরে আমার রাজ্যি, সাতরাজার রাজত্ব। কত লোক চেনে, কথা কয়, হাসে, ভালোমন্দর খবর দেয়-নেয়, আবার মনের দুঃখটি জানিয়ে দুদণ্ড চোখের জলও ফেলে যায়। বলে, পিসি, তুমিই আছো, তাই জানালাম। আর কারে জানাই, কে বোঝে মনের ব্যথাটি···

কিন্তু সমুদ্রে কত বৃষ্টি হয়, সমুদ্র কি বৃষ্টির ফোঁটা গুণে হিসেব রাখে, না আলাদা করে চিনে রাখার সাধ্যি তার? আর ছাখো, আকাশেও রোদের হিসেব নেই। রোদবৃষ্টির মতো লক্ষ লক্ষ হাসি-কান্নার রঙ নিয়ে বেঁচে আছি। আমার মধ্যে তারা একাকার। লক্ষ লক্ষ মুখ একটি মুখ হয়ে রয়েছে। আর ওই মুখে শুধু একটি ডাক, একটি মিষ্টি আপ্যায়ন, পিসি, এলে তাহলে!

হাঁ রে বাছা, এলাম। না এসে উপায় কী!

তাই মনের গরবে গরবিনী বিনোদিনী ছইয়ের সুমুখে বসে থাকে। আর কিছুতে লক্ষ্য নেই। লক্ষ্য দূর মাঠের প্রান্তে ধূসর হয়ে জেগে আছে ঈশানদেবের মন্দির চূড়া।—যার চারপাশ ঘিরে প্রাঙ্গণে মেলার জগতটা মায়াময় হয়ে আছে। লোচন তখন আড়চোখে দিদির মুখটি লক্ষ্য করে। কিন্তু হাসতে গিয়ে পারে না। কেমন শ্রদ্ধাভক্তি কেমন সসম্ভ্রমে চুপচাপ থাকতে ইচ্ছা করে। জীবনটা তো চোখের ওপর এই করেই কাটাল। এখন বিনোদিনীর চুল পেকেছে, দাঁত নড়বড় করছে, আর কটা দিনই বা বাকী!

কিন্তু বড্ড ভয় করে তার। মেলা থেকে হঠাৎ যদি খবর আসে, দিদি ওইখানেই চোখ বুজেছে! হাতে আধোসাজা পানের খিলি, হঠাৎ ঢলে পড়েছে কৌটোর থাকের ওপর···বড় কষ্টে লোচনের ইচ্ছে করেছে, সঙ্গে থাকে-টাকে আজকাল। মুখ ফুটে বলেছেও সে। কিন্তু উপায় তো নেই,

এই নিশি, নিশিটা যে ক্রমে ক্রমে গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়াল। চোখের উপর সেও কবে কবে রঙধরা ডাগর গাছটি হয়ে উঠল—বাপ হলেও চেয়ে চেয়ে দেখতে লজ্জা করে। তাতে মেয়েমানুষের যৌবনটা তার নিজের কাছে কাল বই নয়। নিশিও তো সেটা টের পেয়ে গেছে। ছলছল কলকল করে যে দুরন্ত ছোট্ট নদীটি বইছিল, এখন সে ভরা ভাদরের থমকে-ওঠা জল নিয়ে কিছু স্তব্ধ কিছু গাঢ় আর রহস্যময়ী। সকল উচ্ছ্বাস যেন কোথায় বাধা পেয়ে তাকে ধীরস্থির শান্ত করে তুলেছে। বাপ হলেও এটা বুঝতে পারে লোচন, আর দিদির সঙ্গে মেলায় থাকার সাধ সম্বরণ করে। বলে—যখন যাবার সুযোগ ছিল, তখনই যাইনি, তো এখন!

তা এবার আর সঙ্গে লোচন এগিয়ে দিতেও যাচ্ছে না। ভিটেয় একতালা ইটের ঘর উঠছে। দেখাশোনা তদ্বির তদারক রয়েছে। লোচন এতদিনে ঘরের সুখে আটখানা। দু কামরা ঘর, একটা রান্নাঘর—পায়খানা আর টিউবওয়েলও হবে। চারপাশে উঁচু পাঁচিল ঘেরা থাকবে—চোর ডাকাতের ভয় রয়েছে। ধনদৌলত কী বা আছে, বিনোদিনী বলেছিল, তবু পাঁচিলটা উঁচু করে দিবি লোচন। কারণ,...কারণ ওই নাম, বিনোদের কাঁড়ি কাঁড়ি জমানো টাকা! মুখপোড়াদের মুখে তো আর ট্যাকসো নেই, বলে ভুবনপুরের বিনোদ পানের খিলি বেচে লাখ-দুলাখ কি আর ন জমিয়েছে? মর্ অনামুখো পাষণ্ডরা! আজ বিশপঁচিশ বছর মেলায়-মেলায় ঘুরে আমার হাড়মাস কালি হয়ে গেল। সেটা কেউ দেখলিনে তোরা?

একটা ঠাকুরঘরও থাকবে—এই রকম ইচ্ছা বিনোদিনীর।

লোচনের হাতে টাকার থলি গুঁজে দেওয়া। লোচন খুব হিসেব করে খরচ করছে সেকারণে। আর কিছু না হোক, ঠাকুর ঘর কিন্তু আগে ভাগে বানানো চাই। গতকাল সাদা পাথর আনতে শহরে গিয়েছিল। ছোট্ট একটুকু মেঝে—চারখানাতেই হয়ে গেছে। কুলিখরচ এক পয়সাও দেয়নি সে। নিজের মাথায় চাপিয়ে বাসে উঠেছিল। মাথায় চাপিয়ে ঘরেও হাজির করেছে। রুদ্রদেবের কৃষ্ণা শিব চতুর্দশীর মেলা শেষ করে দিদি দু'একদিনের জন্যে ঘরে ফিরবে আবার। তখন লোচন ফের শহরে যাবে। গঙ্গাজল আনবে, কাঠ কুঁদে তৈরী শ্যামচাঁদ আনবে। কিছু আয়োজনও করা হবে তখন। এক পালাকীর্তনের বায়নাও ইতিমধ্যে দেওয়া হয়ে গেছে স্বরূপপুরের মনোহর দাসকে।...

তা যখন হবে, তখন হবে। এদিকে এই সবে পূর্ণিমা গেল। এখন থেকেই রানীচকে রুদ্রদেবের মন্দির প্রাঙ্গণ কেন্দ্র করে চারপাশের ফাঁকা মাঠটায় মেলার দোকানপাট গড়ে উঠছে। ছ হাত চার হাত জায়গার বায়না দেওয়া হয়েছিল আগেভাগে। গাড়ী পৌঁছলেই লোকজন ডেকে একবেলার মধ্যে বিনোদিনীর ছোট্ট দোকান চিরচেনা রূপটি পেয়ে যাবে। সেই দুহাত উঁচু মাচার ওপর তক্তপোষ, পেতলের প্রকাণ্ড বারকোষ, অসংখ্য কৌটো, ডাইনে বাঁয়ে কাঠের তাক—তাতে রঙীন কাগজ মোড়া, আর জায়গা বুঝে বড়ো বড়ো ছবি। ঠাকুরদেবতাও রয়েছেন, পাশাপাশি সুন্দরী মেয়েমানুষও আছে। বেশ একটা স্বপ্নের পট মেলে বসে থাকা যেন। পেছনদিকে চটের পর্দা—তারপর বিনোদিনীর ছোট্ট অন্দরমহলটুকু। উনুন, হাঁড়ি থালাবাসন গুটিকয়, বিছানা আর বাকসো। সবগুলো তক্তপোষের নীচে ঠেলে দেওয়া হয়। দরকার হলে বের করে। ওদিকে একটা খিড়কী থাকে—সেখানেও চটের পর্দা। ঘুমোবার সময় একখানা করগেট টীনে বন্ধ করে ঘুমোয়।

ওই ঘরখানিই আসল ঘর বিনোদিনীর। করগেট টীনের খাঁচা বই নয়—তবু বড় সুখ। ওই সুখ নিয়ে চুলে পাক ধরাল, দাঁত নড়বড়ে হয়ে এল। আর ওই ঘরখানি সঙ্গে নিয়ে দেশ থেকে দেশান্তর, মেলায় মেলায়, কোলাহলে আলোয় আনন্দে ঘোরলাগা চোখে ফেরা। লোচন বলে—আমাদের ঘরে মন ভরবে কেন দিদির? আমরা যে-ঘরে বাস করি, তার শেকড় আছে গাছের মতো। আর আমরা হলাম, সে গাছের লতা। আর লতারও শেকড়ের কমতি নেই। কিন্তু দিদির? ওর ওসব বালাই নেই। এইরকম করে উপমা দিয়ে লোচন কথা বলে। আরও বলে—পক্ষীরও একটা বাসা থাকে। দিদি; দিদি পক্ষীও নয়…

সুতরাং এই যে একতলা দালান বানানো হচ্ছে, তা বিনোদিনীর নিজের জন্য নয়। লোচনের জন্যও নয়। কারণ তার আর কী! বৌ—মানে নিশির মা, কবে চোখ বুজেছে—মনেও পড়ে না, মনে হয় চিরকাল একা-একা কাটাচ্ছে। ওই নিশিটাকে মনে হয় আকাশ থেকে খসে পড়া। কিংবা, কিংবা দিদি কোন মেলা টেলা থেকে কাকে কুড়িয়ে এনে লোচনকে জিম্মা দিয়েছে।

লোচন বেশ বোঝে, ঘরখানা নিশির জন্যেই। লোচনের আর বিয়ের সাধ নেই। আধ পাগলা মানুষ—বেশ কাটাচ্ছে। তার কোন আলাদা ভবিষ্যত নেই। কিন্তু নিশির রয়েছে। এইসব আঁচ করে লোচন মনে মনে

আজকাল একটা ঘরজামাই হবার যোগ্য ছেলে খুঁজছে। অবশ্য, দিদির মত ছাড়া সে কিছু করে ফেলবে এমন নয়। সে ভেবেছিল, সময় হলে দিদিই তাকে এ নিয়ে বলবে-টলবে। মেয়ে এদিকে রঙলাগা শরীরখানি নিয়ে চোখের সমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে—সময় কবে হবে, কে জানে।

অথচ লোচন এবার দারুন অবাক হয়ে গেছে।

বিনোদিনী নিশিকে এবার থেকে মেলায় নিজের কাছে রাখতে চায়।

এ বড় আশ্চর্য। নিশি কতবার কান্নাকাটি করেছে সঙ্গে থাকবার জন্যে। বিনোদিনী চোখ পাকিয়ে তেড়ে এসেছে। মুখ ভেঙে দেবো আঁটকুড়ি মেয়ের! মেলায় থাকবো…থাকার হুজ্জতী তো জানো না! ধিঙ্গি মেয়ে হয়েছ, হাজারটা রাক্ষস মেলায় ঘুর ঘুর করছে, নোলায় টসটস করে জল ঝরছে, আস্ত গিলে খাবে জানো না বুঝি? আরও আশ্চর্য, হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঢোক গিলেছে সে। লোচন আর নিশি উভয়ে লক্ষ্য করেছে, বিনোদিনী যেন চোখের জল লুকোতে চায়—মুখ ফিরিয়ে বলেছে—অনেক আগলে রেখেছি নিজেকে। এই করতেই আমার গায়ের রক্ত কালি হয়ে গেল সারা জীবন। আবার একটা আগলে রাখো, সামাল দাও…দায় পড়েছে আমার! অরে লোচন, মেলা দেখতে এসেছিস, দেখেই সঙ্গে করে নিয়ে যা ছুঁড়িকে। এ মহাপাপের জায়গা থেকে নিয়ে পালা শীগগীরি…

পিসিটা যেন কী! রাগে দুঃখে নিশিরও কান্না পেয়েছে। কেবল লোচন ব্যাপারটা বুঝত। সে দিদির আদেশ শিরোধার্য করে মেয়েকে এটাওটা দেখিয়ে শুনিয়ে কেটে পড়ত। মেলায় বাস করেও মেলার সম্পর্কে বিনোদিনীর তাহলে অদ্ভুত একটা ভয় রয়েছে, লোচনও সেই ভয়ে আচ্ছন্ন হত। অনেক স্মৃতি তার মনে ভীড় করত তখন। অনেক মেলার ঘটনা। দিদি তখন যুবতী মেয়ে, সে ছেলেমানুষ—নিতান্ত ছেলেমানুষ…

নিশি যখন মা-মরা কচি মেয়েটি, সামলে রাখা খুবই কঠিন, ওতো মেয়েমানুষ ছাড়া কেউ পারে না, তখনও বিনোদিনী নিশিকে কাছে রাখতে চাইত না। ওকে সে পাশের সার্কাসের তাঁবুতে বাঘ-সিংহ-ভালুকের ভয় দেখিয়ে বাগ মানাত। আর লোচনকে বলত—দুঃখ করিসনে বাছা, একা হাতে খদ্দের সামলাই, না ওকে দেখি। বুঝছিস্ তো, এখন দুপয়সা রোজগারের মরশুম। বর্ষা পড়লে তখন ঠায় বসে থাকা—আমিই বা খাবো কী, তুই-ই বা খাবি-পরবি কী? রোজগারের তো কোন পথ নেই এ ছাড়া।

নি-রোজগেরে কুড়ে লোচন নিঃশব্দে চলে আসত মেয়েকে কাঁধে নিয়ে।

সবই বুঝত লোচন। দিদির নিজের জীবনে যে-নেশাটি লেগে রয়েছে; থাক্‌ ভাইঝির জীবনে তার ছোঁয়াচ যেন না লাগে। দিদি সে বলে—পাপ, এ মহাপাপের নরককুণ্ড থেকে দূরে থাকাই ভালো। সে-বলার মধ্যে কতখানি সত্য আছে, লোচন তাও তো আর কম জানে না। দিদির যখন বয়স ছিল, অনেক জেনেছে সে। দেখেছে অনেক। বিনোদ পানওয়ালির নামে অনেক কেচ্ছা দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে।

অথচ সেই দিদি কিনা আজ এতদিন পরে, নিশি যখন যুবতী হয়ে উঠেছে, রানীচকের রুদ্রদেবের মেলায় তাকে সঙ্গে নিয়ে রাখতে চায়!

আশ্চর্য, এ বড় আশ্চর্য।

সত্যি বলতে কী, লোচন এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে গতকাল সন্ধ্যা থেকে একটি কথাও বলতে পারেনি এ নিয়ে। তারপর মধ্যরাতে নিশির মতো জেগে থাকতে থাকতে সে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভেবেছিল—মরুক গে, আমার কী। গভীর দুঃখে সে আরও ভেবেছিল, আমিই বা কে, কে এই নিশিলতা, দিদি, ঘর-সংসার? আমি নিমিত্ত বই তো না। চিরকাল মুখটি বুজে থেকেছি, মুখ বুজেই থাকলাম। তা বলে নতুন বাড়িটা সে অসম্পূর্ণ রাখবে না। নিঃশব্দে কাজ করে যাবে। পরম অভিমানে সে ঘুমোবার চেষ্টা করছিল।

এদিকে নিশিও প্রথমে দারুন অবাক হয়েছিল।

পরে তার বিস্ময়টা কেটে যেতে একটু দিশেহারা ভাবনায় তার মন কেমন কাতর হয়ে উঠেছিল। পিসির গালমন্দর কথা, খুনসুটে স্বভাব বাদ দিলেও এতাদন ধরে বাবার সঙ্গে গিয়ে পর্দা তুলে একটা ভীতি-আনন্দময় আশ্চর্য জগত সে দেখে এসেছে মাত্র, প্রবেশের অধিকার পায় নি, এবার সত্যি সত্যি সে সেখানে যেতে পারছে। এটা সুখ না দুঃখের—বিহ্বল নিশির সেই ভাবনায় চোখে ঘুম ছিল না। সে মনে মনে কত রঙীন সুন্দর দৃশ্য কল্পনা করছিল। অনেক মেলার আলো হল্লা উৎসব বাজনা থরে থরে ঝরে পড়ছিল তার মনের জগতে মুঠোমুঠো ফুলঝুরির মতন—সে দুহাত ভরে কুড়োতে গিয়ে পিছিয়ে আসছিল। তবু ঘুমের জন্য কাকুতির অন্ত নেই। কারণ ঘুমের পরই সকাল। সকালে যাত্রার সময়।

তারপর কখন বুঝি একটু আচ্ছন্নতা এসেছিল—হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল নিশির। বাইরে বারান্দায় বাবা ঘুমের ঘোরে গোঙাচ্ছে···আ···রু···রু···রু...

নিশি হুড়মুড় করে উঠে ডেকেছিল—বাবা, ও বাবা…বাবা গো!

উঁ! লোচনও বিছানায় উঠে বসেছিল। তারপর তার হাসির শব্দ শোনা গেল। ধুর্‌ ছাই, কী সব কুস্বপ্ন!

নিশি বলেছিল—স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছিলে?

হ্যাঁ রে মা। কী সব, বাঘ সিঙ্গি……

নিশি কৌতূহলে প্রশ্ন করেছিল—মেলার স্বপ্ন নাকি গো?

তা বই কি। তোর পিসিমার রোগ ধরেছে…এই বলে চুপ করে গেল লোচন।

নিশি বুঝল, ফের শুয়ে পড়েছে বাবা। পাছে বিনোদিনী শুনতে পায়, তাই চুপ করে গেছে। কিন্তু পিসির আজ ঘুমটা বেশ গাঢ়। নিশি জানে, মেলায় যাবার মুখে পিসির এইরকম ঘুম লাগে। বাবার স্বপ্নটা কী রকম জানবার ইচ্ছে তার রয়ে গেল। আর কি জানা যাবে?

লোচন কিন্তু আর ঘুমোতে পারে নি। কী ভয়ংকর স্বপ্ন! নিশিকে কামড়াতে আসছে একটা খাঁচাছাড়া বাঘ, নাকি সিংহ, নাকি নিশিকে গিলে ফেলছে…সঠিক বলা কঠিন—এই ধরনের কী সব ঘটেছে আর লোচন বুক চাপড়ে কাঁদছে। বাস্তবিক ওই মা-মরা মেয়েটার প্রতি হাড়ে হাড়ে টান রয়েছে, স্বপ্নটা না দেখলে বুঝি জানা যেত না। বুকটা তখনও মোচড় দিচ্ছিল। দিদিকে কি একবার বলবে বুঝিয়ে?

বুঝিয়ে বলার অবকাশ আর পেল না।

দুদিন থেকে বিনোদিনীর একটু জ্বর দেখা দিয়েছিল। সে জ্বরকে 'জ্বর' বলে না, বলে—'জ্বালা'। আর সেই জ্বালায় জ্বলতে থাকা বিনোদিনী লোচনকে বা নিশিকেও কম জ্বালা দিচ্ছিল না। মেজাজ সতত খিটখিটে তাতে এই আপদ। উঠতে-বসতে বাপ-মেয়ে তটস্থ।

রাতের ঘুমটা কিন্তু বেশ গাঢ় হয়েছিল বিনোদিনীর।

অভ্যাস মতো উঠতে ভোর হবার কথা। সেখানে রোদ ভাসিয়ে দিল একেবারে। কুয়াসা জমেছিল ভোরের দিকে। রোদের বেলায় সব মুছে আকাশ আর গাছপালা ঝকঝকে তকতকে দেখাল। আমগাছে এবার ঘন হয়ে মুকুল ফুটেছে। লোচন ভাবছিল, রাজমিস্ত্রী আসবার আগেই গাছটার গোড়ায় খানিক আগুন জ্বেলে ধোঁওয়া দেবে নাকি। ধোঁওয়া লাগলে কুয়াসা মুকুলগুলির কোন ক্ষতি করতে পারবে না। শুকনো পাতা কুড়িয়ে

লোচন জড়ো করছিল। অন্যদিন হলে মেয়েকেও ডাকত। কিন্তু সারা রাত ধরে যাকে পর ভেবে ভেবে প্রায় জন্মশত্রুর মতো পরস্থ করে ফেলেছে, তাকে ডেকে আপন করার ইচ্ছে ছিল না।

তবু যখন লোচন দেশলাই জ্বেলেছে, দেখল নিশি কখন পিঠের কাছে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোচন একটু অবাক হয়ে আরও দেখল, নিশির চোখ দুটি কেমন ভেজা-ভেজা। কাঁদছিল নাকি? মন কেমন করে উঠল লোচনের।

সে বলল—কীরে? দিদি উঠেছে?

নিশি জবাব দিল না। অথচ বেশ বোঝা যায়, একটা কিছু বলতেই সে এসেছে এমনি করে।

শুকনো পাতাগুলি হু হু করে জ্বলে উঠল। ধোঁয়া বড় কম। এমন করে জ্বলতে দিলে তো চলবে না। জ্বলে উঠলে ফের তার ওপর পাতা চাপাতে হবে। মাঘ মাস পড়ে গেছে—তাই শিশির কিছু কম। গাছের নীচে পড়ে থাকা পাতায় তার স্পর্শ আছে বলে মনে হয় না। লোচন ব্যস্ত ভাবে চারপাশে ভেজা কিছু খুঁজছিল। খুঁজতে খুঁজতে ফের সে কতকটা অবহেলার সঙ্গে প্রশ্ন করল—কী হয়েছে রে নিশি?

নিশি একটু ইতস্তত করে বলল, তুমি রাগ করেছ, বাবা?

একবাশ ভেজা ঘাস ধরে টানতে গিয়ে থেমে গেল লোচন। চোখ দুটি বড়ো হয়ে গেল তার। শোনা কথাটা সত্যি না মিথ্যে, না মায়া না ভ্রম—সে ফের শোনার ইচ্ছায় বিড়বিড় করে বলল, কী বললি নিশিলতা?

নিশিলতা! নিশি জানে, বাপের মনে আদরগুলি বেড়ালের মতন লোম ফুলিয়ে খাড়া হয়েছে একেবারে। সে পাশেই ধুপ করে বসল। তারপর পিঠে হাত রেখে বলল, তুমি রাগ করোনি তো?

রাগ! লোচনের তলপেট অব্দি মোচড় দিল। সে বারবার ঢোক গিলছিল। ন্যায়ত ধর্মত এই নিশির সে জন্মদাতা বাপ। অথচ কী আপদ দ্যাখো, সেই যে কবে সুবাসলতা তিনদিনের জ্বরে হঠাৎ চিরকালের মতো চোখ বুজল, নিশি তখন তিন বছরের মেয়ে, মনেই হতো না বৌ তার জন্যে কাকেও রেখে গেছে ইহসংসারে। তখন লোচন বারান্দায় বসে ঝিম মেরে নানান ভাবনা ভাবে, নিশি লোরধুলো উঠোনে খেলা করে, তারপর খিদে পেলে কেঁদে গড়াগড়ি যায়। এত আলসে মানুষ, তবু উঠে মেয়েকে কোলে তোলার নাম নেই। শুধু আড় চোখে একবার তাকে দেখে ভাবে, এ কোন আপদ রে বাবা! বেশ তো ছিলাম। মধ্যে মাঝে সে ভারী অবাক হয়ে

যায়—এই মেয়েটি কে হে, এ যে দিনরাত সঙ্গ ছাড়ে না। ছায়ার মতো আঁকড়ে থাকে হা ঈশ্বর! বিনোদিনী সুযোগমত ঘরে ফিরলে তখন দশা দেখে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করত। বিনোদিনী খিস্তি করে বলত, এই যদি করবি, তবে জম্মো দিয়েছিলি কেন রে লোচ্চা? রাগ হলে তাকে লোচন না বলে 'লোচ্চা', বলত বিনোদিনী। আর 'জম্মো দেবা'র কথা শুনে লোচন ফিক করে হেসে জবাব দিত, তাইতো রে দিদি! শেষে গেলাস হাতে দুধের খোঁজে গয়লা পাড়ার ওদিকে চলে যেত লোচন।

মনে পড়ে চিকিৎসার অভাবে বিনি ওষুধে সুবাস মরে গেলে লোচন পস্তেছিল, গতরটা কেমন পাথর দিয়ে গড়া, বুঝলে গো? নড়াচড়ার সাধ্যি নেই যেন। ছাখো না, বৌটা জ্বরের ঘোরে বিছানায় পড়ে কাতরায়। একবারও দুপা হেঁটে বেচুডাক্তারের বাড়ি যেতে পারলাম না! ধিক, হারামজাদা গতোরে! বিনোদিনী তখন রূপপুরের মেলায়। এখান থেকে মাত্র ক্রোশ দুই পথ। পড়শীদের কেউ দয়াধর্ম করে তাকে ডেকে না আনলে লোচনের ঘরেই মড়া পচত, শ্যালশকুনের চেঁচামেচি শোনা যেত।

তা হাজার বলেও লজ্জা নেই লোচনের। রক্ত মাংসের তো নয়, নিতান্ত কাঠের মানুষ। মন বলে কিছু কি আছে তার?

রাগ! ফের অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল লোচন। আর সঙ্গে সঙ্গে তার হাসি পেল। পোড়া গতরে রাগ বলেও কোন পদার্থ নেই। তবে কী আছে? শুধু অভিমান। মেয়েদের মতো ওই একটা ব্যাপার সে যত্ন করে পুষেছে। অভিমানে সে বুঁদ হতে পারে। চোখে ছলছলানিও দেখা যায়। বারবার ঢোক গেলে। মনে হয়, সব কিছুতে চিরদিন সংস্কার তাকে বিষম ঠকিয়ে চলেছে। হাসতে হাসতে সে বলল—রাগ কেন করবো মা?

নিশি বাপকে চেনে। বলল—মেলা খুব খারাপ জায়গা।

বাধা দিয়ে লোচন বলল—ধুর! দিদি রাগ করে কত কী বলে। ওর কথা আবার ধরতে আছে? খারাপ হলে তোকে নিয়ে যেতে চাইবে কেন?

নিশি আদুরে মিনমিনে স্বরে বলল—কী জানি, আমার ভয় করছে।

আগুন নিভে গিয়েছিল। সেদিকে লক্ষ্য করে দ্রুত উঠে গেল লোচন। ঘাসগুলি গুঁজে ঝুঁকে পড়ল সে। ফুঁ দিতে থাকল।

নিশি পেছন পেছন উঠে এসে বলল—তুমি বারণ করবে না পিসিকে?

লোচনের মুখটা ধোঁয়ার ভেতর থেকে ফট্ করে বেরিয়ে এল। কেন রে?

জেনেশুনে তুমি আমাকে খারাপ জায়গায় পাঠাবে?

লোচন ফের হাসল। যা না একবার!' কতদিন তো সাধ করে বলতিস্ —পিসির সঙ্গে মেলায় থাকবি।

তোমার কষ্ট হবে না? রান্না করবে কে?

চিরদিন যে করেছে। এই করে তোকে এতবড়টি করলাম নিশি, আর তুই ওই ভাবনায় কষ্ট পাচ্ছিস! লোচন উঠে দাঁড়িয়ে তাকে ঠেলে দিল। যা, সেজেগুজে তৈরী হ। মেলায় থাকবি বুঝলি তো, মেলা যেমন সুন্দর জায়গা—সুন্দর জিনিস ছাড়া মেলা মানায় না!

বাবার এই কথায় যেন কী ছিল, নিশি দুঃখিতভাবে দাঁড়িয়ে রইল। পা উঠল না তার। ভেবেছিল বাবাকে খুশী করেই পিসির সঙ্গ যাবে—অথচ বাবার রকমসকম দেখে বোঝা যায়, সে খুশী হবার ভান করছে মাত্র। নিশি আরও চেয়েছিল লোচন যথার্থ বাবার মতন তাকে আটকে রাখার চেষ্টা করুক। শেষ অব্দি বাবা যে হার মানতে বাধ্য হবে, সে তো জানা কথা। শুধু একটু সাধ নিশির—হয়ত সুযোগ পেলে সব মেয়েই এমনি তুচ্ছ ছোট্ট সাধটুকু মিটিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়।

লোচন ফের তাকে ঠেলে দিলে এবার সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে একেবারে:

লোচন ব্যস্ত। আহা-হা, কাঁদবার কী আছে? ভালো না লাগলে কাকপক্ষীটির মুখে খবর পাঠাবি, তোকে নিয়ে আসবো। দিদির অবাধ্য কোনদিন হইনি...

হয়তো লোচন কোন ভান করছিল না। কিন্তু মেয়েকে এভাবে কাঁদতে দেখে সে খুবই অপ্রস্তুত হয়ে গেল। ছেলেভুলানো স্বরে সে মেলার আনন্দগুলি আওড়াতে চেষ্টা করল। বাঘ সিংহ হাতী ঘোড়া, ম্যাজিক, নাগরদোলা, দোকানপাট...আর এইসব বলতে বলতে তার রোখ চড়ে যাচ্ছিল একটু করে। নিশিকে যেমন করে হোক, মেলায় পাঠানো যেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যেই যেন সে এতদিন ধরে নিশিকে মানুষ করেছে!

ওদিকে ধনা গাড়োয়ান হাজির। গত সন্ধ্যায় সব বাঁধাছাঁদা ঠিকঠাক। ছইয়ের পেছনে করগেট টীন আর তক্তপোষ, ভিতরে অন্যান্য জিনিসগুলি—সামনে স্বল্পপরিসর জায়গা বসবার জন্যে। হিসেব করলে দুখানা গাড়ি লাগে। কিন্তু বিনোদিনী বাজে খরচের দিকে নেই। গাড়িটা সন্ধ্যা থেকে দরজার বাইরে তৈরি আছে। এখন সকালে ধনা গাড়োয়ান গরু দুটিকে সঙ্গে নিয়ে চলে এসেছে। বস্তুত, মেলায় যাবার জন্যে যতখানি সাজগোছ চিকন-

চাকন থাকা আবশ্যক, তার আকারে প্রকারে তা বেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চান করে টেরীও বাগিয়েছে।

লোচন ধনাকে দেখছিল হাঁ করে। ধুতিজামা পরা ধনা একেবারে নাতজামাইটি! হাসতে গিয়ে হাসলো না লোচন। একটু শাসনের ভঙ্গীতে বলল—ও নিশি বেলা বাড়ছে, দিদিকে তুলে দে। আর ঝটপট চান সেরে নে দিকি!

ধনার হাঁকডাকে বিনোদিনী ততক্ষণে উঠেছে। বাইরে এসে আড়ামোড়া ছাড়ছিল সে। আমগাছের এদিকে এদের দেখে সে মুখ বিকৃত করে বলে উঠল, আ মরণ, সাতসকালে ওখানে আবার কী করছিস তোরা?

নিশি চোখ মুছে এগিয়ে গেল। তার মেলায় যাবার পথ আগলে কী একটা দাঁড়িয়ে ছিল, সেটা হঠাৎ সরে গেছে কখন। গভীর দুঃখে নিশি অনুভব করছিল—জীবনে এই প্রথম সে জানল, সত্যি তার আপন বলতে কেউ নেই যেন। কেন এইরকম অনুভব, কেন এই বাধোবাধো ভাব, সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে না। অথচ কেবলই মনে হচ্ছে যে আনন্দের নামে একটা অজানা জায়গায় চলেছে, সেখানে হয়তো তার জন্য এমন কিছু অপেক্ষা করে আছে যা শুভ নয়।

লোচনের মতো—বিনোদিনী পানওয়ালীর সম্পর্কে তারও স্মৃতি বড়ো কম নেই। অনেক কিছু বোঝবার বয়স ইতিমধ্যে তার হয়েছে। সে অনেক কিছু সহজে বুঝতে পারে।

ধনা গাড়োয়ান উঠোনে একগাল হেসে বলল—অ নিশি, একখিলি পান দিতে হবে কিন্তু। দেখবো, পিসির হাতখানি কেমন পেয়েছো! নতুন হাতের নতুন পান···টেনে টেনে হাসছে ধনা।

নিশি একটু চমকে উঠে মুখ ফেরাল। নিশির হাত! পিসির মতো সেও পানওয়ালী সেজে মেলার জগতে বসে থাকবে!···তার বুকের ভিতর কোথায় একটা অব্যক্ত আর্তনাদ বুদ্বুদের মতন মিলিয়ে গেল। এতখানি তলিয়ে সে দেখে নি তো।

তবু লোচন তাকে আটকাচ্ছে না। ও কি বাপ, জন্মদাতা?...নিশি স্তব্ধ ভাবে খিড়কী দিয়ে ঘাটের দিকে এগোল।

॥ দুই ॥

রুক্ষ নগ্ন মাঠের পথে গেরুয়া ধুলো উড়িয়ে গাড়ি চলছিল। পথের দুপাশে কেয়াঝোপ। কোথাও নিঃসঙ্গ শিমূলের লাল ফুল আলো করে আছে। শীত কমে গেছে—তবু ফাঁকা মাঠের শিরশিরে হাওয়ায় মুখের ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাবটি ঘোচেনা। রোদ বেশ মিষ্টি লাগে। ছইয়ের বাইরে ঝুঁকে নিশি তাকিয়ে ছিল বাইরের দিকে। চিরুটি রেলষ্টেশনের লাল ঘরগুলি দেখা যাচ্ছে। লাইনের ফটক পেরোলে ওপাশে পাকা পীচের সড়ক। দুপাশে ঘন গাছপালা—শিরীষ বট অশথের সারি, কোথাও শিমূল কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া। দূর থেকে লাল লাল ফুল দেখা যায়। পথের ওপর গাঢ় ছায়া। পাখির ডাক। গাড়ির চাকার একটানা ক্যাঁচকোঁচ শব্দে যে ঝিমুনি লাগে, এখানে আসতেই কেটে যায়। চোখের ওপর ছায়ার নিবিড়তা ঘোর এনে দেয় রোদের মাঠ পেরিয়ে এসে। সেই ঘোর লাগা চোখে নিশি সব দেখছিল।

পিসি চুপ করে আছে। কিন্তু আলতোভাবে নিশির একখানি হাত ধরে আছে সবসময়। নিশি কথা বললে, প্রশ্ন করলে, নিঃশব্দে হেসে মাথাটা একটু দোলাচ্ছে মাত্র। ওদিকে ধনার গুনগুনের বিরাম নেই। মধ্যে মধ্যে সে ঘাড় ফিরিয়ে নিশিকে বলছে, কেমন লাগছে গো ?

কেমন-লাগাটি বুঝিয়ে বলা কঠিন। গাড়ি চাপবার সঙ্গে সঙ্গে বাধো-বাধো ভয়-ভয় ভাবটুকু কখন কেটে গেছে নিশির। বরং এখন যত পথ অতিক্রম করছে ততই অবাক লাগছে। হঠাৎ ভোরে ঘুম ভেঙে মেলায় থাকতে হবে বলে কেন যে অমন দারুণ ভয় পেয়েছিল—পেয়ে হুড়মুড় করে ছুটে বাবার কাছে ধর্না দিয়েছিল! এখন তার হাসি পাচ্ছে শুধু। পেছনে বাবাকে একা ফেলে এল, এতে কোন দুঃখের গন্ধ নেই। মনে হয়, কোথাও জলের ভিতর তলিয়ে ছিল এতদিন, আজ ভুস্ করে মাথা তুলেছে—তীরের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে সে। হাইওয়ের মসৃণ গাড়ির চাকায় আর ক্যাঁচকোঁচ শব্দ নেই। দুরন্ত চাকা দুটিও যেন স্বস্তির একটানা শ্বাস ফেলে চলেছে শোঁ শোঁ করে। বলদদুটিও লেজ নাড়ছে না—দুলে দুলে সুখে পা ফেলছে।

পথের বাঁক। বাঁকের দুপাশে কালো কালো পীচের ড্রাম উপুড় করে রাখা—গায়ে কয়েকটা খড়ির পোঁচ। ধনা বলল, গত বছর এইখানে…মনে পড়ছে পিসি ?

বিনোদিনী কৌটো থেকে পানের খিলি বের করছিল। জবাব দিল না। নিশি প্রশ্ন করল, কী ?

ধনা বলদের লেজে মোচড় দিয়ে তাড়া করল, শীগগীরী পা চালিয়ে চল দেখি যাদুমণি—ওদিকে বুঝি সব মজা ফুরিয়ে এল ! তারপর মুখ ফিরিয়ে এদিকে বলল, বুঝলে নিশিলতা, ঠিক এইখানে গাড়ি উল্টেছিল, পিসিমার কপাল·· খুব বেঁচে গেল কিন্তু…শালা ডেরাইভর ব্যাটাবা···তা এবারে আমি তৈরি আছি···টুকরো টাকরা কথায় দুর্ঘটনাটা কিছু অনুমান করা যায়।

নিশি বলল, তারপর ?

পিসিমার কপাল। লেবুতলার পেল্লাদ ঠিক সেইসময় সাইকেলে করে যাচ্ছে—দেখতে পেয়ে ছুটে এল তখুনি। দুজনে টানাটানি করে গাড়িখানা সোজা করলাম। তা পরে···

বিনোদিনী নিবিষ্টমনে পান চিবুচ্ছিল। মুখ বাড়িয়ে পিক ফেলে বলল, পেলার সঙ্গে মেলায় দেখা হবে এবারে, জানিস্ ধনা ? মনোহারী দোকান আনবে বলেছে। ছোঁড়াটাকে নেশায় ধরেছে রে…হাসতে লাগল বিনোদিনী।

নিশি বিনোদিনীর হাসির কারণ বুঝতে পারছিল না।

আরো খানিক চলে বাঁপাশে মেঠো পথ। পথ বললে ভুল হবে। ধান ওঠার পর জমির ওপর গাড়ি চলাচলের অস্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়েছে মাত্র। আল কেটে কেটে কোনরকমে একখানা গাড়ির যাতায়াত চলে। ইতিমধ্যে চাকার দাগে দুটো ধুলোয় ভরা সমান্তরাল রেখার সৃষ্টি হয়েছে মাঠের বুকে। কাটা ধানের গোড়াগুলো পিষে গেছে কবে। উঁচুনীচু এই পথে চলতে নিশির গা ছমছম করছিল—উল্টে যাবে না তো !

ফের একটা কাঁচা রাস্তা—দুপাশে ঝোপ। মধ্যে মধ্যে চেনা মুখ—বিনোদিনী মাথা দুলিয়ে মিষ্টি হেসে জবাব দিচ্ছিল। এত চেনাজানা তার ! নিশি আড়চোখে বারবার পিসির মুখটা দেখছিল। গাড়ির মুখ পূর্বে—তাই ছায়া পড়েছে পিসির মুখে। মুখখানি কেমন গভীর দেখায়—কেমন রহস্যে গাঢ়। হঠাৎ নিশির মনে প্রশ্ন ওঠে—পিসির স্বামী—তার পিসেমশায় দেখতে কেমন ছিল লোকটা ? বাবার কাছে শুনেছে পিসেমশাই খুবই নাকি খারাপ

লোক ছিল। জুয়াড়ী আর মাতাল। শেষে ডাকাতির মামলায় তার জেল হয়। জেল থেকে ফিরে আর বানবনা হয় নি। তারপর নাকি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল সে।…তবু অনেক কথা অজানা থেকে গেছে যেন। যে কথা তার বাবাও হয় তো জানে না। পিসি কি কোনদিন খুলে বলবে?

আরে—আরে বিনোদপিসি যে!

নিশি দেখল গাড়ির ঠিক মুখোমুখি পথ আগলে দাঁড়িয়ে গেছে একখানা সাইকেল। হাতাগুটানো ছাই রঙের জামা—বোতামের সোনা চকচক করছে, হাতে রিষ্টওয়াচও রয়েছে—ছুঁচলো গোঁফের নীচে চিনেফেলার হাসি। বেশ লোকটি যা হোক! একেবারে গাড়ি রুখে দিয়েছে।

বিনোদিনী বলল, আ মর্, গাড়ি আটকালি যে রে ছোঁড়া…

কেমন আছো পিসি? সেই ময়নাহাটের মেলা থেকে তো জ্বর নিয়ে গেলে…ভেবেছিলাম একবার দেখে আসবো, সময়ই পেলাম না!

বিনোদিনী মুখ ভেংচে বলল, ইস্, ভাইপোর দরদ দেখে বাঁচিনে।…তা হ্যাঁরে চণ্ডী, কমলি-কমলিরা কেমন? বিয়েটিয়ে লাগাচ্ছি নাকি? এই বলে ফোঁস করে নিঃশ্বাস টেনে নিশির গায়ে একটু খুঁচিয়ে দিল।

নিশি নড়ে বসল একটু সংযত ভাবে। চণ্ডী বলল, ওই সেই ইয়ে বুঝি? দেখেই বুঝেছি…

হ্যাঁ। আমার সেই ভাইঝিটি। নিশি, নিশিলতা।

নিশিলতা? নামটি তো বেশ। ভালোই হয়েছে পিসি, অনেক আরাম হবে তোমার। এবারে রানীচকের মেলায় দারুণ ধুমধাম হচ্ছে শুনে এলাম। লোকজনের ভীড় হবে খুব।

বিনোদিনী বলল, নিশি, তোর মনে পড়ছে বাছা, সেবারে ময়নাহাটে চণ্ডীর সঙ্গে সাইকেলে চেপে ওদের বাড়ি গিয়েছিলি? সেই যে ছু বোন, তোকে সঙ্গে করে বেখে গেল। বললি, অনেক খাইয়েছে…

নিশি মাথা নাড়ল মাত্র। মনে পড়ে না।

চণ্ডী বলল, মনে নেই। তখন ওর কত আর বয়স…সাত কি আট, আমারই ঝাপসা লাগে, ও তো নিতান্ত কচি ছিল। তারপর গলার স্বর একটু চাপা করল সে—সেই গোবরাটাকেও দেখে এলাম পিসি! শালা রানীচকে এসে গেছে।

চণ্ডী চলে গেল। বিনোদিনী একটু চমকে উঠেছিল যেন। সে কৌটো থেকে ফের পান বের করল। ঠোঁটে বাছে সেটা হার একটুখানি থেমে থাকল স্তব্ধভাবে।

নিশি যেন একটু করে স্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছিল। তাহলে তারও একটা ইতিহাস রয়েছে পিসির মতো। খণ্ড খণ্ড ছোট ওই রকম অনেক ঘটনা— মেলার জগতের অনেক স্মৃতিতে ভরা—সেই ইতিহাসকে বিস্মিত চোখে দেখছিল নিশি। তার অগোচরে টিকে থাকা একটা জগতের স্পর্শ পাচ্ছিল সে। আলো হল্লা উৎসব ভীড়, আনন্দের ঐকতানে কোথাও এমনি করে তার নিজস্ব একটা সুরও বাঁধা রয়েছে—ভাবতে কেমন লাগে। চোখে পিসির মতন ঘোর আসে।

অ নিশি, পান খাবি ?

বিনোদিনীর স্বরে একটা অপরিচিত অন্তরঙ্গতা। নিশি বড় একটা পান খায় না। লোচন তো কোনরকম নেশার ধার ধারে না। তবু পিসির দেখাদেখি সখ করে কখনও বাজার থেকে একখিলি পান কিনে এনে লুকিয়ে খেয়েছে সে। হাসির কথা, ছেলেবেলায় নিশি উঠোনের প্রান্তে পুতুলের ঘর বানিয়ে পানের দোকানও খুলত।

খা, এই নে। বয়স হয়েছে পান খাবি বৈকি! বিনোদিনী জোর করে খিলিটা গুঁজে দিল হাতে। নিশি একটু হেসে ভয়ে ভয়ে বলল, জরদা দাও নি তো ?

না:।

নিশি পান চিবুতে থাকল। মুখের ভেতর লাল রঙটি যত ঘন হচ্ছিল, তত খুশী-খুশী ভাবটিকে হাতের নাগালে পাচ্ছিল যেন। একটা অপরূপ বিহ্বলতায় সে পিসির গা ঘেঁষে বলল, আমাকে শিখিয়ে দিও পিসি, আমিও তোমার মতো পান সাজবো দেখে নিও।

বিনোদিনী খিলখিল করে হাসছে। তোকে পান খেলে বেশ মানায় রে। আমি পান খেলে নাকি শূর্পনখা রাক্ষুসী দেখায়। মুখপোড়া তারক গোঁসাই বলত।

সে কে পিসি ?

রূপপুরের। চৈত সংক্রান্তিতে সেখানে যাবো—তখন দেখবি। গল্প শুনলে নাড়িভুড়ি উগরে যায়…মিনসে একেবারে গল্পের যম।

ধনা মুখ ফিরিয়ে বলল, এবারে আমাকে একটা দাও দিকি, মুখটা শালা মরে গেল।

সারা পথ জবাব দিতে প্রাণান্ত। বিনোদ পানওয়ালীকে না চেনে এমন লোক বুঝি থাকতে নেই। সে বারবার ঠারেঠোরে নিশিকে ওই

খবরটা জানিয়ে দেবার তালে। কিন্তু নিশির পরিচয় দিতে দিতে সে রেগে অস্থির। শেষে বলে ফেলল, ওই ছুঁড়িকে এনে আমার যে চূড়ান্ত হল রে! ওটা কে পিসি, ওটা কে…মর্ অনামুখোরা, নতুন মানুষ দেখে সব আগুনের মতো দপকে উঠছে…

কথাটায় কেমন বিশ্রী গন্ধ আছে—ঈষৎ আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল নিশি। লতিকা ঠিকাদার মুচকি হেসে বলে গেল—মেলায় তাহলে একটা নতুন মানুষ এল! তারপর গাড়ি যতই চলেছে, ওই প্রতিধ্বনি—এ নতুন মানুষটি কে বটে গো?'

নিশির মনে হল দূরে রুদ্রদেবের প্রাঙ্গণে অস্পষ্ট তাঁবু আর গড়ে ওঠা দোকানপাটের সমবেত দৃশ্য হঠাৎ বিস্ময়ে নিঃশব্দে প্রশ্ন করছে—ওই নতুন মানুষটি কে গো?

পৌঁছতে দুপুর। সূর্য ঠিক মাথার ওপর। বিরাট ময়দানের একপ্রান্তে মস্ত বটগাছ—তার গা ঘেঁসে পুরনো মন্দির। কবে একদিন পাঁচিলের ফাটলে যে ছোট্ট তরুশিশুটি পিচ্ছিল শ্যাওলার ওপর হামাগুড়ি দিয়ে খেলা করছিল, আজ সে মাথা তুলেছে মন্দিরচূড়ার চারপাশে। আজ তার অনেক ছায়া, অনেক রহস্য। মন্দিরের প্রাচীন দেবতার মুখের মতো একটা ধূসর কালোত্তীর্ণতা তারও সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত।

তাই সমান সম্মানেরও শরীক হয়ে উঠেছে সে। যে মানুষ রুদ্রদেবের কাছে পুজো দেয়, মনের কামনা জানায়—সে তার কাছেও একবার আসতে ভুল করে না। ওই মন্দিরে কাল, এখানে তার প্রকাশ প্রাণের মধ্যে। ফুল দেয়, ফল দেয়, ছায়া দান করে প্রাণীকে।

পিসি মন্দিরে প্রণাম করে বেরিয়ে এসে নিশির হাত ধরে টানল। ভাঙা পাঁচিলের পাশে শুঁড়ি পথটুকু দিয়ে দুজনে হেঁটে এল বটগাছটার নীচে। নিশি দেখল গাছের কোটরে একটা মড়ার মাথা—সেটা সিঁদুরে লাল হয়ে আছে। অজস্র ইটের টুকরো গোড়ায়। তার ওপর কিছু শিলা। গুটিকয় চিত্রিত ঘট। ফুল বেলপাতা। ঘন ছায়ায় ঢাকা জায়গাটা—যদিও নির্জন নয় এখন, প্রণাম করে উঠতেই গা ছমছম করে।

নিশি উঠে দাঁড়ালে বিনোদিনী চাপা হেসে বলল, কী ইচ্ছে করলি?

নিশি বুঝতে না পেরে বললো, তার মানে?

হাঁটতে হাঁটতে বিনোদিনী বলল, ইনি কল্পতরু। ইচ্ছে ছাড়া প্রণাম করতে নেই। তাই বলছি, কী ইচ্ছে জানালি?

তাই বলো। নিশি খিল খিল করে হেসে উঠলো। না, কোন ইচ্ছে নিয়ে সে প্রণাম করে নি। পিসি আগে থেকে শিখিয়ে দিলেও কোন ইচ্ছে নিয়ে সে প্রণাম করত না। নিজের কামনাটি কী, সে কি নিজেও জানে? দেব-দেবতার কাছে কিছু চাইতে হলে, সে চাওয়াটি তুচ্ছ হলে তো চলে না।

কিন্তু পিসির কী বাসনা, জানতে ইচ্ছে করে। সে বলল, তুমি কী চাইলে?

বিনোদিনী চুপ করে গেছে। ভুরুদুটি কুঁচকে কী দেখছে। চারকোণা মাঠের বুকে ঘোর ব্যস্ততার সাড়া। মেলার মালিক-পক্ষের লোকজন সবত্র ঘুরে ঘুরে দেখাশোনা করছে। এক-একরকম দোকানপাট এক-একদিকে। দ্বিজু গোমস্তাও একটা চেয়ারে বসে রয়েছে। তার ওপর সব দায়-দায়িত্ব—মেলার খাজনা আদায়, ভালো-মন্দ, সবকিছুর। বিনোদিনী দেখেছে, মেলাটা সুন্দর করে তোলার পেছনে এই লোকটির অবদান কম থাকে না। বেশ সারমেলান দোকানগুলি, মধ্যিখানে গানবাজনার জন্য উপযুক্ত জায়গা রাখা, পেছন দিকে দিঘীর পাড়ে ম্যাজিক-সার্কাসের তাঁবু…একটা ছন্দের প্রকাশ থাকে রানী-চকের মেলায়। কয়েকটা অস্থায়ী টিউবওয়েল বসানো হয়। ডাক্তারখানাও খোলা থাকে অষ্টপ্রহর। একদল পাইকবেশী মানুষ লাঠি হাতে ঘুরে বেড়ায়। বন্দোবস্তে কোন ত্রুটি থাকে না।

এসে গেছ দেখছি। দ্বিজু গোমস্তা বলল, সঙ্গে ওটি কে?

বিনোদিনী খোঁচাল নিশিকে। প্রণাম কর।

নিশি প্রণামের জন্য ঝুঁকতেই দ্বিজু গোমস্তা হাত বাড়িয়ে বলল, থাক্ থাক্। বেশ মেয়ে—চমৎকার।

বিনোদিনী বলল, আমার সেই ভাইঝিটিগো। দেখেছো, মনে নেই। তা আছো কেমন, বাবা? শুনলাম দ্বিতীয়পক্ষ হয়েছে—দেখে আসবো একদিন।

দ্বিজু হাসল হা হা করে। কৌটোভরে পান সঙ্গে নিও। একেবারে পানের যম, বুঝলে পিসি?

আরো কাছে এগিয়ে চাপা স্বরে বিনোদিনী বলল, হ্যাঁ গো, ওদের ছেলেমেয়েদের দেখতে-টেখতে পারে তো? না, বাছবিচার রয়েছে?.. বাছাদের কপাল, এই বয়সে মায়ের মাথা খেয়ে বসে রইল।

দ্বিজু গোমস্তা বলল, সে সব বলবোখন। সন্ধ্যার পর আসবো। অনেক কথা পিসি, সে অনেক কাণ্ড।

সারা প্রাঙ্গণটা ঘুরে ঘুরে বিনোদিনী এমনি করে আলাপচারী করছিল।

নিশি দেখল, তার পিসির কাছে সব মানুষই মনের কথাটি নিভৃতে জানাতে চায়। কী অবাক মেয়েমানুষ তার পিসিটি! নিখুঁত খবরদারী তার—লোকে যেন এইটেই চায়, বিরক্ত হয় না। বরং খোঁজখবর না নিলে অভিমান করে বসে।

অথচ দুদিনের জন্যে বাড়ি ফিরে নিশি আর লোচনকে উঠতে বসতে সে কম জ্বালাতন করে না। তখন মনে হয়, চলে গেলে আপদ যায়।

নিশি বিনোদিনীর এই দুরকম রূপ এইদিনে স্পষ্ট করে জানল। জানল যে মেলায় বিনোদিনী তাকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যেই রাখবে। বরং যে আদর সে কোনদিন পায় নি, সেই আদর পাবার সময় জীবনে এসে গেল বুঝি। আর একথা যতই সে ভাবছিল, মনে হচ্ছিল, সারাজীবন বাবা তাকে অবহেলা করেছে।

দ্বিজু গোমস্তা বরাবর ভালো জায়গাটিই রাখে বিনোদিনীর জন্যে। ঠিক কোণটিতে—যেখানে একপাশে মিষ্টির দোকান, অন্যপাশে চায়ের। চায়ের দোকানগুলিতে পান সিগ্রেটও অবশ্য রয়েছে। কিন্তু বিনোদের হাতের পান, তার স্বাদ কেউ ভোলে না।

পাশেই ছোট্ট পথ—একটা গেটের মতো। রাঙতার কাজ করা লাল নীল কাগজ ঝুলিয়ে রেখেছে ওপরে। ওই পথে গেলে সার্কাস ম্যাজিক সিনেমার তাঁবু। সে অবশ্য একটা আলাদা জগতের মতো। ঘুরে ফিরে দেখতে দেখতে নিশির মনটা এতক্ষণে বেশ শান্ত হয়ে এল। সারাক্ষণ একটা উদ্দাম বাতাসের ঘূর্ণী হানা দিচ্ছিল যেন। চঞ্চলতার বিরাম ছিল না। এবার শুরু আর শান্ত সব। ক্রমে ক্রমে মনে হয়, নিশির সবখানে তৃষ্ণা। সকল দুয়ার খুলে তারা উন্মুখ। চারপাশে অজস্র আনন্দ। কোন দ্বিধা নেই, সংকোচ নেই। সব জড়তা চুপিসাড়ে ঘুচে গেছে। আর সেই অপরূপ ভাবটি নিয়ে নিশি বিনোদিনীর পানের কৌটো খুলল। পান বের করে চিবুতে থাকল সে। খিদে আছে বলে মনে হয় না।

বিনোদিনী পাশের দোকান থেকে ফিরল এতক্ষণে। হাতে শালপাতার মস্ত ঠোঙা। নিশিকে পান খেতে দেখে বলল, ও কি রে ছুঁড়ি, এই অবেলায় খালিপেটে পান খাচ্ছিস? ফ্যাল, ফেলে দে মুখপুড়ী। অভ্যেস নেই, অত ঘনঘন পান কেন?

নিশি বলল, তোমার মতো নেশায় ধরেছে গো।

মরণ! বিনোদিনী কপট রাগ দেখাল। যা, দিঘীতে ভালো করে রগড়ে হাত মুখ ধুয়ে আয়। এবেলা তো আর রান্নার উপায় নেই। তারপর চারপাশে মুখ ফিরিয়ে ধনাকে খুঁজল সে। সে ছোঁড়াটা গেল কোথায়? আরে অ ধনা? ওই মর্, দিনসে বাঘ সিংগি দেখছে বুঝি! ডেকে দিয়ে যাস্ নিশি। লোকজন এসে যাচ্ছে এক্ষুণি! সন্ধ্যের আগেই ইষ্টাট খাড়া করতে হবে···

'ইষ্টাট' কথার মানে নিশি জানে। দোকানকে পিসি ওইরকম বলে। সে গেট পেরিয়ে গেল। জায়গাটা কী সুন্দর। ওপাশে আমবাগান, দিঘীর পাড়ে ঘন তালবন। কয়েকটা তাঁবু। বেশ ব্যস্ততা চলেছে। ধোঁওয়া উঠছে ইতস্তত। রান্নার আয়োজন করা হচ্ছে। নিশি দেখল ধনা নিবিষ্ট মনে ঝুঁকে পড়ে কী দেখছে। ওই বুঝি বাঘের খাঁচা! খোলা আকাশের নীচে খাঁচাগুলি এলোমেলো ছড়ানো। তাঁবু ঠিকঠাক হতে দেরী আছে বুঝি। তখন জায়গা মতো নিয়ে যাবে।

কিন্তু খাঁচাটা যে চারপাশে ঘেরা। বাঘ হয়তো ভেতরে ঘুমোচ্ছে। তাহলে কী দেখছে ধনা? নিশির এত হাসি পেল যে বাচ্চা মেয়ের মতো ছুটে গিয়ে তার কাঁধে চিমটি কেটে দিল। ধনা চমকে উঠে খাড়া হল। বড় বড় দাঁত বের করে হাসছিল সে। তাই বলো। আমি ভাবলাম···

বাঘ! নিশি বলল। কিন্তু তক্তা চাপিয়ে রেখেছে যে। কী দেখছো ধন দা?

ধনা আঙুল তুলে ফিসফিস করে বলল, ওই দেখো লেজের রোঁওয়া দেখা যাচ্ছে। মাইরি, দেখলে গা শিরশির করে নিশি।

পিসি ক্ষেপে যাবে। শীগগীরি যাও। এক ঠোঙা মিষ্টি নিয়ে বসে আছে।

ধনা ছেলেমানুষের মতো লাফিয়ে উঠল, মাইরি? শালা বাঘের লেজ দেখতেই খিদেতেষ্টা মন হতে বেমক্কন! তা, তুমি কোথায় চললে ওদিকে?

নিশি চলতে চলতে বলল, ঘাটে।

ধনা গম্ভীরস্বরে বলল, একলা যেও না। চলো আমি সঙ্গে যাচ্ছি।

ভারী বীরপুরুষ তুমি। থাক্। নিজের মাথা বাঁচাও গিয়ে।

ধনা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। নিশি হনহন করে এগোচ্ছে। কাঁধে গামছা। এক হাতে সাবানের কৌটো, অন্য হাতের ডালুটা চিৎকরা—

মাজনগুঁড়ো রয়েছে। কেমন হাঁটনটি, ভয়ডরহীন, সপ্রতিভ। ধনা মুচকি হাসল। মেলার মাটিতে পা দিয়েই এই—পরে না জানি, কী সব হবে-টবে। ভাবতে অবাক লাগে, ভুবনপুরে এই মেয়ের মুখে সাতচড়ে রা নেই, বোবা চাউনি আর দুঃখু-দুঃখু মুখখানি নিয়ে বসে থাকা। অথচ এখন কথায় খৈ ফোটানোর তালে। হয়তো মেলার হাওয়ায় কী একটা থাকে। মূলশুদ্ধ উপড়ে স্বভাবকে উল্টোদিকে—উপরে পা নীচে মাথা যেমন, তেমনি কিম্ভূত করে রাখে। মেলা যে শুধু দেখনদারীর জায়গা, যে যতটা পারো, দেখাও। ভালো দেখাও, মন্দ দেখাও—দেখানোর জিনিস থাকলেই হল।

দিঘীর জল দেখে নিশির চোখ জুড়িয়ে গেছে ওদিকে। সে নামতে গিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে কালো জলের স্নিগ্ধতা উপভোগ করে নিচ্ছে। মধ্যে মধ্যে দাঁতের ফাঁকে মাজন মাখা আঙুলটা থেমে যাচ্ছে। তার ভুবনপুরেও এমন দিঘী-পুকুর অনেক রয়েছে। এমনি কালো জল আর স্নিগ্ধতা। তবু কোথাও একটা ফারাক আছে মনে হয়। এ যে বিদেশী জল—অচেনার সঙ্গে কী আলাপ করে সেই ভাবনা। ঘন সবুজ আর কালচে রঙের ফাঁড়িঘাস মাথা উঁচু করে রয়েছে জলের ওপর। কোথাও শোলাগাছের চিরোল পাতা থরথর করে বাতাসে কাঁপছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে খানিকটা করে ফাঁকা জায়গা। ওইগুলি ঘাট। একেবারে মধ্যিখানে কচুরিপানা আর লাল শালুকের গুচ্ছ। পানকৌড়ির ডাক শোনা যায়। দামের ওপর বসে একটা জলপিপি ডেকে উঠল পিঁ…পিঁ…পিঁ…

এই জল তার দিকে কেমন আড়চোখে তাকাচ্ছে—বরমানুষের চাউনি। ভুবনপুরের বাগদির বর যেমন করে প্রথম তার দিকে তাকিয়েছিল। এ তাকানোয় মন্দ কিছু না থাক, নতুন মানুষ দেখার অল্প লোভ না থেকে পারে না। জলপিপিটা ফের ডাকতেই মুহূর্তে নিশি কচি মেয়ের মতন জলে নামল হুড়মুড় করে।

ঘাটের পাশে বড়ো বড়ো পাথর। অদ্ভুত সব গড়ন। তার ওপর বসে কে একজন বসে জামায় সাবান দিচ্ছিল। পরনে গামছা। গলায় একটা ছোট্ট চৌকোণা চাঁদির তক্তি ঝুলছে। এক হাতে তামার বালা। মুখটা দেখা যায় না, এমন করে ঝুঁকে বসেছে সে। নিশি নামতেই সে বলে উঠল, আস্তে। গায়ে জল লাগবে।

নিশি পাশ ফিরে লোকটার দিকে তাকাল। কী মুশকিল, এতক্ষণ লক্ষ্যই করেনি জলজ্যান্ত লোকটাকে। যেন বসে আছে গাছ না পাথর,

তেমনি কাপড় কাচার মৃদু শব্দ—ফারাক করার উপায় নেই চার পাশের শব্দের সঙ্গে। ফিক করে হেসে মুখ ফেরাল সে।

দিঘীটার চারপাশে অগুনতি ঘাট। সোজাসুজি ওপারের ঘাটটিই কেবল বাঁধানো। তার পেছনে পাড়ের ওদিকে গ্রামের ঘরবাড়ি দেখা যায়। দালান কোঠাও রয়েছে।

নির্জন দেখে এখানেই সে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু ঘাটে কে কাপড় কাচছে। গা খুলে সাবান মাখা যাবে না। সেই সাতসকালে তাড়াহুড়ো করে কোনরকমে খিড়কীর ডোবায় চট করে একবার মাত্র ডুবে এসেছিল। তারপর এতখানি পথের ক্লান্তি। কিন্তু সে জন্যেও নয়। কেন জানিনা, অবেলায় স্নান করে এই মেলার মধ্যে একটু ফিটফাট থাকবার ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসেছিল। তাই পিসিকে লুকিয়ে সাবানও এনেছে সঙ্গে করে।

আড়চোখে নিশি ফের তাকাল পেছনে। কী আপদ, যেন হিসেবের খাঁক—সেও তাকাচ্ছে যে! এবার মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেল। চেনা চেনা মনে হয়। কবে কোথায় যেন দেখেছে নিশি। গতরখানি একটু শীর্ণ, কিন্তু রঙটি বেশ। কচি ছেলের হাবভাব মুখখানিতে। চোখ দুটি বড়োবড়ো। এলোমেলো চুলগুলি কাঁধ ছুঁই ছুঁই করছে। গলার তক্তিটা রোদে ঝকঝক করছে। বয়সের ছাপ পড়েনি মুখে। কী সুন্দর শিশুর মুখের মতন।

তুমি বিনোদ পিসির সেই ভাইঝি না?

নিশি জবাব দিতে গিয়ে যেন ঘেমে উঠল। কিন্তু কী কাণ্ড, এরই মধ্যে বুঝি সবখানে রটে গেছে 'ভাইঝি'টির কথা। রটবেই—পিসির যে আলাপের মুখ! মুখে তো আর বাছবিচার হিসেব নিকেশ নেই। সর্বত্র ঢাক পিটিয়ে বেড়াচ্ছে সেই থেকে। নিশি মুখ ফিরিয়ে মাথাটা দোলাল মাত্র।

পিসিকে বলো। সন্ধ্যের দিকে দেখা করে আসবো। বলো, গোবরা হাড়ীও এসেছে রানীচকে।

মুখে হাসি নেই। নির্বিকার স্বরে কথা বলছে। কে এই লোকটি? পথে কে যেন বলছিল এই নাম—শুনেছে নিশি। এখানেও সে পাড়ি জমিয়েছে বলছিল। সেই চণ্ডী না কি নাম, সাইকেলে আসছিল না? মনে পড়তেই আরো ভালো করে গোবরাকে সে দেখতে লাগল লুকিয়ে-লুকিয়ে। চণ্ডীর খবরে কি একটা ব্যাপার আছে হয়তো। কি সেটা? মানুষটাকে দেখে তো বেশ ভালো মনে হয়।

কোনরকমে স্নান সেরে নিশি ফিরল।

বিনোদিনী বলল, এত দেরী কেন রে? রাত্তির জয় করছিলি নাকি? পরক্ষণেই নিশি যে স্নান করেছে ঠাহর করে শান্ত হল সে। ভালোই করেছিস বাছা। আমিও যাবো ঘাটের পানে। হাড়মাংস জরে গেছে ধনা ছোঁড়ার গাড়ি চেপে।

নিশি কাপড় বদলাতে গেল। চারপাশে লোকজন; তাই পাশের দোকানের পেছনে গেল সে। ফিরে এসে বলল, পিসি ঘাটে একটা বৈরেগীর সঙ্গে দেখা হল। বললে, তোমার কাছে ওবেলা আসবে।

বৈরেগী? বিনোদিনী অবাক। মরণ! বৈরেগী আবার কে?

কি, গোবরা না কোবরা নাম…

বিনোদিনী চমকে উঠল। গোবরা ঘাটে ছিল?

হাঁ।

তোকে কি সব বললে নাকি?

কী আবার বলবে?

বিনোদিনী হঠাৎ যেন ঝিম মেরে গেল।

ঝিন্টু গোমস্তা গোবরার খবর নিশ্চিত পেয়ে থাকবে। ওর চোখের সুমুখে তাজা গোবরোটা মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—তরাস পাচ্ছে না—ব্যাপারটা কি?

॥ তিন ॥

শুধু বিনোদিনী নয়, মেলাশুদ্ধ ঝিম মেরে যাবার কথা। তবে, জায়গাটার নাম রানীচক—থানা পুলিশ তো আছেই, আরো আছে দাপটওয়ালা কিছু মানুষ। রানীচক আধুনিক গ্রাম—অর্থাৎ গ্রাম-নগরী। স্কুল পোষ্টাপিস বাবুভদ্রজন দালানকোঠা বরাবরই ছিল, ছিল না শুধু ইলেকট্রিরি। গত বছর থেকে তাও হয়েছে। কিছু সরকারী অাপিস কাছারীও বসেছে ও-প্রান্তে জাতীয় মহাসড়কের কিনারায়। বাইরের মানুষজন আগে এসেছে এখানে হাটেবাজারে, জমিদারী সেরেস্তায়, থানায়, এখন তাদের আনাগোনা চার-গুণ বেড়েছে বললে ভুল হয় না। দোকানপাট হল্লা জেল্লা এমনিতে কম নেই। নতুন আলোর ঝলকানিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে রানীচক।

তার ওপর রুদ্রদেবের মেলা কৃষ্ণপক্ষের শিবচতুর্দশী থেকে সারা মাস চলবে। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসবে ঘোরলাগা চোখে। ঢাকনা খোলা গুড়ের টিনে মাছির মতো ভনভন করবে।

কেন আসে এমনি করে?

দোকানপাট বাজার কেনাকাটায় ভালোভালো জিনিস বানীচরের বাজারের ওদিকে তো কম নেই। কলকাতা থেকে সোজাসুজি। ট্রাকে করে দুবেলা মাল আসছে। এক-একটা দোকানে এক-এক রকম চোখধাঁধানো জিনিস। কত ভ'র জেল্লা কত ভাব বাহার। তাক লেগে যায় দেখতে। কোনটা ফেলে কোনটা কিনি—বাঁশবনে ডোমকানা হয়ে পড়ে গ্রাম্য মানুষ। আর আজকাল মানুষের হাতে যেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা ভর করেছেন। উঠতে বসতে খেতে শুতে চলতে যে এত রকম রকম জিনিস লাগে মানুষ কি আগে জানত? সব দেখে শুনে নিজেদের বড্ড বোকা মনে হয়—চোখ বুজে যেন বেঁচে থাকছিলাম। চোখ খুলে দেখি সামনে কুবেরের ঐশ্বর্য জড়ো হয়ে আছে। কিন্তু টাকা?···

হ্যাঁ ওই একটা কথা আছে অবশ্য। টাকা।

যে টাকা আনে সেই পায়—অন্যে নয়। তাই টাকা ছাড়া আসতে নেই বানীচরের বাজারে।

কিন্তু মেলা?

লেবুতলার মোহন বলে, এই একটা জায়গা যেন ঘুমিয়ে স্বপন দেখতে আসা। পয়সা-টয়সা ট্যাঁকে নেবার দরকার নেই। কাজে লাগবে না। স্বপনে মিষ্টি খেতে পয়সা লাগে না। যদি বা লাগে, তা স্বপনেই মেলে। শুনতে হাসি পায়। অথচ মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রমাণ, ওই মোহন স্বয়ং। সে তার ছেঁড়া শার্টের পকেটগুলি উল্টেপাল্টে দেখায়—একটি নয়াপয়সাও নেই। তারপর বিড়ির মশলা ঝেড়ে ফেলে দেয় সেই শূন্য পকেট থেকে। কচিৎ দুটি একটি মৌরীও ফেলে। পকেটের সেলাইকরা ভাঁজ থেকে সযত্নে তুলে মুখে ফেলে। আরামে চিবোয়। মৌরী কোথা পেলি রে? না—সুখের সুখে। পানের দোকানে ছুটো গল্প ঝেড়ে এক ফাঁকে কখন তুলে নিয়েছে। বিনোদিনীরও সে মারে। জানতে পেরে সে বলে, ওরে চোট্টা ওরে বাটপাড়! মোহন খুকখুক করে হাসে।

এমন মানুষ অনেক রয়েছে সংসারে। মেলার সুখটি তারা যে সব চেয়ে বেশী করে পেয়েছে, এই কথাটা কহবার না বললে বুঝি স্বস্তি নেই তাদের। একবার মোহন নাকি একটি আধুলি জোগাড় করে মেলায় এসেছিল। পকেটে হাত ভরে সেটা সারাক্ষণ নাড়াচাড়া করে, মুঠোয় ধরে রেখে, মেলার দোকানে দোকানে, গানের আসরে সার্কাস ম্যাজিক-তাঁবুর দরজায় সে ঘুরে বেড়িয়েছিল। সে এক দারুণ ঝঞ্ঝাট। রাজ্যের লোক

হুই-হুহ করে মনে ঝাঁপিয়ে পড়ে—কোনটা কেনে, কোনটা বাদ দেয়। কি মজা দেবে, কোনটা দেবে না। সবই মনে হয় সবচেয়ে সুখের...

এই করে ব্যতিব্যস্ত উত্যক্ত মোহন শেখ অদ্দি জুত্তেরি শালার যম, বলে আধুলিটা জুয়োর ছকে ছুঁড়ে দিয়েছিল। ব্যস্ পকেটও খালি হল, হাতের সুড়সুড়িও কমল। কিন্তু মনের ভিতর কিছুটির জ্বলা·· যা তা একটা কিনলেই বরং ভালো হত। বরং একটা প্লাস্টিকের পুতুল···ঘরে বড়দার মেয়েটা একটা পুতুলের জন্তে সকালে কি মারটা খেল বৌদির হাতে। ছোট মেয়ের কাণ্ড— কার পুতুল চুরি করে ধরা পড়েছিল!

সেই নাককান মলা। টাকা মাটি মাটি টাকা... এই মন্ত্র জপ করে মেলায় এসো। সুখ পাবে অনেক।

তবে কাটালিয়ার আকুল সেখ অন্ত ধাতের মানুষ। সে নাকি একটা একটা বাড়তি টাকা পকেটে রেখে গোটা মাস ধরে মেলায় আনাগোনা করেছিল। মেলা ভাঙবার একেবারে শেষ দিন, যখন বিনোদিনী দোকান গুটোচ্ছে, ব্যস্তভাবে বলে উঠেছিল—ও পিসি একখিলি পান দাও দিকি—ওই যে কি বলে, মোহিনী পান···চার আনা খিলি।

দূর ছোঁড়া···সব বাঁধাছাঁদা হয়ে গেছে।

দোহাই পিসি একবারটি দয়া করে খোলো। ছুটে এসে পায়ে জড়িয়ে ধরে আর কি!

এ যেন ডুবন্ত মানুষের কাতর আর্তনাদ। বাঁচাও, বাঁচাও! অগত্যা বিনোদিনী মোহিনীপানের খিলি বানাতে বাধ্য হয়েছিল। আর সেই পান খেয়ে আকুল সেখ বারবার পিক ফেলে, জিভ বের করে দেখে আর বলে, বারো আনা পয়সা গলায় কাঁটা হয়ে লেগে থাকল পিসি! সামনের বছর যদি বাঁচি···

না। বাঁচেনি কাটালিয়ার আকুল সেখ। তাদের গ্রামের লোক পরের বছর মেলায় এসে খবরটা দিয়েছিল বিনোদিনীকে। আকুল কবরের তলায় ঘুমচ্ছে। মেলায় সে আর আসবে না।

মোহন আর আকুলের মধ্যে অবশ্য এই জাতবিচারে ফারাক বড় কম। কিন্তু কুসুমগ্রামের সাবি—সাবিত্রী? সেই বাচ্চা বয়স থেকে বিনোদিনী দেখছে এই বাউরী জাতের মেয়েটিকে। গত বছরে শাড়ি ধরেছে। বুকখানি ঢাকবার বয়স হয়েছে। কিন্তু ঢাকনটি তত জুতসই না। ফুটো-ফাটা অগুনতি। মেলাশুদ্ধ আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, ঘুরঘুর করে কেউ কেউ

পেছনে—হ্যাংলা কুকুর যত সব! বিনোদিনীর এমন রাগ হত—চুল ধরে দুমদাম কিল মারে পিঠে। বাপ-মা কাকা-দাদা কি কেউ নেই রে হতভাগী? ধিঙ্গি মেয়ে একা মেলায় আসে—একা ফিরে যায় ঘর? মেলায় কি পাস তুই?

পায় অনেক কিছু। দোকানের সুমুখে ঘুরে ঘুরে রঙীন কাগজ, ভাঙা খেলনা, কুড়োকাঁড়া নানান ফেলে দেওয়া জিনিস সে সংগ্রহ করে। ওই করতেই তার আসা। অন্য কোথাও চোখ নেই—চোখ দু'টি নিয়ত মাটির ওপর।

ডেকে আলাপ করেছিল বিনোদিনী। সব জেনে নিয়েছিল। বাবা-মা নেই—বিধবা মাসীর লাথি ঝাঁটা খেয়ে মানুষ হচ্ছে সাবি। মাসী যখন জীবিকার উদ্দেশে মাঠে ঘাটে বেরিয়ে যায়, সে চুপিচুপি মেলায় চলে আসে।

এইরকম আসবার মানুষ অনেক আছে। তাদের সংখ্যা অবশ্য কমই।

বেশী যারা আসে তাদের পকেটে পয়সা। পয়সা ছাড়া মেলায় আসার মানে খুঁজে পায় না। আর এ পয়সা হিসেবকরা কড়ি নয়।

তাই রানীপুর বাজারে যা কেউ কেনে না, এখানে কেনে। এরা বলে, না কিনে সুখ কই মেলায়? সত্যি বলতে কি কারণ ছাড়া কেনার জন্যে তো মেলায় আসা। কিনতে হবেই—সে তুচ্ছ হোক, বাজে হোক—যা কিছু একটা। কেনার সুরে তাদের মনটি বাঁধা—তাদের কাছে মেলাও ওই কেনার চড়া সুরে বাঁধা। সুরে সুরে মিশে ঐকতান। যতই জটিল হোক, ওটা যে সুর—তা বুঝতে দেরী লাগে না। সুতরাং মোহন আকুল-সাবিত্রীকে ঐ সবের মধ্যে না আনাই ভালো। কেনার সুখের চেয়ে না-কেনার সুখকে সুখ বলার আত্মপ্রবঞ্চনা কোন সুস্থ মানুষের থাকতে নেই। মেলায় যেতে হলে পয়সার কথাটা আগেই মনে পড়ে।

কেবল গোবরা হাড়ির তুল্য সৃষ্টিছাড়া মেলায়-আসা মানুষ নেই।

চালচুলোবিহীন, দেখলে বয়স আন্দাজ করা কঠিন—পঁচিশও হতে পারে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হওয়াও বিচিত্র নয়। মেলা থেকে মেলায় ঘুরে বেড়ানো পেশা। চেহারাখানি যেন বিশ্বকর্মা ঠাকুর নিজের পছন্দে বানিয়ে দিয়েছেন। অমন নিটোল গড়ন আর মুখশ্রী, পট ছাড়া কোথাও চোখে পড়ে না। যতক্ষণ সুমুখে থাকে চেয়ে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু কাঁটার বাস ফলের মধ্যে—আগুন দেখতে সুন্দর, হাতে ছুঁলে হাত পোড়ে—

রূপের বর্ণের ছন্দের অপরূপ মোহ আনে যে সাপ তার দন্তকূটে হলাহল। আলোয় যাকে সুন্দর দেখি ছায়ায় সে বিকৃত অন্ধকারের খণ্ড।

ঠিক এমনি করে গোবরার একটা বর্ণনা দিচ্ছিল বিনোদিনী। নিশি শুনছিল। শুনতে শুনতে শিউরে উঠছিল। কাল ওকে ঘাটে দেখলে সে কোনমতে পা বাড়াতে সাহস করবে না।

গোবরা মেলায় আসে দাবী নিয়ে।

তার প্রাণখোলা মিষ্টি হাসি, অপরূপ শ্রী, মধুর স্বভাব—এই সব মিলিয়ে যে তার বাইরের প্রকাশ—দাবী তার অজুহাতে নয়। আলাপী সুন্দর মানুষকে কে না উপহার দিয়ে খুশী হয়?

তার দাবী আসে তার ভিতরের ছায়ায় ভরা বিকৃত ভয়ানক সত্বাটার অজুহাতে। সে হিংস্র, বন্য, দুর্বার। যেন পৃথিবীতে কোন শাসন নেই, আইন নেই, জেলখানা নেই। কেউ তাকে শাস্তি দেবার নেই। ঈশ্বরও বুঝি মুখ টিপে হেসে মজা দেখেন।

আর দাবী তার অসংখ্য। টাকা, পছন্দসই জিনিসপত্র, মেয়ে মানুষ। চুপিচুপি গোবরা তার দাবী জানালে ভয়ার্ত দোকানদার নিঃশব্দে তা পূরণ করে।

অথচ এই লেনদেনের ভঙ্গীটা বেশ মজার।

তখন বাইরের কেউ উপস্থিত থাকলে মোটেও টের পাবে না যে তার চোখের সুমুখে একটা দুর্ঘটনা ঘটছে।

খুবই স্বাভাবিক সহজ সরল আদানপ্রদান।

আর যেখানে গোবরা ও প্রতিপক্ষ বেশ চেনাজানা—অর্থাৎ আগে যথারীতি হাতেখড়ি চুকেবুকে গেছে, সেখানে কারবারটা অতীব স্বাভাবিক। গোবরা এসে বলে, ও কান্তদা পঞ্চাশটা টাকা. .

কান্ত নামে মনোহারীওয়ালা একটু হেসে তখনই টাকাটা হাতে গুঁজে দিয়েছে। তহবিলে না থাকলে বলেছে, ও বেলা এসো, দেবো।

কেউ প্রশ্ন করলে কান্ত বলবে, ও একটা আদায় দিলাম। ইয়ের ট্যাকসো। তারপর গোবরা চলে গেলে কান্তর মুখের ভঙ্গী, ইত্যাদি যা হয়, অনুমানযোগ্য।

তবে এ তল্লাটে এটা সয়ে গেছে সকলের। আর গোবরারও একটা আক্কেল বিবেচনা আছে। সে সাধ্যের অতীত কিছু চেয়ে বসে না। তাতে মেলা-খেলায় অমন কিছু কালতু খরচ বড় একটা গায়ে বাধে না। কিন্তু মেয়েমানুষ?

সেও নাকি ঘরের বোন ভাইঝি বৌ-টৌ নয়। গোবরা জিভ কেটে বলে, ছিঃ, ও পাপ, মহাপাপ। মন্দ মেয়েমানুষ সর্বত্র কিছু না কিছু মেলে। পয়সা

দিয়ে জুটিয়ে দেওয়া যায়। উল্লুক গোবরা নাকি বলে, রাম বলো, যেচে গিয়ে কারুর চরণে সাধতে পারবো না। তোমরা এনেটেনে দিলে তখন… শেষে চাপা স্বরে বলে, ঘরটর পোষায় না এ ব্যাপারে। আমার জন্যে ওই পড়ে আছে ফাঁকা মাঠ—হাওয়া আছে, ওপরে আকাশ…

অবশ্যি সবই শোনা কথা বিনোদিনীর। কে জানে এ ব্যাপারটা কতদূর সত্যি না মিথ্যে! এটা অন্যগুলোর মত আলোর ব্যাপার তো নয়, অন্ধকারের। তাই হলফ করে কিছু বলা কঠিন।

সব শুনে নিশির শরীর হিম হয়ে উঠেছিল। সে ফিসফিস করে বলেছিল, কেউ ওকে ধ'রে মারতে পারে না? পুলিশ কিছু বলে না পিসি?

বিনোদিনী বলেছিল, ও তো পুলিশমশাইদের পুষ্যিপুত্তুর। বছরে ক' হাজার করে নাকি হাতে গুঁজে দেয়। আর পাবলিকে ধরে মারলে কি হবে জানিস?

পাবলিক কি পিসি?

এই তুই-আমি-সে…বিনোদিনী বুঝিয়ে দিয়েছিল পাবলিকটা।

নিশি সম্ভ্রমে পিসির দিকে চেয়েছিল। কত কি জানে! সে ফের প্রশ্ন করেছিল, মারলে কি হবে বললে না?

বিনোদিনী ফিসফিস করে বলেছিল, মার খাবে তখনকার মতন। কিন্তু পরে এসে কাউকে ছুরী মারবে, নয়তো মেলায় আগুন জেলে দেবে। চোঙার সাঙাত কম নেই, বুঝলি? খবর দিলে চারপাশের গ্রাম থেকে দুটো একটা করে হাজির হবে।

সেই গোবরা সকালবেলায় এল।

দোকান বা পিসির ইহাট রাতের দিকে খাড়া হয়ে গেছে। কেবল সাজানো গোছানো বাকী। তাই বিনোদিনী পেছনের অন্দরমহল থেকে খুবই ভোরে বেরিয়েছে। ঘাসের ওপর শয্যা পেতে শুয়ে নিশির গা-কেমন করছিল সারাটি রাত। তাতে ওই গোবরা হাড়ির গল্প। শেষ রাতে অনেকরকম স্বপ্নও দেখেছিল যেন। পিসি উঠে যেতে, সে টের পেয়েছিল। কিন্তু চুপচাপ শুয়েছিল—টিনের দেয়াল ঘেঁষে। দোকানের সামনের দিকের তক্তাপোষটার নীচে অগোছাল জিনিস-পত্র। আধো আলোয় দেখলে বুক টিপটিপ করে—কেউ ওখানে লুকিয়ে নেই তো? অবশ্য চারপাশে টিনের ঘেরাটোপ—ইঁদুর ঢোকবারও সাধ্যি নেই।

ধনা রাতেই ফিরে গেছে। মেলা জমলে আবার আসবে বলে গেছে সে। নিশির মনে হচ্ছিল—ও বরাবর সঙ্গে থাকলে বেশ হত। হাজার হলেও পুরুষমানুষ তো বটে! এই বিদেশে বিভূঁয়ে মেলা-খেলায় দুটি অবলা মেয়েমানুষ।

বিদেশে না এলে যেন দেশের মানুষের মূল্য বোঝা যায় না! ওই গোবেচারা ধনার জন্যে নিশির মনে কষ্ট! আর লোচন—লোচনের জন্যেও বড় সাধ জাগে। ভাইবোন ভাইঝি মিলে একত্র এমনি করে ঘুরে বেড়ালে ক্ষতি কি! অথচ পিসি ভুবনপুরে এবার শেকড় ছড়িয়ে দিচ্ছে। ওর মনের কথা কেউ জানে না।

রাতজাগা চোখ খুললে জ্বালা করে। চোখ বুজে শুয়ে ছিল নিশি। ওদিকে বাইরে তক্তাপোষে খুটখাট মচমচ শব্দ—পিসি ব্যস্ত। কখনও সামনের দিকে যাবার সরু পথটুকুতে সে মাথা ঝুলিয়ে দিচ্ছে, হাত বাড়িয়ে কি সব টেনে তুলে নিচ্ছে তক্তাপোষের ওপর। সেই সময় ঘাড় ফিরিয়ে নিশি একবার করে চোখ খুলছে। ঝুলন্ত পিসির মুণ্ডুটা উল্টোদিকে, খ সবই এসময় স্বাভাবিক! তাই পিসির ঘোলাটে চোখ দুটি ছানাবড়া হয়ে উঠছে—ভয় পাবার মতো। তবু হাসি পায়। নিশি লুকিয়ে হেসে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ফের চোখ বুজছে।

তারপর কখন মুখের সোজাসুজি টিনের দেয়ালের ছোট্ট ফুটোর ফাঁকে পুবের ফাঁকা মাঠ থেকে আলোর রেখা এসে ঢুকে গেল। নিশির গালে লাগল সোনালী রঙের গোলাকার ছোপ। হাতের তালুতে সেই ছোপটা রেখে পিটপিট করে তাকিয়ে থাকল সে। ভোরের শীতটা কেটেছে। বেশ গরম লাগে। মুখ সরিয়ে ফুটোয় এক চোখে বাইরেটা দেখার ইচ্ছা—আর সেই সময় গোবরার কণ্ঠস্বর, কেমন আছো বিনোদপিসি?

নিশি প্রথমে বুঝতে পারে নি। পিসির কথায় বুঝল। বিনোদিনী হুড়মুড় করে নেমে গেছে ওদিকে। গোবরা না? তোকে যে চেনাই যায় না রে ভাইপো? এ কি চেহারা হয়েছে!

যেন সাত জন্মের নাড়ীর কুটুম! নিশির রাগ হচ্ছিল।

এসেছো, সে খবর পেয়েছি পিসি। তোমার ভাইঝিটিকেও দেখলাম বটে… কিন্তু…

কিন্তু কি রে মুখপোড়া?

বুড়ো বয়সে আবার এ কি ঝামেলা বইতে এলে বলদিকি? বেশ তো

ছিলে…গোবরার স্বরে যেন কত অন্তরঙ্গতার আভাস,…দেখেশুনে আমার মনে হয় কি জানো?

তোর আবার কি মনে হয়?

হয় একটা কথা। বললে রাগ করবে না তো?

তুই আমার ভাইপো। তোর কথায় রাগ করতে পারি? বিনোদিনী হাসছিল।

এবার শোনো। তোমার 'কাল' সঙ্গে করে আনলে এবার।

বাজে বকিস্ নে বাপু! বোস্, বেঞ্চিখানা বের করি। পান খেয়ে যা। বিনোদিনী বেঞ্চ টেনে বের করতে থাকল।

গোবরা বলল, আমাকে তুমিও ভয় করো পিসি। ছি, ছি—বড় দুঃখ হয় আমার—তুমি কেন ভয় করবে? এতদিন ধরে চেনাজানা—কোনদিন কি তোমার কাছে হাত বাড়িয়ে কিছু চেয়েছি! লোকে বলেছে, বিনোদপিসি মেলায় এসে টাকার পুঁটলি বেঁধে নিয়ে যায়। হয়তো যায়—আমার তাতে কি? আমি শালা তোমার কাছে পুষ্যি-দেওয়া কানাকুকুর—একটুখানি খা নেই তুই! সত্যি পিসি, তোমার কাছে এলে কি জানি কেন মনটা একেবারে জুড়িয়ে যায়, তোমার দিব্যি। চাইব কার কাছে? যে দেয় না, দিতে চায় না—তার কাছে। আর যে অনেক, অনেক দিয়ে বসে আছে চাইবার আগে, তার কাছে কি চাইবো!

বাক্তে থামা দিকি।

ওই দেখো! মনের দুটো কথা বললে রাগ করো! যাইরি পিসি, এটা তুমি ঠিক করোনি। যা দেখলাম, শালা পিলে চমকে যায়—একেবারে লকলকে ফণা, জলের ধারে আলকেউটে…ছোবল দিতে দেরী। ছায়া মাপলেও দেরী করে না দংশাতে…

বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর কিছু ভয়ার্ত হয়ে পড়েছিল। ওরে গোবরা, ওরে… তুই ওসব বলিস্ নে বাবা। মেয়েটা জেগে রয়েছে। শুনে ভয় পাবে। লক্ষ্মী ছেলে…

উঁহু। আপন ভাবলে বনের বাঘকেও আর ভয় লাগে না। আমি তো মানুষ!

বিনোদিনী কৌটো খুলে মশলা বের করছিল। কোন কথা বলছিল না।

তা পিসি, এতদিন তোমার কছে এসেছি—কোন ইচ্ছে ছিল না, লোভ থাকত না। সহজভাবে এসেছি, সরলমনে উঠে গেছি অন্যখানে। কিন্তু এবারে…গোবরা অস্পষ্ট হাসল, এবারে যে চোখের পাপ, মনের পাপ, দেহের

-পাপ সব ছাড়বে না। শালারা সব মড়ার ওপর পোকার মতন থকথক করে উঠবে কুগছে। এ বড় সমস্যা! ধেৎ…!

শুনতে শুনতে নিশি এতক্ষণ কাঠ হয়ে যাচ্ছিল—এবার সে আর স্থির থাকতে পারল না। চুপি চুপি উঠে এল চটের পর্দার কাছে। উঁকি মেরে দেখতে থাকল গোবরাকে। তার এই রকম দেখার মধ্যে অভিসন্ধি ছিল। গোবরা সশস্ত্র না নিরস্ত্র? এই একটা লোককে বিশ্বশুদ্ধ এত ভয়! ছুটে গিয়ে গলা টিপে ধরলে কী করতে পারে ও? রাগে আক্রোশে নিশি ছটফট করছিল! পিসির ভাগ্যে যা হবে হোক, সে দুমদাম যা কয় মেরে ভুবনপুর পালিয়ে যাবে। ভুবনপুরে তার গায়ে হাত দেয়, এত শক্তি কারুর নেই। তাছাড়া সেখানে লোচন রয়েছে, ধনা রয়েছে, বীণাদিরা আছে…

সবটাই একটা ছেলেমানুষী ক্রোধ—নিশি উঁকি মেরে দেখে, একটু পরেই টের পেল যে, যে-কারণেই হোক, এখন মারামারি করা সম্ভব নয়। তার লজ্জা পেল বরং। লোকে হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখবে। তাতে এই লোকটার ওপর যা ভক্তি, হয়তো উল্টে নিশিকেই মার-মুখো হয়ে তেড়ে আসবে! তার চেয়ে যা খুশী বলুক, সবসময় তো আর এখানে বসে থাকছে না। যখন ফের আসবে, নিশি তার দিকে তাকাবে না। তাকে ও ছিন্ন করে থুথু ফেলবে। ঘৃণা করবে। বাঁদরকে নাই দিলে মাথায় ওঠে বোঝা যাচ্ছে। এ বাঁদর শুধু মাথায় ওঠে না, কামড়ও দেয়।

গোবরা ততক্ষণে দেখতে পেয়েছে। চটের পর্দার নীচে নিশির পা —বেঞ্চ থেকে একটু ঝুঁকে কৌতুককর ভঙ্গীতে সে আঙুল দিয়ে দেখাল—ওই দেখো, গর্ত থেকে বেরিয়েছে। গন্ধ পায় কি না…

বিনোদিনীও হাসল খিল খিল করে। অরে অ নিশি, অ মুখপুড়ী!

নিশি বেরিয়ে এসে বলল, কি হয়েছে?

গোবরা বলল, রাতে ঘুম হয় নি। মেজাজ চটে আছে। তাতে চোখ দুটি রক্তজবা—

নিশি বলল, হ্যাঁ। গ জাগুলি পেয়েছি!

বিনোদিনী তার স্পর্ধা দেখে অবাক হয়ে গেল। সাতচড়ে রা নেই, সেই মেয়ের মুখে এ কি বাক্যি? সে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিল—যা মুখ ধুয়ে আয় দিকি। এত বেলা অব্দি শুয়ে থাকে?

গোবরাও একটু অবাক হয়েছিল যেন। কোন কথা বলল না সে।

নিঃশব্দে পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে জ্বালল। তেমনি নিঃশব্দে টানতে থাকল সিগ্রেটটা।

রুদ্র দেবের প্রাঙ্গণের একপাশে একটা নতুন টিউবওয়েল বসানো হচ্ছে: এই সকালেই লোকজন নিয়ে বিষ্ণু গোমস্তা হাজির। নিশিকে বালতি হাতে দেখে সে বলল, ভেতরে চলে যান। ওখানে টিউবওয়েল আছে।

নিশি পাঁচিলের ভাঙা জায়গাটা গলে প্রাঙ্গণে ঢুকে গেল। প্রাঙ্গণ নির্জন। কেবল মন্দিরের চত্বরে একটা কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। সারা প্রাঙ্গণে ঝরাপাতার রাশি। পা ফেললে শব্দ ওঠে খসখস করে। সে শব্দে কুকুরটা মুখ তুলে একবার তাকাল।

নিশির ভাল লাগল না দৃশ্যটা। এত নোংরা আবর্জনা চারপাশে! ওই কুকুর, ভাঙা পাঁচিল...মন্দিরের জীর্ণতা, জাওলা—সব মিলিয়ে একটা অবহেলার চূড়ান্ত।

আর কদিন পরে কৃষ্ণা শিবচতুর্দশী। তখন সব হয়ত ঝাড়পোঁছ করা হবে। পুজো হবে ঘটা করে। তখন ঘুম ভাঙবে রুদ্রদেবের। বিবর্ণ, আকারহীন চোখদুটি হয়তো উজ্জ্বল দৃষ্টিপাতের মোহ আনবে।

নিশি কলতলায় বালতিটা রেখে একটু এগিয়ে গেল। প্রধান মন্দিরের পাশাপাশি আরেকটা মন্দির, তার ভিতর পাথরের শিবলিঙ্গ। উঁচু চত্বরটা পেরোলে রুদ্রদেবের আসল মন্দির। পাথরের বেদীতে একটা ভাঙাচোরা দেবমূর্তি—হাত দুটি নেই, মাথার উপরে কিছুটা কে যেন খুবলে তুলে নিয়েছে। নাকের ডগাও ভাঙা। ধুসর রঙের পাথরে গড়া এই দেবমূর্তি দেখে নিশির ভক্তি অবশ্যি জাগেনি। এই সেই রানীচকের রুদ্রদেব! অনেক যুগের ক্লান্তি আর ধুসরতার চিহ্ন নিয়ে প্রাচীন একটা মহিমা মূক হয়ে আছে। সেদিন ভালো করে খুঁটিয়ে দেখার অবকাশ পায়নি নিশি। আজ দেখে মনে হল —রুদ্র দেব বড় অযত্নে রয়েছেন।

ঘুরে ফিরে সব দেখে সে চত্বর থেকে লাফ দিয়ে নামল। ছোট্ট শুঁড়িপথের ওপরে সারবন্দী ক'খানা একতলা ঘর। একখানি কোনমতে টিকে রয়েছে। বাকীগুলি ধ্বসে পড়েছে। ঝুলন্ত কড়িকাঠে পাখিরা বাসা বেঁধেছিল লক্ষ্য করা যায়। একসময়ে এই ঘরগুলিতে নাকি দূরান্তের দর্শনার্থীরা এসে থাকত।

দরজা জানলার কপাট কবে কে খুলে নিয়ে গেছে। টিকে থাকা ঘরখানির দরজায় সে উঁকি মারল। দেখল, একটা ভাঙা তক্তাপোষ—আর তার ওপর তুলোর কম্বল গুটিয়ে রাখা হয়েছে! তাকে একটা সানলাইট সাবান।

জলের গ্লাস, একটা কৌটো। কোণের দিকে একখানা দেওয়ালপঞ্জিকায় মেয়েমানুষের ছবি। বুকের কাপড় সরে গেছে। একলা না হলে তাকিয়ে দেখতে লজ্জা করত।

গ্রামের বাইরে এই নির্জন পোড়ো জায়গায় অন্যসময় হয়তো কেউ শুয়ে থাকার নাম করে না।

এখন মেলার মরশুম। তাই কেউ আড্ডা নিয়েছে। কিন্তু খোলা ঘরে এই সব জিনিসপত্র দেখে কেমন লাগে! চুরি যায় না? লোকটা কে?

নিশি আরও দেখল এপাশের দেয়ালে পেরেকে একটা বাঁশের বাঁশী বেশ কায়দা করে আটকানো। বোঝা যায় লোকটা শৌখীন। তাই বাঁশীও বাজায়! চাপা হাসিতে নিশির মুখ রাঙা হয়ে উঠল। আরও ভালো করে দেখার জন্য সে যেই ভেতরে পা বাড়িয়েছে, অমনি পেছন থেকে কে বলে উঠল, একি, বাঘের গর্তে পা দিয়েছো যে?

চমকে পেছন ফিরে দেখে, জলে ঢিল পড়লে যেমন হয়, নিশির সারা শরীর যেন চিৎকার করে আস্তে আস্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। চোখ নিষ্পলক হয়ে রইল। তার নিশ্বাসও বোধ হয়ে এল। জানু দুটি হঠাৎ পাষাণ হয়ে গেছে! পা তোলবার ক্ষমতা নেই।

দরজার দু'পাশে দু'টি হাত রেখে মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং গোবরা। মাসের মাঠে মেঘের ছায়ার মতন নিশির মুখোমুখি সে। চোখে মিটিমিটি হাসি। ঠোঁট লাল করে পান খেয়ে এসেছে বিনোদিনীর কাছে। এখনও চিবুচ্ছে। গায়ে একটা হাতগোটানো সাদা শার্ট—ধুতির কোঁচা কোমরে পেঁচিয়ে বেঁধেছে। পায়ে স্যাণ্ডেল। যেন আসরের কথকঠাকুরটি। কেবল তিলক কাটতে বাকী।

খুঁটিয়ে দেখবার মতো মনের অবস্থা নিশির নয়। অথচ এমনি খোলা চোখে তাকালে আয়নার মতন অবিকল প্রতিবিম্ব না ফুটে পারে না।

গোবরা হাসতে হাসতে ফের বলল, ভিরমি গেলে নাকি, ও নিশিলতা!

নিশি সম্বিত ফিরে পেল এতক্ষণে। পা বাড়িয়ে বলল, সরো, যেতে দাও।

গোবরা নড়ল না। কাজটা ভালো করনি নিশিলতা। এখন তোমাকে এখান থেকে বেরোতে যে দেখবে, সেই বলবে গোবরা হাড়ির এক নম্বর শিকার। তারপর মেলাশুদ্ধ রটতেও দেরী হবে না। তখন হাজারটা রাক্ষসে চোখ তোমাকে এমন করে গিলে খাবে যে শুধু খোসাটি নিয়ে ঘরে ফিরতে হবে। বুঝেছ, কি বলছি?

ঝগড়া করার লোভ নিশি কষ্টে সামলাল। ওর কথাটা তো মিথ্যে নয়। এমন কি পিসিই তাকে চুলের মুঠি ধরে মারতে মারতে পাঠিয়ে দেবে লোচনের কাছে। ···সে শান্তভাবে মাথা নাড়ল তাই। অর্থাৎ বুঝেছে।

তবু গোবরার নড়বার নাম নেই। নিশিলতা, তোমার দিব্যি, তোমাকে এখানে দেখে এত ভালো লাগল, বলার নয়। যেচে কোন গেরস্থ মেয়ে গোবরার কাছে আসে না।

নিশি একটু একটু করে সাহস পাচ্ছিল। বলল, আমিও আসিনি। নতুন জায়গা, তাই···

বাধা দিয়ে গোবরা বলল, তা ঠিক। কিন্তু ভাবতে ভালো লাগে। এমনি করে কেউ এলে জীবনটা সার্থক হয়ে যায় মাইরি।

নিশি ব্যস্তভাবে বলল, আমাকে যেতে দাও। অপরাধীর মতো কিছু নম্র আচরণ নিশির।

অনধিকার প্রবেশের লজ্জা এত বেশী হয়েছে যে গোবরার কু-কথা গায়ে মাখছে না।

আটকে রাখার ইচ্ছে নেই। তবে ভারী সাধ লাগে নিশি, ওই তক্তাপোষে পাশাপাশি বসে খানিক কথা বলি। ভালোবাসার কথা···

আচমকা নিশি তার বুকে জোরে ধাক্কা মারল। গোবরা আছাড় খেল না। দরজা ধরে সামলানোর চেষ্টা করল। কিন্তু একপাশে হুমড়ী খেয়ে নুয়ে পড়েছিল সে। নিশির হঠাৎ আক্রমণ সে চিন্তাও করেনি।

আর সেই ফাঁকে নিশি একলাফে বাইরে এসে পড়ল। দ্বিতীয়বার প্রায় লাফ মেরে ভাঙা পাঁচিল ডিঙিয়ে সে প্রাঙ্গণের ওপাশে ফাঁকা মাঠে নেমে দ্রুত হাঁটতে লাগল। বালতিটা কলতলায় পড়ে রইল।

আরো খানিক গিয়ে মেলার গেট। একটু থেমে নিজেকে সামলে নিল সে। তারপর ফের এগোল। পিসিকে বালতির কথাটা কিভাবে বলবে ভেবে পাচ্ছিল না নিশি!

॥ চার ॥

বাঘ ভয়ংকর প্রাণী! কিন্তু সে বাইরে থেকে আসে! বাস্তু সাপ—সেও স্বয়ং মহাকাল ; কিন্তু ঘরের প্রাণী। শয্যার নীচেও গুপ্ত বিবরে সে বাস করে।

আর সাপ যখন বাস্তুসাপ. সে, দেবতার অধিক। চোখের সুমুখে দেখেও মারবার কথা মনে ওঠে না।

দ্বিজু গোমস্তার পাইকরা মাথায় লাল ফেট্টি বেঁধে লাঠি হাতে যতই মেলা পাহারা দিক, গোবরার কিছু যায় আসে না। পাইকরা মাইনে করা লোক। তারা জানে, এখানে তারা দল বেঁধে রয়েছে, ঘরে ফিরলে সকলেই একা। তখন ক্রুদ্ধ গোবরার মরণছোবল থেকে বাঁচানোর সাধ্য স্বয়ং ধন্বন্তরীরও নেই।

একবার প্রাণে মারবারও কথা উঠেছিল। বল্লভ কাঁসারি রানীচকেরই লোক। সে ষড়যন্ত্র করেছিল। মারবার লোকও ঠিকঠাক। অথচ একটা ভোজবাজী ঘটে গিয়েছিল যেন।

সে রাতে কলকাতার যাত্রা ছিল। গ্রাম্য দল হলে রাত ভোর করে ছাড়ত। কলকাতার যাত্রা বারো বাজতেই শেষ। তারপর সে আসরে বাকী রাত কবিগানের কথা। খবর এল, বায়না করা কবিদ্বয়ের একজন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার নামডাকই বেশী। সুতরাং বায়না ফেরত দিয়ে গেছে বিকেলবেলা। ছুটোছুটি করে আর তেমন দল মেলেনি। সারারাত লোক থাকলে বেচাকেনা বেশী হয়। আজেবাজে গানের দল আশেপাশে অনেক রয়েছে। তাদের সাধ থাকলেও সাহস নেই এমন আসরে সেজে নামবার।

যাত্রা শেষ হলে মেলা স্বভাবত নির্জন হয়ে উঠেছিল। গানবাজনা না থাকলে বেশী রাতে আর কেউ মেলায় থাকে না। বল্লভ কাঁসারির ভাগ্যে সুযোগ মিলে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে।

বটগাছের নীচে একটা বেঞ্চ পেতে তার ওপর শুয়ে ছিল গোবরা। মুখটা একপাশে কাত হয়েছিল। আততায়ী নিঃশব্দে অগ্রসর হচ্ছিল। মেলার দোকানগুলিতে তখন ঝাঁপ পড়ে গেছে। কেবল মধ্যের ফাঁকা জায়গায়—শূন্য আসরের ওপর একটা ডেলাইট ঝুলছে।

আর একফালি আলো টেরচা ভাবে এসে পড়েছিল গোবরার ঘুমন্ত মুখে।

ঘুমন্ত মানুষকে আচমকা আঘাত করে হত্যার ঘটনা পৃথিবীতে অনেক ঘটেছে। গোবরার ভাগ্যেও তা সহজে ঘটতে পারত। অথচ একটা অন্যরকম ব্যাপার হয়ে গেল।

তার অন্ধকার শরীর থেকে বেরিয়ে আসা আলোকিত মুখ অথবা অন্য কিছু, আততায়ীকে যেন স্তব্ধ করে দিয়েছিল পাথরের মতন।

কিংবা কি ঘটেছিল সত্যি-সত্যি, কেউ হয়তো জানে না। শুধু বল্লভ বলে, আচমকা ঘুমোনো মানুষের কণ্ঠায় ছুরি বিঁধিয়ে দেবে, সে ঘুম ছেড়ে ভয়ংকর চিৎকার করে উঠবে···ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয়। বরং তার চেয়ে···

সব শুনে দ্বিজু গোমস্তা আঁৎকে উঠেছিল।···সর্বনাশ, ও মলে ওর চেলা-চামুণ্ডারা আমার মেলা করার সাধ জন্মের মতো ঘুচিয়ে দিত। সে বল্লভকে গালমন্দ করেছিল। আরও বলেছিল, মারবে কি করে? যে ঈশ্বর ওকে সৃষ্টি করেছেন, সেই তিনিই হাতের ছুরি কেড়ে নিয়েছেন। যাকে রূপ দিলেন দেব-দেবতার রূপের অংশ কেড়ে, তার রূপমাধুরীতে নরকের কীট যদি বাসা বাঁধে, সে দোষ কাটের! গোবরার কীটটাকে মেরে ফেলার ক্ষমতা থাকে তো চেষ্টা করে দেখো। ওই রূপের ওপর ছুরি চালিয়ো না···এই বলে প্রচণ্ড হেসেছিল সে। সারা জীবন মেলা চালিয়ে হাজার রাতের গানের আসরে হাজার রকম ভালো কথা শুনে দ্বিজু ঘোষালের অনেক জ্ঞান। অনেক অভিজ্ঞতা। সে বলতে জানে ভালোই।

এই চেষ্টার কথা আরেকজন শুধু জানে। সে বিনোদিনী। কিন্তু বলি-বলি করে আর বলতে পারেনি গোবরাকে। ঝঞ্ঝাট বিনোদিনী সইতে পারে না। শুধু ঠারেঠোরে বলেছিল, যেখানে-সেখানে হাঁ করে ঘুমোস্‌নে বাপু। তোর শত্রুর শেষ নেই।

গোবরা কান দেয়নি কথায়।

বল্লভ কাঁসারি কিন্তু সেই থেকে মেলায় বাসনের দোকান নিয়ে আর আসে না। বাজারেই গুম হয়ে বসে থাকে। বলে, তার চেয়ে ওকে জাগিয়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম না কেন?

ইতিহাসে আছে—যুবক শের শাহ নাকি ঘুমন্ত বাঘকে জাগিয়ে আক্রমণ করেছিল। তাই শের শাহ নাম। শের মানে বাঘ। শাহ্‌ হচ্ছে সম্রাট। এযুগে তেমন বীর আর দেখা যায় না।

কিন্তু গোবরা প্রকারে বাঘ-সাপ যাই হোক, আকারে রীতিমতো মানুষ।

তাছাড়া জনসাধারণের সঙ্গে তার সম্পর্কটা আস্তে আস্তে পিতাপুত্র হয়ে পড়েছে। দুষ্টু ছেলেটিকেই বাপের সবচেয়ে পছন্দ! জ্বালাতন করলে খারাপ যতই লাগুক, কেমন···কেমন ভালোও লাগে বুঝি। মন্দকে দেবতার রূপে ভক্তি ভালোবাসা জানানো মানুষের ধর্ম। সেবারে রানীচক থানার বড়বাবু দ্বিজু ঘোষালকে বলেছিলেন, গোবরার পাত্তা নেই এখনও, ব্যাপার কি মশাই?

দ্বিজু বলেছিলো, তাইতো! শিবরাত্রিও পেরোলো। ওর ঘরখানাও খালি রেখেছি···

বড়বাবু বলেছিলেন, যাই বলুন মশাই, এ সব মেলা-ফ্যালার ক্ষেত্রে ওই একমাত্র থ্রিল এ অঞ্চলে। ও না এলে মেলা জমে না।

থ্রিল-ট্রিল যাই হোক, বড়বাবুর কথাটা অবশ্য উদ্দেশ্যময়। পকেটের ব্যাপার কিছু থাকতে পারে। বিশেষ করে রাজ্যের জুয়াড়ী এসে জুয়ার ছক বিছিয়ে বসে থাকে মেলায়। গোবরা তাদের অধিষ্ঠিত দেবতা! চরণে নৈবেদ্য ঘটা করেই সমর্পিত হয়। অর্ঘাঞ্জলি নিবেদনের সমারোহ পড়ে যায়। সুতরাং বড়বাবুর ইজ্জত বজায় রেখে গোবরা হাড়ি সব বিনাক্লেশে সামলে নিতে পারে। তার কাছে তো দরদস্তুরীর অজুহাত দেখানো চলে না জুয়াড়ীদের। ওর হাত যমের হাত। বাবা-বাছা কাকুতি-মিনতির কথা অবান্তর।

বালতিটায় জল ভরতি করে পৌঁছে দিয়েছিল স্বয়ং গোবরাই।

এসে বলল, পিসি, তোমার ভাইঝিটি বড় মনভোলা মেয়ে। এই নাও··

বিনোদিনীকে নিশি এখনও বলেনি ঘটনাটা। কিন্তু ওইরকম কিছু আন্দাজ করতে তাকে বেগ পেতে হয় নি। সে বলল, দুপুরে দু'মুঠো এখানে খেয়ে যাস্ ভাইপো। মাগুর মাছ পেয়েছি। ও বেলা আবার পূজো···

গোবরা ছড়া কাটলো, সেবারে লম্বোদর কবিয়াল বোষ্টমদের ঠাট্টা করে বলেছিল—মাগুর মাছের ঝোল, যুবো মেয়ের কোল, বোল হরি বোল।

বিনোদিনী কপট ক্রোধে বলল, ছেলের বয়স যত বাড়ছে, মুখের ঢাকনাও তত উদোম হচ্ছে। মাসীপিসির সামনে···

গোবরা জিভ কেটে বলল, ছি, ছি, যুবো মেয়ে কি চেয়েছি তোমার কাছে? কথার কথা বলছিলাম। তা, তোমার ভাইঝি ঠাকরুণটি কোথায়?

দোকানের পেছন দিকটা দেখিয়ে বিনোদিনী বলল, রান্না করছে।

করুক! এখন জ্বালাবো না! পরে দেখা হবে। বলে গোবরা চলে গেল শিস্ দিতে দিতে।

নিশি পেছনদিকের চটের পর্দায় উঁকি মেরে সব শুনছিল। এবার বেরিয়ে এসে বলল, ওই গুণ্ডাটাকে এখানে খেতে বললে ?

বিনোদিনী ফিসফিস করে গুমোট মুখে বলল, তুই বুঝবিনে। যা বলছি শোন। আর দেখ, একলা একলা কোথাও যাস নে। দরকার হলে আমি যাবো।

নিশি রাগ করে সরে যাচ্ছিল। বিনোদিনী তাকে ডাকল, হ্যাঁরে, কলতলায় ওর সঙ্গে কিছু হয়েছিল নাকি ?

কি হবে আবার ?

আমাকে লুকোসনে নিশি ! ও তোকে ককথা বলেছিল নাকি ?

নাঃ।

তবে বালতি ফেলে পালিয়ে এসেছিলি কেন ? ওকে দেখে ?

নিশি মাথা নেড়ে বলল, হুঁ, তোমাদের মতন ভয়ে আমি খড়ের মানুষ হয়ে গেছি ! একটা রোগাপটকা লোককে ভয় করতে বয়ে গেছে।

বিনোদিনী ধমক দিয়ে বলল, অতো বাড় দেখাস নে তো ছুঁড়ি। ভারী আমার ইয়েটি এলেন···মেয়েলাট !

নিশি চুপ করে থাকল।

সত্যি কথাটা আমাকেও বলবিনে ?

কিছু হলে তো বলবো। বালতির কাছে একটা কুকুর এসেছিল···

বিনোদিনী না হেসে পারল না। সত্যি, কুকুরকে বড্ড ভয় করে নিশি। কুকুরের ভয়ে ছেলেবেলায় কতদিন পাঠশালা কামাই করত। লোচন সঙ্গে করে দিয়ে আসত তাকে। আর আসবার সময় কায়েত-পাড়ার বীণা বাড়ি পৌছে দিত।

রান্না শেষ হতে দুপুর।

বিনোদিনীর দোকান ততক্ষণে সাজানো গোছানো শেষ। সিগ্রেট-বিড়ির প্যাকেটগুলি থাকে থাকে সুন্দরভাবে সাজিয়েছে! ফাঁকে ফাঁকে পটের ছবি—ক্যালেণ্ডার। থাকের ওপর মাটির গণেশ। তাজা সিঁদুরের ছোপ তার চরণদুটিতে এঁকে দিয়েছে। ওবেলা মহাদেব ঠাকুর আসবে রানীচক থেকে। যৎকিঞ্চিৎ পুজোআর্চা হবে। ভোগের জিনিসপত্রও যোগাড় হয়ে গেছে। বিনোদিনীর হুকুম তামিল করতে লোকের অভাব নেই। লেবুতলার মোহনও এসে গেছে। সে এখনও বাজার থেকে ফেরেনি। সাদা সুতো, আমপাতা, ঘট ইত্যাদি নিয়ে একেবারে ফিরবে। তারও খাওয়ার কথা এখানে।

মেলায় দোকান পাতলে এমন পূজোআর্চার রীতি সবখানে চলে। মেলার সুখ হল্লা আনন্দ—এসব কথা মুখে যতই বলি, বেচাকেনা না হলে সব শূন্য। ওইখানে শেকড়—বাকীটা ওপরের ডালপালা সবুজ পাতা ফুল ও ফল।

চতুর্দশীর দিন তখন আবার একটা সম্মিলিত পূজোর ব্যাপার আছে। তখন সাধ্যমতন মানত দিয়ে আসবে সবাই।

মোহন দীঘির ওদিকে আমবাগান হয়ে ঘুরে এসেছে। হাতে একগোছা আমপাতা। কাগজে মোড়া ফুলও এনেছে বাজার থেকে।

এসে বলল, তোমার ভাইঝিকে দেখলাম ঘাটে।

বিনোদিনী অবাক। কখন চুপিচুপি কেটে পড়েছে নিশি। অত পইপই করে বারণ করল তাকে। সে হন্তদন্ত হয়ে বলল, ওগুলো রেখে তুই এখানে একটু বস দিকি বাবা। আমি চান সেরে আসি। দেখিস, কুকুর না ঢোকে।

মোহন বিশ্বাসী লোক। বেঞ্চে বসে বলল, চট করে এসো পিসি।

বিনোদিনী গামছা কাঁধে নিয়ে বলল, পান খাবার ইচ্ছে হলে, খাস। এই কৌটোয় নতুন একরকম জর্দা রয়েছে। ভুলেও হাত দিবিনে—আর ওই কবরেজী মশলা…ছুঁবিনে।

কেন গো?

বিনোদিনী হেসে বলল, খেলে বুকে মাথায় বরফ চাপাতে হবে। ও তোমাদের জন্যে নয় রে বাছা। মোহন তা জানে। রাজা-মহারাজা—ভোগের শরীর ছাড়া ওসব মশলার জ্বালা সামলানো কঠিন। তাতে সে তো একেবারে শাকপাতাভোজী মানুষ—ঘরে,…ঘরে বৌ-টৌও নেই। হ্যাঁ, ও পানের বড় জ্বালা। কামের কুহক লেগে মানুষ জন্তু হয়ে পড়ে নাকি।

মোহন ভয়ে ভয়ে সুপারী-মৌরী দিয়ে পান সেজে নিল। এলাচ নিলনা। যা দাম হয়েছে এলাচের। বিনোদপিসি সুমুখে থাকলে বরং দু-একটা কুচি তুলে নিত।

পানরাঙা জিভটা বড়ো আয়নায় যখন দেখছে, গোবরা এল। মোহনকে দেখে বলল, এই মেয়েমুখো, পিসি কোথায় রে?

মোহন ভয়ে কাঠ। স্বভাবে নির্বিরোধী মানুষ সে। কু-কথাকে বড় ভয় পায়। তবে গোবরা তাকে অনেকদিন থেকে চেনে। প্রয়োজন মতো ফাই-ফরমাসও খাটিয়ে নেয়। কথায় কথায় 'মেয়েমুখো', 'মাগী', ইত্যাদিও বলে থাকে। দেখলে মোহনকে তার সমবয়সীই বোধ হবে—এমনকি পাশাপাশি হাঁটলে যেন অন্তরঙ্গ দুটি বন্ধু, যুবাপুরুষ। অথচ সম্পর্কটা ওইরকম।

গোবরাকে দেখে সে লাজুকভাবে হাসল, পিসি-ভাইঝি সব ঘাটে। পান চাই নাকি? সেজে দোব? যেন পান খাওয়ার জন্যই গোবরার আসা। সদ্য স্নান করেছে। চুলে চিরুণী চালিয়েছে কি ভাগ্যে। ফিটফাট সেজেগুজে তৈরী—কেবল অভ্যাসমতো কোঁচার খুঁটটা কোমরে শার্টের ওপর পেঁচানো।

গোবরা মুখ ভেংচে বলল, পান চাই নাকি, সেজে দেব…যেন ঘরের মাগ! তোকে বুঝি মড়া আগলাতে রেখে গেছে?

মোহন বলল, হুঁ। মধ্যেমাঝে গোবরা তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে বলেই এইগুলি খারাপ লাগে।

গোবরা বসে হাত তুলে ডাকল, টাট থেকে নেবে আয় ব্যাটা চাঁড়াল। এখানে এসে বোস। মোহন নেমে এল আমতা হেসে। পাশে বসল। পানের রস একেবারে শুকিয়ে গেছে। কি বিশ্রী মানুষ, মোহনের মনে বড় সাধ, গোবরার সঙ্গে তার একটা সত্যিকার বন্ধুত্ব হোক। গোবরা যেন সেই সাধটাকে ঠারেঠোরে ভীষণ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। কতবার মোহনকে সে সার্কাস-সিনেমার তাঁবুতে বিনি পয়সায় ঢুকিয়ে দিয়েছে, মিষ্টিও খাইয়েছে—মোহন কৃতার্থ হয়ে গেছে। দেশের স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও যদি তাকে এমনি কিছু দিতেন-থুতেন, মোহন ততখানি কৃতার্থ বোধ করত না। গোবরার সঙ্গে মেশায়, আলাপে, চলাফেরায়, অনুগ্রহ পেয়ে—ফাইফরমাশ খেটে একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি মনে জেগে ওঠে তার। শরীরের রোমগুলি বারবার শিরশির করে ওঠে আনন্দে। পেটে একটা খিঁচুনি ওঠে—গলায় কোথাও জল জমে সুড়সুড় করে, কাসতে কাসতে চোখেও জলবিন্দুর সঞ্চার হয়।…এইগুলি মোহন দেখেছে বারবার! অথচ কেন এই লক্ষণগুলি ফোটে সে বুঝতে পারে না। সে আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে গোবরাকে দেখে আর একটা গভীর রহস্যের বিস্ময়ে তলিয়ে যেতে থাকে। ওই লোকটি যেন আধেক আলো আধেক অন্ধকারে তৈরী। দুর্গম অরণ্য, গভীর জলাশয়, অমাবস্যার রাত্রি…এমনি অনেক ছবি মনে ভাসে। মনে ভাসে, মাথায় মণি নিয়ে নির্জন রাত্রির প্রান্তরে সঞ্চরমান শঙ্খচূড় সাপের দৃশ্য।

সেই পুলকে পুলকিত শিহরিত মোহন মাথা উঁচু করে বলে, ও যশোদা-দা, এক প্যাকেট সিগারেট…

পয়সা?

গোবরাদার। মুচকি হেসে চলে আসে মোহন।

তবু একটা দুঃখ। মোহনকে গোবরার লোক বলে কেউ জানে না। মানেও না। সবাই জানে, অমন অনেক মোহন গোবরার তল্পী বয়ে বেড়াচ্ছে মেলায়।

কুকুর-শেয়ালকে হুকুম করলেও তারা মুখ বুজে তালিম করে। মোহন আর কি করে!

গোবরার সত্যিকার অনুচর যারা, তারা আপাতত অদৃশ্য। তাদের কেউ চেনে না, কে তারা। কোত্থেকে আসে প্রয়োজনের সময়! এইটে বেশ রহস্য·· সেই অদৃশ্য অনুচরেরা যেন অবিশ্রান্তভাবে তাকে চোখে চোখে রেখে সতর্ক পাহারা দিচ্ছে। গোবরার পান থেকে চুন খসলে তাদের দেরী সয় না। মেলার মানুষ এ প্রমাণ বহুবার পেয়েছে।

গোবরা মোহনের কাঁধে হাত দু'খানি পেঁচিয়ে যেন অন্তরঙ্গভাবে বলল, তুই যে এবার আগাম-আগাম জাঁকিয়ে এসে বসলি! ব্যাপার কি রে, অ্যাঁ?

মোহন ভেজা বেড়ালের মতো কাঁচুমাচুমুখে বলল, মাইরি তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি, এমনি। ঘরে বসে দিন কাটে না। কাজকম্মোও মেলে না গাঁয়ে। খাওয়া-পরা তো বুঝতেই পাচ্ছো। তাই চলে এলাম—যদি কাজ কিছু পাই-টাই।

গোবরা হো হো করে হেসে উঠল, ঠাকুরঘরে কে, না আমি তো কলা খাইনি!

তোমার দিব্যি। মেয়েটি এসেছে, আমি জানতাম না।

গোবরা আরও উৎকট হেসে ফেলল। দেখ চেষ্টা করে, যদি বাগাতে পারিস। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, দাঁত বড় ধারালো। কামড়ায়।

মোহন সাহসভরে বলল, তোমাকে বুঝি কামড়েছে?

গোবরা কি জবাব দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু ওদিকে মনোহারীপট্টিতে চেঁচামেচি বেধেছে। সীমানা নিয়ে ঝগড়া। প্রায় হাতাহাতির উপক্রম। ঘোষালকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। খুঁটি পুঁতে চুনের দাগ কেটেও রেহাই নেই। বাঁশের খুঁটি এদিক-ওদিক করে ফেলে কেউ। এ মেলায় জায়গার দর একটু বেশী। গায়ে বাধে। গোবরা বলল, পেল্লাদটা নতুন এসেছে তো, নিয়মকানুন রপ্ত হয় নি! বুঝলি মোহন?

মোহন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। অন্য একটা গভীর—খুবই সুদূর অথচ অনুভব করা যায়, এমন কি সুখের গন্ধ—হঠাৎ উড়ে আসা ফুলের গন্ধের মত— প্রজাপতির মতন, তাকে কিছু বিস্মিত কিছু তন্ময় করেছিল। যে পথের ওপর সে হাঁটছে তারই পাশে একটা সুন্দর কিছু রয়েছে, অলক্ষ্য থেকে সেটাকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দিল গোবরা হাড়ি। মোহন নিশির কথা ওইরকম করে একটুও ভাবে নি তো! এখন ভাবতে মন কেমন করে ওঠে যে!

গোবরা মৃদু চাঁটি মেরে বলল, কি রে? ঝিমুনি ধরল নাকি?

মোহন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, পেল্লাদ?

হ্যাঁ! তোর ভগ্নিপতি। শালা চাঁড়াল!

গালমন্দ গায়ে না মেখে মোহন বলল, পেল্লাদের বড় জাঁক হয়েছে মাইরি। ডেরাইডোলের গম চোরা চালান দিয়ে টাকা জমিয়েছে। মানুষের মুখের গেরাস কেড়ে··

গোবরা বলল, তুই হলেও করতিস! ব্যাটা যেন ধর্মাবতার মহাপুরুষ।

মোহন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল, কখনো না। ও আমাদের গাঁয়ের লোক। হাড়ে হাড়ে চিনি। বাপ সুদের টাকা জমিয়ে যখ রেখে গিয়েছিল··· আর জান গোবরাদা, সমিতির ক'হাজার টাকা তছরুপ করে পেল্লাদের নামে এখনও মামলা ঝুলছে?

তুই খবরের কাগজ নাকি রে?

নানান জায়গায় ওঠাবসা করি, মোহন গম্ভীরমুখে বলল, কত কথা কানে আসে।

গোবরা থুতু ফেলে বলল, খিদে পেয়েছে। এ মাগীদের তো আসবার নাম নেই দেখছি। দীঘির জলে সবটুকু পাপ না ধুয়ে ফেলে আসবে না।

মোহন একটু আহত হল। ছিঃ গোবরাদা, পিসি যাই করুক, ও মেয়েটা কিন্তু একেবারে সাদা।

হ্যাঁ। গঙ্গাজলের বিষ্টি হয়েছিল ভুবনপুরে। নিশিলতা নামে ফুলটিকে ধুয়ে দিয়েছিল।

মোহন মুখ ফিরিয়ে বসে থাকল।

গরীব দুঃখী মানুষকে পৃথিবীতে অনেক কটুকথা তুচ্ছতাচ্ছিল্য অবহেলা সইতে হয়। দুঃখ যে হয় না, তা নয়। তবু সকল দুঃখ যেন ফাঁকা মাঠে উড়ো পাখির ছায়া—শূন্যতা কোনকিছু আটকে রাখতে পারে না। কিন্তু এবার কি হয়ে গেল মোহনের।

তার মনে হচ্ছিল, নিশিলতার ওপর ছুঁড়ে ফেলা গোবরার তীরটা তাকেও তীব্রভাবে স্পর্শ করে গেল। যেন অমন করে না বললে বুঝি চলত না! সে একেবারে নিঃস্ব, বঞ্চিত আর নিঃসঙ্গ, সারা পৃথিবীর কোনকিছুর ওপর তার আর কোন রক্তের দাবী আছে ভাবতেও ভয় পায়—তেমনি মানুষ মোহন। বোঁটাছাড়া পাতার মত টুপ করে বসে বাতাসের ঝাপটানিতে উড়ে বেড়ায় এখানে ওখানে। সেই তাকে গোবরা হাড়ি যেন জানিয়ে দিল খবর—কোথায়

ফুলেফলে ভরা ঘনসবুজ গাছ, ছায়ার ওপর গাঢ় মুখে থমথম করছে নিটোল প্রাণময়তা আর সে অবহেলায় শুয়ে আছে মাটির ওপর। কে যেন ক্রমাগত তার চারপাশ থেকে ফিসফিস করে বলে যেতে থাকল কি কথা। তার শূন্যতার ওপর কোথা থেকে ডানা মেলে শনশন করে উড়ে এল পাখির দল। মনে হলো সবটা ফাঁকা নয়—প্রাণের যাতায়াতে, উজ্জ্বল রোদে, বেঁচে আছে তার নিজের মধ্যিখানে আর এক পৃথিবী। সে আস্তে আস্তে চোখ খুলল। অনেকদিনের বুজে থাকা চোখে তবু জড়তা। সবই অস্পষ্ট বোধ হয়। অনেক রাত হয়েছে। সে তখনও বাড়ি ফিরে যায় নি। ফিরে যেতে ইচ্ছা করে নি—বিনোদিনীর দোকানের সুমুখে বেঞ্চিতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে খোলা আকাশের নীচে

টিনের ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছে বিনোদিনী। ভাইঝিকে পাশে নিয়ে আরামে ঘুমোচ্ছে। এখানে মোহনের বড কষ্ট হয়।

আস্তে আস্তে শিশিরময় আকাশে, নক্ষত্রের নীচে অন্ধকারে, সবখানে হিমের স্পর্শ প্রকট হয়ে উঠছে। গ্রামের বাইরে তাই এত হিম। কেউ আর জেগে নেই। এখন তাদের হয়তো অনেক আরাম।

মোহন শুয়ে শুয়ে বিকেলের দৃশ্যটা অবিকল দেখছিল।

খাওয়ার পর গোবরা যখন এই বেঞ্চে বসে রোদ পোহাচ্ছিল, ভয়ডরহীন, নিশিও এসে শেষ প্রান্তে বসল। কোমর ছাড়িয়ে বেঞ্চের নীচে তার খোলা চুল ছড়িয়ে পড়েছে—রেশমী শিকড়গুচ্ছ ছড়িয়ে মেলার গাছে একটা স্বর্ণলতা কোথা হতে ভেসে এল যেন। জড়িয়ে রইল। খোলা অগোছাল চুল শুকোচ্ছিল সে। পানে ঠোঁট দুটি রাঙা, ঘন ঘন পিক ফেলছিল। মোহনের মনে হচ্ছিল, ওইরকম করে কি গোবরাকে থুথু দিচ্ছে নিশি? কে জানে তার মনের খবর। তবে গোবরার মতো পাষণ্ডকে সে ঘৃণা না করে পারবে না।

অন্তত মোহনের এইটে ভাবতে ভালো লাগছিল।

বিনোদিনী টাটে পা বিছিয়ে বসে আছে ওদিকে। তার মুখেও বিরক্তির স্পষ্ট চিহ্ন। বাঘের পাশে সাধের ছাগলটি যেচে গিয়ে বসলে কার না রাগ হয়? অথচ নিশির গ্রাহ্য নেই। নির্বিকার মুখে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। ফরসা গালের উপর শেষ বেলার লালচে রোদ টেরচা হয়ে পড়ছিল—সরু নাকের শ্বাসটানা কাঁপনটি স্পষ্ট দেখা যায়। চোখের পাতায় ধনুরেখা—প্রতিমার চোখের মতন। যত দেখে, লজ্জা পায় মোহন। মন থেকে কু-ভাবটি তাড়াতে ইচ্ছে করে। কিন্তু গোবরার হঠাৎ-ছুঁড়ে মারা পাপের রঙ ঘুচলেও ঘোচেনা।

চোখের দৃষ্টিতেই সেই আঁধার ছমছম করে! তাই সে মুখ ফিরিয়ে সার্কাসের তাঁবুর দিকে তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করছিল।

কি বিশ্রী জড়তা! সব সহজ যেন জটিল হয়ে গেল। দুপুর অব্দি কত স্বচ্ছন্দ মনে সে এখানে এসেছে। ফাই-ফরমাশ খেটেছে। নিশির সঙ্গে দু'চারবার কথাও বলেছে। কিন্তু এরপর বলতে গেলে যেন কণ্ঠস্বর কেঁপে যাবে। সোজাসুজি চোখ তুলে চাইতে পারবেনা আর। এ কি দুঃসহ যন্ত্রণা!

গোবরা কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সারাক্ষণ বেহায়ার মতন নিশির দিকে তাকিয়ে ছিল। বিনোদিনীও দেখেছিল—মুখে কিছু বলতে পারে নি তাকে। কেবল নিশিকে বলেছিল, অচেনা জায়গায় ঘুমটুম হয় নি—খানিক গড়িয়ে নে গে ভেতরে। নিশি একটুও নড়েনি। কি রকম অবাধ্য মেয়ে—মোহনের রাগ হচ্ছিল।

তারপর ওদিক থেকে ছায়া এল ঝাঁপিয়ে। গোবরা নিঃশব্দে উঠে গেল পেল্লাদের দোকানের দিকে। আর এতক্ষণে নিশি উঠল, ঝিমুনি ধরেছে। একটু শোব বলে আড়মোড়াও দিল একবার।

বিনোদিনীও এতক্ষণে নিজমূর্তি ধরল—লজ্জা করে না বেহায়া মুখপুড়ি··· নানারকম গালমন্দ। নিশির ভ্রূক্ষেপ নেই। সে ভেতরে গিয়ে বুঝি অবেলায় সত্যি সত্যি গড়াচ্ছে। অগত্যা মোহন একটু ইতস্তত করে খুক্ খুক্ হেসে বলেছিল, এখনই মহাদেব ঠাকুর এসে যাবেন। সাঁজপিদীম তৈরী হয়েছে তো?

নিশি ভেতর থেকে জবাব দিয়েছিল, হয়েছে। শুকোতে দিয়েছিলাম ওইখেনে। তুলে আনোদিকি মোহনদা!

তাও ভালো। নাম ধরে ডেকেছে। মোহন উঠে গিয়ে দেখেছিল—দোকানের পাশে ঘাসের ওপর সাতটি পিদীম। দিঘির ঘাটে বুঝি অতক্ষণ ধরে ওইসব করা হচ্ছিল।···

দৃশ্যটা অবিকল ভাসছে। বারবার ভেসে আসছে! চেষ্টা করেও তাড়ানো যায় না! শীতে যতটা নয়—এই রকম উৎপাতে শান্ত থাকা কঠিন। মনে হয় গভীরে কোথাও ফাটল থেকে জলবিন্দুর মতন, বুকের মধ্যিখানে রক্ত চুইয়ে পড়ে। টুপ্‌টাপ্ টুপ্‌টাপ্ ধারাবাহিক।

কেন সে আজ এমনি করে পড়ে আছে বিনোদিনীর দোকানের সুমুখে ফাঁকা আকাশের নীচে রাতের অন্ধকারে? মেলার মরসুম জমে গেলে এমন থাকার অর্থ হয়। তখন আলো জ্বলে, কোলাহল থাকে, মানুষ থাকে। তাই অনেক সাহস থাকে। আর ঘুমেরও সাধ থাকে—ক্লান্তিও থাকে ততোধিক।

এখন তার কোনটাই নেই। শুধু অন্ধকার, নৈঃশব্দ, নির্জনতা! শুধু গা-চমকানো ত্রাস। নিদ্রাহীনতা। সকলই অসম্ভব মনে হয়। সকলই স্বপ্নের মতন মূল্যহীন। এবং কোন শান্তি নেই। যন্ত্রণার চুপি চুপি স্বর···টুপ্‌টাপ্‌ টুপ্‌টাপ্‌···শিশিরের মতন মৃদু ও গভীর। অলীক প্রতীক্ষার অস্থিরতা সবগুলি ইন্দ্রিয়কে প্রস্তুত রেখেছে প্রাণীর মতন।

নিশি কি উঠে আসবে তার কাছে? তাকে ভালোবাসার কথা বলতে এই নিশুতি ঘুমের আরাম ছেড়ে চুপিচুপি পা ফেলে—কঠিন ওই ঝাঁপটা উন্মোচিত হতে একটু ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ শোনা যাবে না?

আচমকা মাথার চুলে টান পড়ল মোহনের। সে অস্পষ্ট ককিয়ে হুড়মুড় করে উঠে বসল। তারপর ভয়ে লজ্জায় কাঠ হয়ে গেল একেবারে। গোবরা তাকে আকর্ষণ করছে।

গোবরা তাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল। যেমন করে ঘাড়ে কামড় দিয়ে বাঘ তার শিকারকে নিয়ে যায় দূর বনের দুর্গমতায়।

গোবরা একেবারে মেলার বাইরে এসে থামল। আশেপাশে কেয়াঝোপ—খোলামকুচি কাঁকর আর ঘুটিঙে ভরা ঢালু একটা পোড়ো জায়গা। কোথাও নাটাগাছের জঙ্গল উইঢিবির ওপর—নিঃসঙ্গ শিশু কাঁটাবাবলা। ভয়ে অস্পষ্ট গুঙিয়ে উঠল মোহন, তুমি আমাকে মারবে গোবরাদা?

নক্ষত্রের আলোয় গোবরার দাঁত চকচক করছে। স্পষ্টত সে নিঃশব্দে হাসছে।

গোবরা কি তাকে মেরে ফেলবার জন্য এখানে নিয়ে এল? মোহন ঝুঁকে পড়ল তার পায়ের ওপর—দোহাই গোবরাদা আমি কোন দোষ করিনি, আমায় মেরো না·· আমি এখুনি বাড়ি চলে যাব। আর কোনদিন এখানে আসবো না—তুমি দেখে নিও।···

গোবরা তাকে ছেড়ে দিল। পকেটে হাত ভরে সিগ্রেট বের করল সে। তারপর দেশলাইয়ে সেটা ঠুকতে ঠুকতে বলল, একটা ইঁদুরের মতো প্রাণ, তার আবার পীরিতের শখ! শালা মাগী কাঁহাকা!

মোহন হাঁপাচ্ছিল মৌন মুখে।

কি রে, কথা বলছিস না যে?

তুমি মিছিমিছি গায়ে কালি ছিটোচ্ছ গোবরাদা। মোহন বিড়বিড় করে বলল।

স্বভাব। গোবরা সিগ্রেট জ্বালল এতক্ষণে। দেশলাইয়ের আলোয় তার

মুখটা মুহূর্তে দেখা গেল—একটা চাপা কৌতুকের রেখা ঠোঁটের কোনে তার।
কিন্তু ইচ্ছে হলে বলিস্। একেবারে তোর বুকের ওপর শুইয়ে দেব ছুঁড়িকে।

মোহন চুপ করে থাকল। দুর্ভোগ এই কপালে এতখানিও ছিল তার!

মাইরি! ছুঁড়ির দেমাক খুব রে মোহন বেণু! ও আমি ভাঙবো, দেখে নিস্। আর ভাঙবো তোকে দিয়েই—সাপ নড়াচড়া করলে যেমন শব্দ ওঠে, তেমনি তার হাসির শব্দ।

মোহন শিউরে উঠে বলল, না, না গোবরাদা।

কেন? তুই কি হিজ্‌ড়ে নাকি?

না। ওসব আমি পারবো না।

তুই না, তোর বাপ পারবে, ব্যাটা চাঁড়াল। মেয়েমানুষের শরীরে শরীর মিশলে কাঠেও আগুন জ্বলে; তুই তো মানুষের বাচ্চা।

আমি চাইনে গোবরাদা···। মনের সঙ্গে মন মিললেই আমার ভালো লাগে···

ওরে বাবা, এ যে কথকঠাকুর হরু চক্কোত্তি! গোবরা গুন্‌গুন্ করে উঠল—মন কি মিলেরে, মনের মানুষ না হইলে! বুদ্ধু কাঁহেকা—মেয়েরা যখন মন দেয় না, তখনই শরীর দেয়, শরীর যখন দেয়, মনটা যত্ন করে প্রাণের সিঁদুর কৌটোয় লুকিয়ে রাখে। থাক্··· তোর মতো মুখ্যু চণ্ডালকে আর জ্ঞান দিয়ে লাভ নেই। যা, বাড়ি গিয়ে ঘুমো গে। শালা, পেটের জ্বালায় জ্বলে মরছিস্ একে, তার ওপর মনের জ্বালা সাধ করে টেনে নিচ্ছিস্—

একটা ধাক্কা মেরে চলে গেল গোবরা। যেতে যেতে জ্বলন্ত সিগ্রেটটা ফেলে দিল পেছনে। বলে গেল, কটান্ নিবি তো নে, অনেকটা আছে।

সিগ্রেটটা কুড়োতে গিয়ে কুড়োল না মোহন। পা বাড়াল সামনের দিকে। খানিক গেলে ফসলের মাঠ। এখন শূন্য হয়ে আছে। কাটাধানের মুড়োগুলোয় শিশির জমে চকচক করছে। পায়ে পায়ে তাই খস্ খস্ শব্দ ওঠে আর শিশিরের জল ছলকে পড়ে। সে দ্রুত হাঁটতে থাকল। মাথার ওপর বুনো হাঁসের ডানার শব্দ। তারা বিলের দিকে চলেছে। দিগন্তে এতক্ষণে ভাঙা চাঁদ ভেসে আসে—জ্যোৎস্না না বিষণ্ণতা, পরতে পরতে ক্ষয়ের মলিনতা তার!

সড়কে পৌঁছে একটু থামল সে। বাঁশীর সুর ভেসে আসছে দূর থেকে। গোবরা বাজাচ্ছে বুঝি। ও বাঁশী হয়তো বাঁশী নয়—ইংগিত। কোথায় গুণ্ডামী ডাকাতির জন্যে হানা দেবে—তারই ডাক। চেলারা কোথায় ওৎ পেতে আছে কে জানে!

বাঁশীর সুর নির্জন নিশুতি রাতে ভালোই লাগে। কারণ বাঁশীর সুরে ডাক থাকে ভালোবাসার। ভালোবাসা ভালোবাসাকে ডাকে। একটি পবিত্রতা আরেকটি পবিত্রতাকে কাছে টানতে চায়।

কিন্তু এ বাঁশীর সুর পাপের। পাপ ডাকছে অরেক পাপকে।

মোহন হনহন করে চলতে গিয়ে দেখল—তার পা ওঠে না। পেছনে কি ফেলে এল—বড় কষ্ট হয়। তার চোখে জল এল। গোবরা যেন তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে এতদিনে পুরোপুরি নিঃস্ব করে ছেড়েছে।

মেলায় আর সে আসবে না। কোনদিনও আসবে না।

॥ পাঁচ ॥

শরৎকালে ফসলের মাঠ দেখে মোটামুটি একটা ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, মেলা জমবে কি না। সকল স্ফুর্তির উৎস তো ওখানেই। গ্রামবাংলার মানুষ যা কিছু সুখদুঃখ ভালোমন্দের আগাম পরিমাপ করে, তার সবখানি ওই উৎস থেকে প্রবাহিনী।

এবারে শরৎকাল দেখে মনে হয়েছিল সুমুখে জীবন সুখসম্ভবা। আর শরৎ থেকে শীতকাল অব্দি যে সব দুঃখিনী বিত্তহীনা গ্রামকন্যারা মাঠে মাঠে ধানের স্খলিত শীষ কুড়িয়ে ফিরেছে, তাদেরও অনেক রাতের প্রতীক্ষার পর সুখের স্বপ্নের মতন মেলার দিন এসে গেল।

মেলা, মেলা! একঝাঁক স্বর্গের পাখিরা উড়ে এসে পৃথিবীর কোন প্রান্তরের প্রান্তে বসে পড়ল যেন। তখন সেই মাঠে মাঠে দিন কাটানোর ক্লান্তি, রোদ বৃষ্টি শীতের সকল ক্ষয়, ক্ষিপ্রহাতে মুছে ফেলেছে শরীর থেকে, মন থেকে। মাঠচরানী মেয়ে তার শতচ্ছিন্ন আটপৌরে শাড়ীটি খুলে প্যাঁটরা থেকে বের করেছে চাঁপারঙ লালপেড়ে বিয়ের শাড়ী—অপটু ভাঁজে অজস্র কুঞ্চনে দলাপাকানো সেটা। গত মেলায় কেনা পারাচটা ছআনা দামের আয়নার সুমুখে পা বিছিয়ে বসেছে রাঙামাটিতে নিকনো তকতকে দাওয়ায়। কপালে টিপ আঁকছে। আলতা পরছে পায়ে। দু'পয়সার নারকোল তেলে রুক্ষ চুল করেছে চিকণ। পরিপাটি খোঁপা বেঁধে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুখ দেখছে। দাওয়ায় বিকেলের ফিকে রোদ। উঠোনে দাঁড়িয়ে যুবাপুরুষ—তাকেও শোভন করে এই

রোদ, সজ্জা, যাত্রার সময় আর ব্যস্ততা। তার চোখেও উৎসবের ঘোর লেগে আছে।

মাঠের পথে মিছিল শেষ বেলায়। যেদিকে চোখ যায়, অন্তহীন ছুটে আসা। মেলা, মেলা! রক্তে দোলা লাগে। এক আনায় কেনা নাগিনী-বাঁশী রাতের মাঠে বাজাতে বাজাতে মা বাবার সঙ্গে ঘরে ফিরবে যে শিশুর দল, তারাও কেমন করে টের পায় রক্তের ডাক। শূন্য মাঠ পূর্ণ হয়ে ওঠে শিশুরকণ্ঠের অস্ফুট কোলাহলে।

ক'দিন পরে ভোজবাজীর মতো সব মিলিয়ে যাবে—পড়ে থাকবে শূন্য রিক্ত প্রান্তর, হাওয়ার হাহাকার, ভাঙা খেলনার টুকরো, ছেঁড়া রঙীন কাগজ, এঁটো শালপাতা, অজস্র কয়লা-পোড়া ছাই আর মাটির বুকে ক্ষতচিহ্নের মতন গর্তগুলি। দু'টি-একটি নেড়ী কুত্তা তখনও ঘুরঘুর করবে। শুঁকবে।

কোথায় মিলিয়ে গেল সব? যারা ছিল অখণ্ড, কোথায় ছিটকে পড়ল খণ্ড খণ্ড হয়ে—কোন পাত্তা নেই।

আর সেই স্বপ্নাবসানের নিষ্ফল প্রান্তরে তখনও হয়তো সাবিত্রীর মতো কোন অবোধ মেয়ে একা-একা বিচরণ করবে। কিছু খুঁজবে। কারণ তার চোখ চারপাশে ছিল না, আকাশে ছিল না, অন্য কোন দৃশ্যরাজীতে নয়—শুধু মাটিতে। অবিচল সংহত মাটির ওপর ছিল নিবিষ্ট দৃষ্টিপাত। সে খুঁজছিল সবার পরিত্যক্ত কোন দ্রব্য, অবহেলায় মূল্য না বুঝে ফেলে দেওয়া কোন জিনিষ—যার সার্থক ব্যবহার সে ছাড়া কেউ জানে না। পৃথিবীতে মানুষের কাছে নিষ্ফল দ্রব্যরাশির জগতে সে যেন এক অলৌকিক জহুরী। সে খাঁটি জিনিষটি চেনে।

সে চারপাশে কান পাতেনি কোলাহলে। আনন্দের কণ্ঠস্বর সে শোনেনি। নাগিনীবাঁশীর সুর, তাঁবুর দরজায় ব্যাণ্ডের বাজনা, ক্লাউনের চিৎকার, সিনেমার মাইকে ফিল্মের তীব্র গান, শেষরাতে জুয়াড়ীদের হা হা হা হা অট্টহাসি আর সর্বস্বান্ত মাতালের নেশাটুটে যাওয়া আর্তনাদ,……কিছু শোনেনি সে। আর যে তুখোড় ছোকরা 'লে লে বাবু ছে ছে আনা' বলে চিৎকার করছিল, যে চানাচুরওয়ালা মাথায় ছুঁচলো টুপি, চিত্রবিচিত্র জামা-পায়জামা পরে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচছিল—গাইছিল…কিংবা পট বিছিয়ে বসে থাকা চতুর শহুরে দেহতত্ত্ব-জ্ঞানী…এই যে দেখুন, এই হচ্ছে আপনার হৃদয়, এই হচ্ছে পাকস্থলী, ওটা মূত্রাশয় আর উনি হচ্ছেন সেই শুক্রাধার……

কোন শব্দে সে কর্ণপাত করেনি।

অথচ কি অবাক, সেই সাবিত্রী শূন্য ময়দানে ঘুরে ঘুরে হঠাৎ কখন ক্লান্ত, বিষণ্ণ

আর কেন যেন ক্ষুব্ধ—মুখ তুলে তাকায় চারপাশে, একি, ভাঙা হাটে অবসানের নিষ্ফলতায় সে একা দাঁড়িয়ে আছে যে! কোথায় গেল তারা? শব্দহীন ধূসর ধ্বংসস্তূপে সমাকীর্ণ মহাশ্মশানের সর্বগ্রাস এখানে। হাওয়ায় হাহাকার আছে, রোদে বিষণ্ণতা আছে, ঝরা শুকনো পাতার কাঁপন আছে। আর কিছু নেই।

চোখে জল আসে। কি পাবার আশা ছিল, পাইনি।

মুঠো আলগা হয়ে যায় একটু করে। রাঙতার কাগজগুলো খসে পড়ে টুপটাপ। সাবিত্রীর চোখে জল। সাবিত্রী ফিরে যায় ঘরের দিকে। সেখানেও তো কিছু পাবার মতো নেই।… …

পরের বছর তবু আসতে দ্বিধা নেই। ফের…তেমনি করে মাটির ওপর চোখ রেখে ঘুরে বেড়ানো। ফের পাবার আশায় রক্ত চনমন করছে।

বিনোদিনীর দোকানের সামনে আসতেই বিনোদিনী ডাকল, এই আঁটকুড়ি, শোন্।

গালমন্দ গায়ে মাখে না সাবিত্রী। ঘরে মামার কাছে অষ্টপ্রহর খেয়ে সব কানসওয়া। তবে বিনোদপিসির গাল নয়, আদর। সে মুখ তুলে তাকাল।

একবছরে যে আমার টাট ছাড়িয়ে মাথা তুলেছিস রে! ডাগর বিরিঞ্চি যেন!

সাবিত্রী চাপা মেয়ে। কথা বলে কম। শুধু হাসল।

বিনোদিনী ডাকল, অ নিশি, নিশি রে, মজা দেখে যা…

নিশি ভেতরে গড়াচ্ছিল। মেলায় এসে যেন ঝিমুনিতে পেয়েছে তাকে। ফাঁক পেলেই খুপরীতে ঢুকে পড়ে। চুপচাপ শুয়ে থাকে। সে শুয়ে শুয়ে জবাব দিল, যা বলবার ওখান থেকেই বলো। চেঁচাচ্ছ কেন?

বড় জাঁক বেড়েছে মেয়েটার। বিনোদিনী মুখ বিকৃত করে বলল, শুধু পোয়াতী মেয়ের মতন হাই তোলা আর শোওয়া! তোর হয়েছে কি রে মাগী?

নিশিও গলা তুলে বলল, মিছিমিছি গালমন্দ করো না বাপু। কি দোষটা করেছি, শুনি?

না, মজাটা দেখানো যাবে না। বিনোদিনীর মুখ বেজার হয়ে গেল। এই মেয়ের হাতে সে সব দায় তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছে!

সাবিত্রী ততক্ষণে একটুকরো লাল সেলোফেন কাগজ দেখতে পেয়েছে কাঠের তাকে। একটু এগিয়ে সে প্রায় ফিসফিস করে বলল, ওই কাগজটা দেবে?

কেন কে জানে, হয়তো নিশির ওপর প্রবাহিত স্নেহধারাটা হঠাৎ মোড় ফিরে সাবিত্রীর ওপর পৌঁছে গেল সে-মুহূর্তে। বিনোদিনী তাক থেকে কাগজটা নিয়ে

বলল, এই নে। মোহন এনেছিল কোত্থেকে। মুখপোড়ার কেমন শখ দ্যাখ না, বলে—ডেলাইটে মুড়ে দিও পিসি, সব লাল রঙ হয়ে যাবে—পানের যেমন রঙ,…

বিনোদিনী না হেসে পারল না।

সাবিত্রী ভয়ে ভয়ে কাগজটা নিল। বার বার হাত বুলিয়ে দেখছিল সে। তারপর তেমনি চাপা স্বরে বলল, সত্যি পিসি, ছুঁতে কেমন লাগে… গা শিরশির করে। কোত্থেকে এগুলো আনো পিসি?

বিনোদিনী অভিজ্ঞ মুখভংগীতে বলল, কলকাতা থেকে।

আমার কলকাতা যেতে সাধ হয়। কতদূর কে জানে! সেখানে কি আছে গো?

সেখানে? সেখানে অষ্টপহর এমনি মেলা। বুঝলি? বিনোদিনী যেন জমে গেল কথা বলায়। এ মেলা তো এক মাসেই শেষ। সেখানে টানা চলেছে—সেই কবে থেকে, তার ঠিক নেই। আর জানিস রে মেয়ে…

সাবিত্রী উৎফুল্লভাবে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিশি বেরিয়ে এল সেই মুহূর্তে।

চোখদুটি ফোলাফোলা—গালে চুড়ির দাগ। ছায়ার ঘাসের মতন ঈষৎ বিবর্ণতা তার মুখে। সাবিত্রী ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। খুবই চেনা মনে হয়।

নিশি ধুপ করে বেঞ্চে বসে বলল। কই, কি মজা?

বিনোদিনী গোমড়া মুখটা একবার ওপাশে ফিরিয়ে ফের সাবিত্রীর দিকে বাগল। হ্যাঁ অষ্টপহর চলছে সেখানে। চোদ্দটা মেলার মানুষ গিসগিস করছে… আর ট্রাম বাস লরী… ঢোক গিলে বলল, তোমার গিয়ে, ভালো-মন্দ পাঁচরকম তো সংসারে রয়েছে, তার সবগুলোকে একত্তর করলে যা হয়।…

সাবিত্রী নতমুখে নাক খুঁটছিল। কে নিয়ে যাবে তাকে! কোন আশাই নেই। তার চেয়ে রানীচকই ভালো।

নিশি বলল, এই তোমার সেই সাবি বুঝি? তাই বলো। এই বলে সে উঠে গিয়ে সাবিত্রীর হাত ধরে টানল। এই, আমার সঙ্গে একটু যাবে?

সাবিত্রী লজ্জানত মুখে বলল—হুঁ।

ওদিকে বিনোদিনী লাফিয়ে উঠেছে। মুখ ভেঙে দেব, জানিস? এত বলছি, অমন করে ঘুরিস না যেখানে সেখানে, গেরাজ্জি নেই! দংশালে তখন ছটফট করবি হারামজাদী। ওঝা ডাকবে কে?

কেন, তুমি আছো কি করতে?

নিশি সাবিত্রীর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। বিনোদিনী এত ক্রুদ্ধ হয়ে গেছে

সে কি করা উচিত ভেবে পাচ্ছিল না। এত লোকজনের সুমুখে অতবড় মেয়ের গায়ে হাত তোলা দূরে থাক, টানাটানি করতেও লজ্জা হয়! ছি,ছি, কি কুক্ষণে ওকে মেলায় রাখবার সংকল্প সে করে বসেছিল। নিজের ওপর ক্ষোভে ভেঙে পড়ছিল বিনোদিনী।

ওখানে প্রহ্লাদের দোকানের সামনে একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় কাঠের বাক্সে মাল এসেছে কলকাতা থেকে। ভূতে-পাওয়া মানুষের মতন প্রহ্লাদ ব্যতিব্যস্ত। ঝাঁকড়া চুল কপাল কান ঢেকে ফেলেছে তার—গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জী, গলায় সরু সোনার চেন, বাহুতে সোনার তাগা, ধুতিটা হাঁটু অব্দি মালকোঁচা মারা।...প্রহ্লাদের বুকের ঘন রোমগুলি দেখিয়ে সাবিত্রী ফিসফিস করল—ভালুক। তারপর পেটটা দেখিয়ে ফের বলল—ভুঁড়ি!

নিশি আঁচলে মুখ ঢেকে হাসল। মেয়েটির রসকস কিছু আছে তাহলে। নিছক মিনমিনেটি নয়। তার খুবই ভালো লেগে গেল। সাবিত্রীর কানের কাছে মুখ এনে সে হঠাৎ বলল, মিষ্টি খাবে?

সাবিত্রী হাঁ করে তাকিয়েছে। তার চ্যাপটা মুখখানিতে কেমন অসহায়তার থমথমানি হঠাৎ। ঈষৎ স্থুল নাকের ফুটোদু'টি কুঁচকে উঠছে ঘনঘন। নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে গেছে তৎক্ষণাৎ। তারপর অর্ধস্ফুট কণ্ঠে সে বলে উঠল, কেন?

নিশি না হেসে পারল না। কেন! মিষ্টি খেতে ভালোবাসো না বুঝি? আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে। পিসিকে লুকিয়ে মিষ্টি খাই...

সাবিত্রী যেন আরও আড়ষ্ট হয়ে উঠছে। সে ক'বার দ্রুত তার রুক্ষ ছোট ছোট চুলওলা মাথাটা ঝাঁকি দিল। সেই সময় চুলের ভিতর থেকে একটা লাল প্লাস্টিকের কাঁটা টুপ করে খসে পড়ল মাটিতে! নিশি হেঁট হয়ে কুড়িয়ে নিল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর দেখল, সাবিত্রী তার দিকে পাশ ফিরে আড়চোখে চাইতে চাইতে চলে যাচ্ছে বটতলার ওদিকে। ভীষণ অবাক হয়ে গেল নিশি। পাগল নাকি মেয়েটা? সে অনুসরণ করতে থাকল তাকে। এই সাবি, শোন, শোন...কথা আছে! তোমার কাঁটাটা নাও।

সাবিত্রী তখন প্রায় দৌড়চ্ছে। মন্দিরের পাঁচিলের পাশে পাশে সে ছুটে চলেছে। রোখ চেপে গেল নিশির। ছুঁড়িটা ধিঙ্গি বয়সে লোকজনের সুমুখে এমন করে ছুটতে পারে! নাকি লুকোচুরী খেলছে? অর্ধেক কৌতুক অর্ধেক ক্রোধ নিয়ে নিশিও পাল্লা দিয়ে ছুটতে থাকল। আর ছুটতে ছুটতে সে দু'একবার পেছন ফিরে দেখে নিল—কেউ তাদের এ দৌড়বাজীর তামাশায় চোখ রেখেছে কি না।

নাঃ, সব দোকানের ঠাট সাজাতে ব্যস্ত। বাইরের লোক তেমন কেউ নেই! মেলা এখন সাজঘরে রয়েছে—শিবরাত্রির এখনও দু'টি দিন বাকী। তবু যদি কেউ শখ করে উঁকি মারতে চায়, আসে সেই পড়ন্ত বেলায়। সারা দিনের সব কাজ সেরে নাওয়া-খাওয়া-ঘুম চুকিয়ে—অল্পস্বল্প ফিটফাট···ঘুরে ফিরে ভবিষ্যতের ছবিটি মনে মনে এঁকে·নিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে যায় ঘরে।

সুতরাং নিশি এখন যতখুশি ছোটাছুটি করতে পারে। আস্তে আস্তে একটা উগ্র চপলতা তাকে পেয়ে বসছিল। আজ সকালটা বেশ মজায় কাটছে যা হোক্‌। সাবিত্রীর ওপর রাগটুকু তখন উবে গেল তার। আঃ, কতদিন আগে এমনি নিঃসংকোচ ছোটাছুটি লুকোচুরির পালা শেষ হয়ে গেছে বীণাদির সঙ্গে!

দেখল সাবিত্রী এবারে ভাঙা পাঁচিল গলে প্রাঙ্গণের ওদিকে চলে গেল। সে ডাকল, সাবি, এই সাবি! তারপর সেখানে পৌঁছে হুড়মুড় করে পাঁচিলটা পেরোতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ওই ঘরে সেই গোবরা থাকে না? আর সঙ্গে সঙ্গে গুরুতর ত্রাসে তার বুক কেঁপে উঠল। সাবিত্রী যে ওর মুখোমুখি গিয়ে পড়বে!

নিশি লাফ দিয়ে প্রাঙ্গণে নামল। কোমরে আঁচলটা শক্ত করে বেঁধে নিল। সাবিত্রী ভাঙা ঘরের ভেতর ঢুকে গেছে। দেওয়ালের গায়ে-গায়ে ভাঙা ইঁটের ওপর হাঁটছে। মধ্যে মধ্যে তার কাপড়ের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। নিশি তীব্র বিরক্তিতে চেঁচিয়ে উঠল, এই সাবি, সাবিত্রী!

কোন পাত্তা নেই। সাবিত্রী ভোজবাজীর মতন শূন্যে মিলিয়ে গেছে একেবারে। হলো কি মেয়েটার? এ রকম অদ্ভুত ব্যবহার করার কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছে না নিশি। ইচ্ছে ছিল, দু'জনে একটু ঘুরে ফিরে বেড়াবে। তারপর মন্দিরের সীমানা ছাড়িয়ে চলে যাবে রানীচকের কাছাকাছি। স্কুল-বাড়ির গেটে যে লতিয়ে ওঠা ফুলের গাছটা রয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে কিছুক্ষণ। ফুল দেখবে, স্কুল দেখবে। ওখানেই ইলেকটিরি লাইন—থামে কাঁটাতার জড়ানো আর লাল প্লেটে লেখা আছে 'এগারো হাজার ভোল্ট, সাবধান,' একটা মড়ার মাথা ও দুটো আড়াআড়ি আঁকা হাড়···গাড়ি চেপে আসবার দিন দেখেছিল। কৌতূহলটা প্রথমে যদিও নিতান্ত একটা অলস ইচ্ছার আকারে ছিল, এখন সাবিত্রী চলে যাওয়াতে, যেন তীব্র হয়ে উঠছে। দু'দিন পরে মেলা জমে উঠলে আর কি এমন করে ঘোরা যাবে? মেলায় যা কিছু এসেছে সবই দু'বেলা প্রতিদিন ঘুরে দেখাশুনা শেষ। এর বাইরের কিছু দেখবার বড় সাধ

জাগে মনে। ভুবনপুরে পিঞ্জরে যদিও ছিল না, এখানে এসে মনে হয়েছিল—সে পিঞ্জরমুক্ত পাখির মতন আড়ষ্ট ; ডানামেলার লোভে অধীর হয়ে উঠেছে।

সাবি, সাবিত্রী! নিশি শুকনো গলায় আর্তনাদের সুরে চেঁচাল। আর তার শ্বাসে জড়ানো ক্লিষ্ট কণ্ঠস্বর রুদ্রদেবের মন্দিরে পায়রার ডানার শব্দের মতন ঝাপটানি তুলে চুপ করে গেল। সাবিত্রী! প্রতিধ্বনি উঠল চুপিচুপি। ফাল্গুনের হাওয়া এল বটগাছের শাখায় শাখায়। কচি ফিকে সবুজ রঙের পাতার গায়ে গা ঘষতে ঘষতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নেমে গেল শুকনো হলুদ পাতাগুলি। ঝর ঝর সর সর···

সে জানে না, কেন—একটা গভীর শূন্যতার দিকে তলিয়ে যাচ্ছিল নিশি। কোথাও একটা ব্যর্থতার ক্ষীণ সুর···কাল শেররাতে শোনা বাঁশীর সুরটার মতন, কোথাও হারস্বীকারের গোপন লজ্জা। চারপাশে একটা উদ্দেশ্যহীনতার জগৎ ধূসর হয়ে অপেক্ষা করছে।···অভিমানে অপমানবোধে কাতর নিশি আস্তে আস্তে ফিরে আসছিল। তার চোখ ছলছল করছিল। তারপর পাঁচিল পেরিয়ে এসে মনে পড়েছিল, রুদ্রদেবকে প্রণাম করে আসা হলো না তো। সে সেখানেই ঝুঁকে পড়ে একটু ধুলো তুলে মাথায় নিতে গেল। আর অবাক হয়ে দেখল—সাবিত্রীর হাতের সেই লাল সেলোফেন কাগজটা পড়ে রয়েছে। কুড়িয়ে নিয়ে কাঁটাটার সঙ্গে জড়িয়ে রাখল সে। কিন্তু মিষ্টি খাবার কথা শুনে সাবিত্রী এমন অদ্ভুত আচরণ করল কেন? হয়তো ছিট আছে মাথায়। নৈলে, এই বয়সে এখনও এমনি করে একা একা ঘুরে বেড়ায়? বুকটা ভালো করে ঢাকতেও শেখেনি সে!

দ্বিজু ঘোষালের বড় সাধ ছিল—ইলেকট্রিক আলো এবার রুদ্রদেবের মেলাতেও জ্বলুক। এক সময়ের প্রখ্যাত জমিদার রাজা ত্রিভুবন সিঙ্গি মশাইরা তিনতরফে এইগুলির মালিক—তাঁরাও তদ্বির করেছিলেন। মহাদেব ঠাকুর বংশপরম্পরায় রুদ্রদেবের সেবাইত। তিনি বলেছিলেন, অন্তত মন্দির অব্দি আসুক···

সম্ভব হয়নি কোনমতে। গ্রামের বাইরে এত দূরে লাইন আনতে অনেক অর্থ; অনেক শ্রম দরকার। তাছাড়া নিতান্ত একমাসের জন্যে এত হাঙ্গামার কোন মানে হয় না।

কিন্তু দ্বিজু ঘোষাল এতে কিঞ্চিৎ মনমরা হয়ে গেছেন। সত্যি বলতে কি, এই মেলার দেখাশোনা দায়দায়িত্ব বরাবর তাঁর হাতেই অর্পিত হয়ে থাকে—অন্তত যখন থেকে চাকরী নিয়েছিলেন সিঙ্গীমহালে। তাঁর আগে যিনি ছিলেন, তাঁর

নাম নন্দ সরকার। তাঁর অনেকরকম বদনাম ছিল। মদ মেয়েমানুষ জুয়া··· পুরুষের পক্ষে চূড়ান্ত নেশা এই। তা তাঁর বাকী ছিল না। তাতে মাতাল নন্দ সরকার জুয়োয় হেরে গেলে দোকানদারের কাছে চোখ বুজে হাত বাড়াতেন। ধারের নামে নেওয়া টাকা শোধ আর হতো না কোনদিন। জবরদস্তি আদায় করতেন নন্দবাবু। না দিয়ে পার নেই। দশাসই সাড়ে ছ'ফুট লম্বা গৌরবর্ণ পুরুষ—খাড়া নাক, ছুঁচলো গোঁফ—যাত্রাগানের রাজার মতন চেহারা—তেমনি গম্ভীর কণ্ঠস্বর। দ্বিজু ঘোষাল নিতান্ত গোমস্তা—তিনি ছিলেন নায়েব। সুতরাং দাপট ছিল একশোগুণ বেশী—তাতে স্বয়ং সিঙ্গিরাও তাঁকে বড় মান্ত করতেন।

বিনোদিনী সে আমলে যুবতী। নন্দ সরকারের নাম করলে আজ সে চোখ বুজে করজোড়ে বলে, যত দোষই থাক, অমন আর দু'টি হয় না। দ্বিজু তো মানুষ, ও ছিল স্বয়ং জগদ্ধাত্রীর বাহন।

শুনলে মুচকি না হেসে পারা যায় না। ভালোবাসার চোখের বুঝি বয়স নেই। অমন করে বলতে একটুও লাজলজ্জার বালাই নেই বিনোদিনীর—অথচ একদিন···

সে পুরোনো কথা। পুরোনো কথা সবকালেই মোহময়—কেবল ভালোবাসায় মোহহীন। ভালোবাসা তাৎক্ষণিকতার দীপ্তি—যতক্ষণ জ্বলে, উত্তেজনা থাকে। নিভে গেলে স্মৃতির ভস্মে ধূসর হয়ে আর সুখ নেই।

আজও বেঁচে আছেন নন্দ সরকার। মেলা উদ্বোধনের দিন চারপায়া চেপে আসেন বাহকের কাঁধে। প্যাণ্ডেলের ওপর তাঁকে তুলে বসানো হয় সিঙ্গিমশাইদের পাশের চেয়ারে। থলথলে রুক্ষ চামড়া, অজস্র কুঞ্চন, চোখের নীচে গভীর কালো ছোপ—উচ্ছৃংখলতার চিহ্ন লুকিয়ে রাখা যায় নি। পাপ যেন তার শীলমোহর রেখে গেছে মুখশ্রী বর্ণ আর উজ্জ্বলতার ওপর। সে যাবার সময় বলে গেছে বুঝি—এবার ক্ষয় হয়ে যাও।

মেলার অবস্থা এমন করে তুলেছিলেন—ভয়ে কোন দোকানদার আসতে চায় না রানাচকে। শূন্য ময়দান পূর্ণ হতে চাচ্ছিল না। কেবল বিনোদিনী—ওই বিনোদিনীই সবার আগে এসেছিল। ঘটা করার চেষ্টা হলো বিস্তর—কলকাতা থেকে সায়েব লাটবাহাদুর আসবার কথা রটানো হলো। তবু কারুর পাত্তা নেই। আর সেই নিস্ফল জনশূন্য মেলায় বিনোদের দোকানে বসে নন্দ সরকার চারদিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ বলে উঠেছিল, ও বিনোদ আমি যাই।

সে কি গো? এই তো এলে! একখিলি মোহিনী সেজে দিই··

না বিনু, থাক।

শরীর খারাপ করছে না তো?

না রে, আমার ভালো লাগছে না।

কেন গো?

নন্দ সরকার ম্লান হেসে বলেছিলেন, এই জায়গাটা এতদিনে কত লোকজনে গমগম করত। আলো গানবাজনা হল্লা···আজ দেখছিস্? শ্মশান হয়ে রয়েছে। লোকে আসতে চায় না। এসে কি করবে? কিছু তো নেই। বুঝলি বিনু, বছরে এই তো একটা সুসময়—ধান ওঠার পর দু'পয়সা হাতে থাকে। যার ধান নেই, তারও খাটনি থেকে কিছু হাতগরম হয়। এই সময় কত কেনাকাটা ফুর্তি সাধ আহ্লাদ! সবাই আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে রে···আর আমি এখানে আসবো না। কোনদিনও না। বলতে বলতে উঠে পড়েছিলেন নন্দ সরকার দীর্ঘ শীর্ণ শরীরখানি নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে। যেন চোখের সুমুখে ধূসর হতে হতে, দূরে মিলিয়ে যাচ্ছিল। বিনোদিনীর চোখ ছলছল করছিল। দ্যাখো, পাপ কেমন করে ভালো জিনিসটিকে ক্ষয় করে দেয়।

যাবার সময় তার হাতের একখিলি পানও মুখে নিল না নন্দ সরকার! আর কি কোনদিন তার ঠোঁটে নিজের হাতে গুঁজে দিয়ে বলতে পারবে—তোমার ঠোঁট দু'টিকে টিয়াপাখির ঠোঁট করে দিয়েছি গো···! ···তখন যুবতী মেয়ে—হালকা কথায় সুখ আসে মনে, চটুল কথা পিকের মতো ঠোঁটের উপর দিয়ে ছিটকে পড়ে অন্যকেও রাঙিয়ে দেবার দুষ্টুমি সাধ জাগে।

নন্দ সরকারের ঘরে জহ্লাদ বৌ। সেখানে যাবার সাহস নেই। আর কোথাকার তুচ্ছ এক হাঘরে পানওয়ালী মেয়ে কোন্ মর্যাদায় সরকার বাড়ির গেট পেরিয়ে একেবারে দোতলায় উঠে যাবে!

সেই শেষ। মেলার ভার নেন নি নন্দ সরকার। পরের বছর ঢ্যাড়া পেটান হলো—দ্বিজু ঘোষাল মেলার ভার নিয়েছে। আর ভয় নেই! মেলা জমতে দেরী হয়নি পরের বছর। দ্বিজু ঘোষাল যেমন সরল, তেমনি ক্ষেত্র বুঝে কঠিন মানুষ। তাতে মদ-জুয়া-মেয়েমানুষের ওদিকে নেই। নন্দ সরকার প্রতিবছর মল্লারপুর থেকে দেহব্যবসায়িনী ঝুমুর আনতেন। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে নাগর পুরুষরা ওই মধ্যস্থলের আসরে পেলা ধরত—বুকে বুক মিশিয়ে পয়সা নিত ঝুমুরওয়ালীরা—এলোকেশী, তুফানী, চাঁপা, গৌরী! অনেক নাম স্মৃতিতে বেঁচে আছে। কোথায় আছে তারা? এলোকেশীকে দেখবার জন্য স্কুলের বোর্ডিংয়ের ছেলেরা লুকিয়ে লোকের ভীড়ে চুপিচুপি বসে থাকত। মাথায়-মুখে কম্ফটার জড়ানো। কেবল চোখ দু'টি জাগছে। সাহস করে কেউ

পেলা ধরেও ফেলত। একটু দূরে—আলো যেখানে কিছু আবছা, সেখানে উবু হয়ে বসে হাত তুলে থাকত। নাচতে নাচতে গিয়ে এলোকেশী একেবারে কোলে বসে পড়েছে। তারপর··

চারপাশে অশ্লীল চিৎকার। হল্লা। উত্তেজনার তুফান। মানুষ যেন তখন পশুর অধিক হয়ে গেছে। বিনোদিনীর মনে পড়ে—ওই লতিফ ঠিকাদার তখন সামান্য খুচরো পয়সার পুঁজি নিয়ে ডিম কিনে বেড়াত গ্রামে গ্রামে। তখন তামার পয়সার প্রচলন। এক পয়সায় একটা ডিম। একরাতে লতিফ যেন পাগল হয়ে উঠেছিল। থলি থেকে একটি করে পয়সা বের করে আর পেলা ধরে। ঝুমুরওয়ালী গাইতে গাইতে কাছে আসে···

মন যারে চায় না, সে কেন আসে গো, মিছে করে জ্বালাতন।

গাইতে গাইতে সে ছোঁ মেরে পয়সাটি তুলে নেয়। কোমর দুলিয়ে নাচতে নাচতে ফিরে যায়। তখন ফের লতিফ আর একটা পয়সা বের করে। গুঙিয়ে ওঠে· এই যে, এই যে!

ফিরে আসে মেয়েটি পরের কলি গাইতে গাইতে—

মনের মতন সাথী পেলে গো, তুষ্ট হবে আমার মন॥

অমানুষিক জেদে লতিফ তাকে আটকে রেখেছিল—যতক্ষণ না সব পয়সা ফুরিয়ে গিয়েছিল। এ যেন নিজের জীবনের ওপর বাজীধরা। কি সুখ পাচ্ছিল সে? ভোরবেলায় সেই লতিফ চুপিচুপি এসে ভীতমুখে কাঁপানো গলায় বিনোদিনীকে ডেকেছিল, পিসি, একটা কথা বলছিলাম··

কি রে?

আট আনা পয়সা ধার দেবে? মাইরি, ডিম কেনবার পয়সা ফুরিয়ে গেছে।

দূর, দূর মুখপোড়া!

লতিফ কঁকিয়ে উঠেছিল, কাল ঘরে হাঁড়ি চড়বেনা বিনোদপিসি গো! হুমড়ি খেয়ে পা জড়িয়ে ধরেছিল। এ আমি কি করলাম, ঘরে আমার চারটে ছেলেমেয়ে, যুবতী বৌ ··পিসি গো, এ আমি কেন করলাম!·····

সত্যি, সে-যুগে মানুষগুলো যেন আস্ত জানোয়ার ছিল সব। লজ্জা সংকোচের বালাই ছিল না চোখে। আজ সে-দৃশ্য ভাবতেও গা ঘিন ঘিন করে। ঝুমুরওয়ালীদের আজকাল দেখা যায় না।

দ্বিজু ঘোষাল এসেই ঝুমুর বন্ধ করে দিয়েছিল সেবার থেকে। তবু ভীড়ের কমতি নেই। আসলে মানুষ মেলায় সত্যি করে কী চায়, কী পায়, তা কি জানে? একটা উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খেয়ে যায় কিছুক্ষণ।

উত্তেজনার আগুনে নিজেকে সেঁকবার সাধ শুধু। আর সব উত্তেজনাই ক্ষণিক—অবসানের পর ক্লান্তি শ্রান্তি। আনে শূন্যতার দিন।

ওই শূন্যতার দিনগুলো দ্বিজু ঘোষাল বড় কষ্টে কাটায়। তাই এই মেলা ওর কাছে তীর্থের মতন পবিত্র। মেলাটা সুন্দর করতে তার চেষ্টার ক্রটি থাকে না। শিল্পীর মতন নিপুণ আঁকজোকে মালমসলা দিয়ে রঙ দিয়ে তুলি দিয়ে আঁকে. সহস্র জলপদ্মের শোভা ওই মেলা।

ভেবেছিল বিজলী আলোর ঝলকানিতে উজ্জ্বল করবে। হলো না। সদর থেকে ফিরে মনমরা হয়ে এসে বিনোদের দোকানে বসে ছিল সে। একটা দুঃখের হাওয়া মনে বইতে থাকলে, তার ঝাপটানিতে অন্য অন্য দুঃখের কথাও মাটিতে শুয়ে-থাকা শুকনো পাতার মতন কেঁপে ওঠে। শব্দ করে। দ্বিজু ঘোষাল তার স্ত্রীর মৃত্যুর কাহিনী শোনাচ্ছিল। ছেলেমেয়েদের বড় কষ্ট। তাই অবশেষে সোনারপুরের আশু মাস্টারের বড় মেয়েকে‥ ‥‥

ওপক্ষের ছেলেমেয়েদের প্রতি ভালোবাসায় ফাঁক নেই। তবু কেমন যেন ‥‥মাথা চুলকে একটু হাসছিল দ্বিজু ঘোষাল। বিনোদিনী পান এগিয়ে দিয়ে বলল, বয়েস বুঝি কম?

দ্বিজু ঘোষাল পান চিবুতে চিবুতে কি একটা জবাব দিল, বোঝা গেলনা। তবে যেটুকু বোঝা যায়—দ্বিতীয় পক্ষে খুব একটা সুখ-টুখ নেই। ও তো জানা কথা।

বিনোদিনী ছড়া কাটল—প্রথম পক্ষের বৌ হেলা-ফেলা, দ্বিতীয় পক্ষের বৌ গলার মালা! তবে একবার যাবে বিনোদিনী, দেখে আসবে। প্রভাবতীর মুখ মনে পড়লে তার অনেককিছু মনে পড়ে। তুচ্ছ পানওয়ালীকে সে কত না ভক্তিশ্রদ্ধা করত—যেন স্বজাতি কুটুম, রক্তের সম্পর্ক রয়েছে।

অন্ধকার ঘন হয়ে এল। আজ ত্রয়োদশী। কাল শিবরাত্রি। সকাল থেকে শুরু হবে হইচই। শিবের মাথায় জল ঢালতে হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে। একসঙ্গে দুই শিবের মাথায় জল ঢালতে নেই। দুই শিবপূজো একসঙ্গে বারণ। তবে রুদ্রদেব—শিবেরই তার এক রূপ, তাঁর পূজো আলাদা করে হবে পরের দিন। এ অঞ্চলের পুরোনো লোকেরা জানে—ওটা আসলে বুদ্ধমূর্তি। কোনকালে নাকি মাঘীপূর্ণিমায় তাঁর পূজো হতো। মেলাও বসত ওই মাঘীপূর্ণিমা থেকে। কবে সব উল্টোপাল্টা হয়ে গেল। সে কতকাল আগে, তার কোন হদিস নেই। ত্রিভুবন সিংহের কোন পূর্বপুরুষ নাকি আরেকটা মন্দির আর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হয়তো সেই থেকেই শুরু।

দ্বিজু ঘোষাল হঠাৎ চাপা গলায় বলল, এ বয়সে ও কম্মো কেন করতে গেলে পিসি ?

বিনোদিনী বুঝতে পারল না। সে প্রশ্ন করল, কি করলাম আবার ?

তোমার ভাইঝির কথা বলছিলাম। ওই কচি মেয়েটাকে কষ্ট দিতে আনলে কেন বল দিকি ?

নিশি দোকানের পেছনে ফাঁকা জায়গায় খোলা আকাশের নীচে উনুন ধরাচ্ছে। বিনোদিনী বিকৃত মুখে বলল, কচি না তো, গাল টিপলে দুধের নাল ঝরে !

না পিসি। এটা ঠিক হয়নি। মেলাখেলা বড় খারাপ জায়গা। নানান রকম মানুষ আসে এখানে। নানান প্রলোভনে মানুষের দুর্গতির বাকি থাকে না।

বিনোদিনী একটু চুপ করে থেকে বলল, তোমাকে লুকোবোনা, দ্বিজু। তুমি আমার ছেলের মতো। কিছুদিন থেকে আমার কি হয়েছে, শরীর ভালো যাচ্ছে না—রাতে ঘুমোতে ভয় করে, শুধু কুস্বপ্ন হাঁপানির অসুখটা বাড়বার তালে··· আমার বড় ভয় করে দ্বিজু, হঠাৎ বুক ধড়ফড় করে ওঠে, মনে হয়—মরণ শিয়রে দাঁড়িয়ে রয়েছে···, বিনোদিনী হঠাৎ চাপা ফুঁপিয়ে উঠল—আমি আর বেশীদিন বাঁচবোনা। কখন দেখবে হাতে আধ-সাজা পানের খিলি, ঢলে পড়েছি জন্মের মতো।

দ্বিজু ঘোষাল সহানুভূতির স্বরে বলল, বাড়ি থাকলেই পারো। শুনলাম, ঘরদোরও বানাচ্ছ ভুবনপুরে।

চোখ মুছে বিনোদিনী হেরিকেনের দম বাড়িয়ে দিল। কাল থেকে ডেলাইট জ্বলবে। বিকেলে রাপু কামার এসে সেটা পরীক্ষা করতে নিয়ে গেছে। বরাবর ওইরকম করে সে। একটি পয়সাও নেয় না। একখিলি মোহিনী পান খেয়ে খুশী হয়।

দ্বিজু ঘোষাল ফের বলল, এ বয়সে আর মেলা করা উচিত নয় তোমার।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিনোদিনী বলল, ভেবেছিলাম তাই। ঘরদোর করার সাধ হয়েছিল। কিন্তু রানিচকের মেলার দিন যত কাছে এল, যেন নেশা আমাকে পাগল করে দিলে দ্বিজু। আমি থাকতে পারলাম না। রানিচকের মেলার মত আর কোন মেলা আমাকে এত টানে না।

দ্বিজু ঘোষাল তা বুঝতে পারে। যুবতী বিনোদিনীর সেই দিনগুলোর কাহিনী সে-ও কিছু কিছু জানে। বিনোদিনী আজও নন্দ সরকারের স্মৃতিতে ঘেরা এই মাঠ, এই মাটিটুকুকে পবিত্র তীর্থের মতো মনে মনে আঁকড়ে ধরে থাকে—

যতদূরে যায়, এ ছায়া তার পিছু ছাড়ে না। মাথা ভাঙলেও তো আর সেই দিনগুলো ফিরে পাওয়া যাবে না।

লোচনকে সঙ্গে আনলে আবার নিশিকে কোথায় রাখি একা-একা?

বিয়ে-টিয়ে দেওয়া উচিত ছিল মেয়েটির। বয়সও বাড়ছে। দ্বিজু ঘোষাল মন্তব্য করল।

হঠাৎ বদলে গেল বিনোদিনী। ঝাঁটা মারো ওর মুখে! ওকে আবার কে বিয়ে করবে। না আছে রূপ, না ছিরিছাঁদ—শুধু শোওয়া আর হাই তোলা। বসে বসে ঝিমুনি। মেলায় এসে বরঞ্চ একটু এদিক-ওদিক নড়ছে। ভাগ্যে কারুর গলায় ঝুলিয়ে দিই নি। তার হাড়মাস কালি করত—এই ওর ভালো।

দ্বিজু ঘোষাল একটু হাসল। আসলে বিনোদ পানওয়ালী দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। একটি যোগ্য উত্তরাধিকারিণী প্রতিষ্ঠা করার গোপন ইচ্ছে তাকে এইসব করিয়েছে। তাই ঘর গড়েও ঘরের দিকে পাড়ি জমাতে পারছে না। এ এক আশ্চর্য নেশা মানুষের জীবনে। বিনোদিনী নিজের মুক্তি খুঁজছে এমনি করে। তার নেশার দুরন্ত প্রবাহ তার মৃত্যুতেও যেন থেমে না থাকে। বয়ে চলে ওই নিশির জীবনে! আহা, বেচারা নিশি! ঈষৎ মমতায় কাতর দ্বিজু ঘোষাল বলল, কিন্তু সাবধানে থাকতে বলো ওকে। গোবরার ঘরের ওদিকে যায়-টায় দেখেছি। বারণ করো।

যায় নাকি? বিনোদিনী চমকে উঠল।

হ্যাঁ। তবে গোবরা দেখছি সকাল থেকে নেই। আপদটা আর না এলে বাঁচি।

অন্ধকার থেকে নিশি বেরিয়ে এসে বলল, ও পিসি সর্বনাশ হয়ে গেল।

দুজনে লাফিয়ে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে—কী, কী!

নিশি খিলখিল করে হাসছিল। মাছের কড়াইটা গরম করবার জন্যে উনুনের পাশে রেখেছিলাম। লম্ফটা নিবে গেল দপ্‌ করে। খোলা মাঠে লম্ফ জলে? হেরিকেনটা দাও···

বিনোদিনী চোখমুখ লাল করে বলল, তা হয়েছে কী বলবি তো?

অন্ধকারে বেড়ালে কখন সব চেটেপুটে শেষ করেছে। একটুও দেখতে পাইনি।

দ্বিজু ঘোষাল বলল, মেলায় এমন হয়।

॥ ছয় ॥

সাজঘর থেকে মেলা বেরিয়ে এল আসরে। যেদিকে তাকায়, মানুষ, অসংখ্য মানুষ। যার যতখানি সাধ্য সেজেগুজে চলে এসেছে। রঙীন প্রজাপতির মতন ডানা কাঁপাচ্ছে যেন রানীচকের মেলা। দুপুর পেরোতে এই কাণ্ড। তখনও আসবার বিরাম নেই। দূর মাঠের ওপর, পথে, যেদিকে তাকায় ওরা আসছে। শুধু আসছে। দেখাদেখি নিশিও সেজেগুজে বসে রইল। বিনোদিনীর দোকানে হঠাৎ এক নতুন দীপ্তির চমক। পাশ দিয়ে যেতে না থেমে পারা যায় না।

রুদ্রদেবের মন্দিরের ওদিকে পা বাড়ানোর উপায় নেই। হাজার ভক্ত পেতলের কলসী নিয়ে অপেক্ষা করছে। রাজ্যের সাধু সন্ন্যাসী ফকির আর হাঘরে ভিখিরী বটতলা ঘিরে বসে রয়েছে। চারপাশে বাতাসা খই মুড়কির চালচুলোহীন পসার—মাটির ওপর আকাশের নীচে তক্তাপোষ পেতে দু'হাতে খদ্দের বিদায়ে ব্যস্ত। তেলেভাজা পাঁপরভাজার গন্ধ ফাল্গুনের হাওয়ায় ভাসছে। এ গন্ধই মেলার গন্ধ। এ গন্ধটি ছাড়া মেলাকে মেলা বলতে মন চায় না।

পৃথিবীতে যতরকম মানুষ রয়েছে, তাদের কোনটি আসতে বাকী নেই। অথচ সব মিলিয়ে একটি রঙ একটি দৃশ্য আর উজ্জ্বলতা। মেলা! মেলা! বেলুন বাঁশির কানচটানো বিশ্রী সুরও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। মধ্যিখানে চারখানা তক্তাপোষে প্যাণ্ডেল। সামিয়ানার নীচে রঙীন কাগজের ঝালর কাঁপছে পত্‌পত্‌ করে। সতরঞ্চের ওপর লাল নকসাকাটা গালিচা। কোন মহামানুষ বক্তৃতা দেবেন। ওখানে প্রধান গেটে লাল ফিতে বেঁধে রাখা হয়েছে। দ্বিজু ঘোষালের মাথার ঠিক নেই। স্যাণ্ডেলের ষ্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গিয়েছিল। ফেলে দিয়েছে স্যাণ্ডেলটিকে। হাঁটু অব্দি লোমে ধুলো জমেছে। কণ্ঠস্বর ভেঙে গেছে। হাঁসফাস করে—কেবল হাতের ভঙ্গীতে কথা বলার প্রয়াস তার।

মাইকওলা এসে গেছে সময়মতো। চারটেয় উদ্বোধন। গেটের ওদিকে সারিবদ্ধ মুনিকন্যাবেশিনী নাবালিকারা শাঁখ আর বরণডালা হাতে দু'পাশে তৈরী।

কিছু দেখা হলো না। নিশির মুখ বেজার হয়ে গেছে। পানখেকো রাক্ষস এত আছে পৃথিবীতে—আর শুধু পিসি, পিসি, পিসি……

থেকে থেকে প্রশ্ন—ওটি কে পিসি, ওই মেয়েটি ...ত ধকধক করে আগুন জ্বলছে।

চেনা-মুখ সকলেই এসে গেল। কেবল মোহন নেই। জ্বরজ্বালা হয়নি তো? লেবুতলার লোকে বলল, না, না। ওর আবার জ্বরজ্বালা। ব্যাঙের আবার সর্দি! দেখে এলাম, চণ্ডীমণ্ডপে চিত হয়ে শুয়ে আছে।

আসবে বললে না?

কে জানে! চোখ বুজে পড়ে রয়েছে মড়ার মতন। ও একটা মানুষ, তার আবার কথা·

বিনোদিনী পানে মসলা দিতে গিয়ে থেমে গেল মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণে একবার আড়চোখে নিশির দিকে তাকিয়ে নিল। যে অভিমানী মোহন, নিশি আবার কিছু বলে-টলেনি তো? ও থাকলে অনেক ঝক্কি সামলায়। অই, হেই নিশি, চুন কি নদী না সাগর· ভাঁড় উজোর করে দিলি যে। মিনসেরা গাল পুড়ে গাল দেবে না?

নিশির দু'হাতের সবগুলি আঙুল চুন খয়েরের ছোপে বিচিত্র। বারবার কাপড়ে মুছছে।

তোকে ওসব করতে হবে না। থাক। বরং এলাচগুলো গুঁড়ো কর হামানদিস্তেয়· খানিকটা খয়েরও।

মাইকে প্রচণ্ড চিৎকার···হ্যালো, হ্যালো, ওয়ান টু থ্রি··ঠিক আছে। তারপর কানফাটানো কর্কশ শব্দ। একসঙ্গে কয়েকটা মেঘের গর্জন। তারপর বাজনার সুর। মনে হয়··বিরাট কি একটা যন্ত্র ঘড়ঘড় ·ধকধক করে চলছে আর তার চলার শব্দগুলি কেমন করে গানের সুর হয়ে উঠছে।

চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল তীব্র তীক্ষ্ণ সুরঝংকার। গ্রামের আকাশে· মাঠের ওপর, সবখানে ভেসে গেল বন্যার মতন। দূরের পথের যাত্রীরা চলার গতি বাড়িয়েছে। রক্তের দোলা লাগে·· ওই শব্দপ্রবাহের আঘাতে চেতনার জড়তা ঝুরো ঝুরো মরচের মতন খসে পড়ে। চকচকে ধারালো হাতিয়ারের মতন ক্ষুধার্ত মন ছুটে আসে। মুহূর্তে মুহূর্তে একটা তীব্র উত্তেজনা অনুভব করছিল নিশি। তার মনে হচ্ছিল·· একটা বিরাট বিশাল কিছু·· প্রতীক্ষার পর অকুণ্ঠিত পাওয়ার মতন এক সর্বব্যাপক কোন আনন্দ, প্রজ্জ্বলিত বহ্নিকুণ্ডের তীব্রতা যদিবা তাতে আছে, ঝাঁপ দেবার জন্য মরীয়া হওয়া তবু সহজ এবং রক্তের অস্বাভাবিক কাঁপনে, কামনায়, নেশায়, সে সেখানে এখনই ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। নিজেকে বিলীন করে দেবে ওই সর্বগ্রাসী জ্বলন্ত উৎসবের সমগ্রতায়।

কিন্তু মুখ তুলে সে মুহূর্তে ঝিমিয়ে পড়ল। দু'কানে হাত রাখল। বলল, এত জোরে না চেঁচালে বুঝি চলে না!

বিনোদিনী বলল, আজকাল এইরকম হচ্ছে।

চোখের ওপর গিজগিজ করে মানুষের ভেসে-থাকা, দেখতে দেখতে কখন বেলা ফুরিয়ে এল। বেলুনওয়ালা রঙীন বেলুনগুচ্ছ হাওয়ায় উড়িয়ে কতবার ঘুরে গেল। ঝুম ঝুম করে নাচতে নাচতে সঙ সেজে চানাচুরওয়ালা শ্রীমন্ত 'নমস্কার পিসিমা' বলে সমীহ জানিয়ে গেল। একটু থেমে সঙের মুখভঙ্গীতে চোখ নাচিয়ে বলে গেল, ওই বুঝি সেই বোনটি? বাঁশের লগিতে—খড় জড়িয়ে তাতে তালপাতা আর শোলার তৈরী রঙীন ঘূর্ণীঘোরা উড়োজাহাজের খর খর চিঁ চিঁ শব্দ তুলে পিসিকে সালাম দিয়ে গেল ময়নাহাটের পাচু সেখ। হিন্দুস্থানী বাদামওয়ালা রামভগত,···ভূষণ বিস্কুটওয়ালা·· বিভু রুমালওয়ালা··

স্বপ্নের দৃশ্যের মতন। দূরচারী নক্ষত্রের মতন। নিশির মনে হচ্ছিল··· কোথায় একটা যোগসূত্র ছিল, হঠাৎ কী প্রবল উত্তেজনায় ছিন্ন হয়ে গেছে কখন। আর সে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। বিষণ্ণ হচ্ছে একটু একটু করে।

প্যাণ্ডেলের চারপাশে জনতা। কে মাইকের চোঙে আওয়াজ তুলে বলছিল···প্রিয় বন্ধুগণ···কে তারস্বরে গান গাইছিল—তোমারই হউক জয়! হাততালির শব্দ।—প্রথম পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে···কৃষি উৎপাদন··

বিনোদিনী কান পেতে শুনে বলেছিল, আজকাল কি সব ওই রকম বলে। তুই তো বইটই পড়তে পারিস। বুঝতে পারছিস?

নিশি মাথা নেড়েছিল। বীণাদির বইখানা ফেরত দিয়ে আসা হয়নি। বড় ভুল হয়ে গেছে। ও তো এতদিনে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। বাবাকে বলে এলেও পারত। কিন্তু যে ভুলো মন বাবার!

বাবার আজ আসবার কথা ছিল। এল না। রাগ করে আছে বুঝি। কিন্তু ধনা, ধনাও তো এল না। ভুবনপুরের লোক অবশ্য এতদূর আসে না। তবে ধনা না আসবার কারণ নেই। অসুখ করেনি তো?

বিনোদিনী ডেকেছিল, নিশি, ফুলকাটা থালাখানা নিয়ে আয় তো।

অন্যমনস্ক নিশি বলেছিল, কোনখানা?

বাপের স্বভাবটি পেয়েছে ছুঁড়ি। সেই যে কিনারে থাককাটা·· কাল মেজে আনলি ঘাট থেকে···

নিশির মনে পড়েছিল, এনে দিয়েছিল তখনই। সেই থালায় গুচ্ছের খিলি সাজিয়ে বিনোদিনী উধাও। নিশি অবাক। প্যাণ্ডেলের দিকে ভীড় ঠেলে যাচ্ছে।

ও! ওই মহাপুরুষদের ঠোঁট রাঙানো হবে তাহলে!

'মহাপুরুষ' শব্দটা কেন যে ভাবল! ওটাতো গোবরা হাড়ির কথা। কথায়-কথায় ওই শব্দ উচ্চারণ করে সে। সেদিন বলছিল, পিসি, এবারে যিনি মেলায় ফিতে কাটছেন, তিনি দেশের সেরা মহাপুরুষ। তোমার মোহিনীর বাড়া যদি কিছু থাকে, দিয়ে এসো ঠোঁটে। লালে লাল করে দিও শালাকে···

লোকটা কে? এখন দেখতে ইচ্ছে করে। উপায় নেই। দোকান দেখে কে? গোবরা বলেছিল, এই আমরা তুমি-আমি-মোহনবেণু···এরা হচ্ছে মানুষ। আর মেলার প্রথম দিনটিতে উঁচু আসনে ফুলের মালা গলায় পরে যাঁরা বসে থাকেন তাঁরা মহা-মানুষ। মহামানুষকেই বলে মহাপুরুষ। তুমি মহাপুরুষ দেখেছো নিশি?

না। নিশি দেখেনি।

দেখে এসো। শিবরাত্রির দিন সামিয়ানার নীচে। যেন বাসরঘরের বর। লাজুক চাউনি, কাঁপানো গলা··· ···শালাদের ভাবের ঘোরে মুখ দিয়ে যা বেরোয়,···

গোবরাকেও আজ সকাল থেকে দেখা যাচ্ছে না। কাল রাতেও তার বাঁশির সুর শোনা যায়নি। সারারাত ঘুমোয় না লোকটা। জেগে থেকে কিসব দুষ্টুমি করে বুঝি। ওর অতটা বদনাম না থাকলে চুপি চুপি দেখে আসা যেত। কিন্তু ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয়। চাউনিটা দেখেই চমকে উঠতে হয়। যেন দৃষ্টি নয়—ডাকাত হাত···ভেতরের রক্তমাংস তুলে আনবার জন্যে তৈরী। অথচ কত চেনা মনে হয়। যেন ছেলেবেলা থেকে চোখের সুমুখে দেখছে। অনেকখানি জানা হয়ে আছে তার।···তবু আরেকটা অন্ধকার দেয়াল—তাকে দুভাগ করে একদিকে ছায়া ফেলে রেখেছে। ছায়াটিকে যত ভয়। যত ঘৃণা।

কখন বেলা ফুরিয়ে গেল। ছায়ার সমুদ্র এল ঝাঁপিয়ে। আলো জ্বলে উঠল। ভক্তদের জয়ধ্বনি উঠতে থাকল। প্যাণ্ডেল শূন্য হয়ে গেলে—চারপাশে কিছু কমবয়সী ছেলে এখনই আসন সংগ্রহে ব্যস্ত—কলকাতার যাত্রা হবে। দল এসে গেছে নাকি। বটতলার ওদিকে কোথায় আড্ডা নিয়েছে। দ্বিজু ঘোষাল ওখানে ঘর বানিয়ে দিয়েছে করগেট টিনের। আগে নাকি ধ্বসে পড়া ওই একতলা ঘরগুলোতে দলওয়ালারা এসে থাকত। এখন সেখানে সাপের রাজত্ব। গোবরার আড্ডা। থানার বড়বাবু বলেন, কোবরার। মানে গোখরোর গর্ত।

বিনোদিনীর দোকানে ডেলাইট। আলো চোখে লাগে নিশির। ভাগ্যিস

ইলেকট্রিরি আসে নি। কেন কে জানে, ওই বিক্ষিপ্ত খণ্ড খণ্ড অন্ধকার তার ভালো লাগছিল। আরো ভালো লাগছিল নির্জনতার কথা ভাবতে। ক'দিন ধরে জায়গাটা তার বড় আপন হয়ে উঠেছিল—বাড়ির উঠোনের মতন। খুবই চেনাজানা মুখের মতন। সরল সহজ পরিষ্কার। আজ থেকে সে আর রইল না। অজানা বিদেশীর রহস্যময় মুখ—আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। এখন মন কেমন করে—যেন গাঁয়ের পাশে সাঁতার কাটা নদী'টি কখন তাকে ভাসিয়ে অন্য এক মহানদীতে—সমুদ্রে এনে ফেলল।

·অভিমানে গাঢ় হয়ে বসে থাকল নিশি। আর তার মনে পড়ল সাবিত্রীর কথা। এখন সাবিত্রী থাকলে সে তার সঙ্গে মাঠের দিকে চলে যেত কিছুক্ষণের জন্যে! অথচ কি অবাক মেয়ে! হঠাৎ মনে হলো—ওই মিষ্টি খাওয়ার ব্যাপারে হয়তো কোন ক্ষতির ইতিহাস জড়ানো রয়েছে···যে বোকা মেয়ে! কিন্তু নিশিও তো তার মতন মেয়ে। পুরুষ নয়।

পিসি ছাড়া পরিচিত—যাদের একান্ত কাছের বলে ভাবতে পারে, তেমন কেউ আজকের দিনটিতে নেই।

ওখানে সিনেমার তাঁবুতে এতক্ষণে মাইক শুরু হলো। সার্কাসের ওদিকে ব্যাণ্ড বাজছে। বিনোদিনী মুখ নীচু করে পান সাজতে ব্যস্ত। নন্দ সরকার এবারেও আসতে পারেন নি। অবস্থা ভালো নয়। রাত পেরোয় কিনা সন্দেহ। সেই খবর পেয়ে বুঝি মনে সুখ নেই। ফূর্তিটা ফিকে হয়ে গেছে। পানের ওপর আঙুল থেমে আছে কিছুক্ষণ। উজ্জ্বল আলোয় মুখের প্রতিটি রেখা স্পষ্ট। যৌবনের বিনোদিনী যেন ওই বলিরেখার মধ্যে জালে আবদ্ধ মাছের মতন ছটফট করছে। আমৃত্যু যন্ত্রণা তার—এবং সেই যন্ত্রণার চঞ্চলতা, ক্ষয় ও মলিনতা মুখে এখন খুবই প্রকট।

পিসি আর সোৎসাহে কথা বলছে না। নিশির মনে হলো—এই উৎসবমুখর মেলার একপ্রান্তে তাদের দোকানটিই কেমন অসুখী হয়ে পড়ছে ক্রমাগত। এই আলো আর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না। স্বপ্নের দৃশ্যের মতন পান নিতে হাতবাড়ানো মানুষ। কথোপকথন। হাসি। বাঁশির সুর। মাইক। আর সেই সময় ভীড়ের ভেতর থেকে হন্তদন্ত তেলতেলে মুখ নিয়ে ধনা এগিয়ে এসে বলল, ও পিসি ও নিশি···সংবাদ খারাপ। লোচনকা ওদিকে···

বিনোদিনী সোজা হয়ে বলল, কি, কি রে ধনা?

নির্বোধ ধনা খদ্দেরের ভীড়ে অবাধে বলে উঠল, লোচনকার বিয়ে হচ্ছে গো, বিয়ে··· সেই পিত্তিমা কানকাটির সঙ্গে······

কার সঙ্গে? নিশি প্রশ্ন করল।

সেই যে গো,⋯কানকাটা মেয়েটা⋅ রাধাশ্যামের বিধবা—ধান ভানতো কায়েত বাড়ি। সন্দ করে শ্যামা কান কেটে নিয়েছিল।

নিশি লোকজন না মেনে ঝাঁপিয়ে পড়ল দোকান থেকে। সে কি গো? কবে? আমাকে খবর দিলে না? উচ্ছ্বসিত হাসিতে সে টলে পড়তে লাগল।

বিনোদিনী হাঁকরে উঠেছে এতক্ষণে। চোপরাও বাটপাড়, ঠক, মিথ্যুক। মেরে মুখ ভেঙে দোব। এত মেলা লোকের সামনে মুখ দিয়ে সাপ ব্যাঙ যা বোরোচ্ছে, উগরে দিচ্ছে!

ধনা আমতা হেসে চুপ করল। কিন্তু ওদিকে নিশিকে ভূতে পেয়েছে। সে হাসি সামলাতে না পেরে পেছন দিকে চলে গেল টলতে টলতে। কোমর থেকে শাড়ী খুলে পাছায় নেমেছে—নীল সায়াটা উদোম হয়ে গেছে একেবারে। এক হাতে পেছনের শাড়ীর পাড় খামচানো, অন্যহাত নাভির কাছে!⋯

তারপর আর দোকানে যাবার নাম নেই।

একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল সবখানে। দোকানে-দোকানে, তাঁবুর দরজায়, যাত্রাওলাদের গ্রীনরুমের কাছে! অবশেষে একসময় ব্লাউজের ভেতর আসবার দিন লুকিয়ে লোচনের গুঁজে দেওয়া কিছু একটাকার নোট আর খুচরো পয়সা বাঁধা রুমালটা বের করে একখানা পাঁপর ভাজা খেতে খেতে যাত্রার আসরে মেয়েদের ভীড়ে বসে পড়েছিল। কিন্তু মন বসে না কোনটায়! সে উঠে পড়েছিল সেখান থেকে। মন্দিরে সারারাত শিবের মাথায় জল ঢালা হচ্ছে। প্রাঙ্গণটায় বান ডেকেছে জলকাদায়। ভক্তরা নাচছে। জয়ধ্বনি দিচ্ছে। সে একটুখানি দেখে নিয়ে যখন বটতলা অতিক্রম করছে, কে অন্ধকার থেকে তাকে নাম ধরে ডেকেছিল, নিশি না?

নিশি থমকে দাঁড়িয়েছিল। মোহন! লেবুতলার মোহন। এখানে কি করছো তুমি?

মোহন চাপা গলায় বলেছিল, শালা গোবরা আমাকে মেলায় আসতে বারণ করেছে। বুঝলে নিশি? তবু এলাম লুকিয়ে। এক্ষুণি চলে যাবো। কিন্তু কি ভাগ্য দেখো, এখানে তোমার দেখা পাবো ভাবিনি!

একটু ইতস্তত করে মোহন বলেছিল, এই ⋯মানে⋯তোমার জন্যে! নিশি দারুণ চমকেছিল। কেন, কেন মোহনদা?

মোহন চোখ বুজে বলে দিল, শালা তোমার জন্যে আমাকে খারাপ সন্দ করে, বুঝেছ?

নিশি উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল ক্রোধে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছিল। কিন্তু মোহন যে এমনি হ্যাংলা সে ভাবতেও পারেনি! সংসারে মানুষ চেনা কঠিন। সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিল, ওই নিয়েই থাকো সব। স্বর্গে সিঁড়ি তুলে বসে থাকো। পরক্ষণেই দ্রুত চলে এসেছিল। পথে জুয়ার আড্ডা। গণ্ডাদুই জুয়াড়ী ছক পেতে কৌটো চালছে। গুটিগুলো খড়খড় করে ঝাঁকুনি খাচ্ছে কৌটোর ভেতর। চারপাশে উদ্‌গ্রীব লোভী মানুষের মুণ্ড। অদূরে রুল হাতে নিয়ে সিগ্রেট টানছে একটা কনস্টেবল। নিশি পুলিশ দেখলে ভয় পায়। মোড় ফিরিয়ে দিল নিজের। একেবারে প্রহ্লাদের দোকানে এসে বলল, ও দাদা, চুড়ি চাই, খুব ভাল চুড়ি…

প্রহ্লাদের সঙ্গে ইতিমধ্যে চেনা হয়ে গেছে। প্রহ্লাদ বলল, এসো, এসো গো দিদিমণি, বসো।

বসবার সময় নেই। শীগগীরি চুড়ি দেখাও দিকি!

দিনে এসোনা সময় করে! প্রহ্লাদ দরদী কণ্ঠে বলল। এখন ভীড়ে ভালো জিনিসটি দেখতে পাবে না। কাল সকালে এসো। বাছাই করে নিও—যতক্ষণ খুশী। তখন লোকজন কেউ থাকবে না…

নিশি নিঃশব্দে উঠে এসেছিল। বলবার ঢঙ দেখে ঘেন্না করে। পয়সা দিয়ে চুড়ি পরবে, অত সাতে পাঁচে নেই। নাঃ শুধু চুড়ির দোকান একটা রয়েছে ওদিকে। পা বাড়িয়েছিল নিশি।

হাত ভরে চুড়ি পরে একটা নখপালিশ কিনছে, এমন সময় ধনা হাজির। এই যে! বাব্বাঃ, সারা মেলা খুঁজছি। আচ্ছা মেয়ে বটে তুমি!

নিশি চোখ পাকিয়ে বলল, কেন? খোঁজবার কি হলো? কচি খুকী নাকি যে হারিয়ে যাবো?

ধনা হাঁটু গেড়ে পাশেই বসল। না, না। কি কিনছো, কেনো। নখ পালিস?

কেনাকাটার বিরাম নেই যেন। এ-দোকান থেকে সে-দোকান। ধনা সঙ্গ ছাড়ে না। কত কি কিনল নিশি—স্নো, সাবান, কানের দুল, আলতা। এমন কি সিঁদুরও। ধনা অবাক হয়ে বলেছিল, ও হরি, সিঁদুর কী হবে?

ভীড় থেকে একটু দূরে আধো আলো আধো অন্ধকারে এসে নিশি বলেছিল, তোমার কাছে গামছা রয়েছে না? ও কী বেঁধেছো?

ধনা বলেছিল, কিছু না। নাড়ু আর সন্দেশ। ছেলেটা বলবে, বাবা মেলায় গেয়েছিল…

নিশি বলেছিল, একটু অপেক্ষা করো। আমি আসছি।

ফিরে এসেছিল একঠোঙ্গা সন্দেশ নিয়ে। ও কি হবে নিশি?

স্নো সাবান আলতা সিঁদুর এমন কি হাত থেকে চুড়িগুলোও খুলে ধনার গামছার অন্যপ্রান্তে একসঙ্গে সব বেঁধে দিয়েছিল নিশি। কানের দুল আর পুঁতির হার ছড়াটা শুধু রেখেছিল হাতে। তারপর বলেছিল, দিব্যি রইল, সব নতুনমাকে দেবে। বলবে, তোমার মেয়ে পাঠিয়েছে মেলা থেকে।

ধনা বলেছিল, যদি না নেয়?

কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে থেকে নিশি বলেছিল, নেবে। কেন নেবে না? আর শোনো, বাবাকে বলবে, নিশি শুনে খুব খুশী হয়েছে। বাবা যেন একবেলার জন্যেও মাকে নিয়ে মেলায় বেড়াতে আসে।

বলবো। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে গেলে ভাল হতো না নিশি?

না। মেলায় আমার কতো কাজ। পিসি বেচারি বুড়ো মানুষ। জ্বর জ্বালা লেগেই আছে। কে দেখবে তাকে?

বিজ্ঞ ধনা বলেছিল, তাইলে দোবানবাগে আর আমার যাওয়া উচিত হবে না। এখান থেকেই কেটে পড়লাম।

এসো।

এই অমাবস্যার রাতে ধনা দশমাইল পথ পাড়ি দেবে। রাতটুকু থাকতে বললেও ভালো হতো। কিন্তু শোবার জায়গা নেই যে।

প্রসন্নচিত্তে নিশি দোকানে ফিরে এসেছিল। যেন পুণ্যের কাজ করে ফেলল হঠাৎ।

বিনোদিনী তাকে দেখে কথা বলে নি। গুমোট মুখে নিজের কাজ করছিল নিঃশব্দে। নিশি চটের পর্দা তুলে ভেতরে ঢুকে শুয়ে পড়েছিল বিছানায়। রাত কত হলো কে জানে। এখানে যাত্রার আসরও ভেঙে গেল একসময়। হল্লার শব্দ কমতে কমতে শেষ হলো। কোথায় দূরে কোকিল ডাকছে। ভোর হলো তবে? এত শীগগীর? একটুও বোঝা যায় না তো! মেলার জগতে সবই এত ক্ষণিক লাগে! বাবার দেওয়া পয়সাগুলো সব খরচ হয়ে গেছে। হাতের মুঠোয় কাগজে জড়ানো হার আর দুল দু'টি খালি খুলে খুলে বের করছিল। অন্ধকারে দেখা যায়না কিছু। ফের মুঠোয় চেপে মুঠোটা বুকে রেখে চুপচাপ শুয়ে ছিল সে। সাবিত্রী যদি কখনও আসে, তাকে দিয়ে দেবে।

বিনোদিনীর পালা বুঝি শেষ এতক্ষণে। ঝাঁপ বন্ধ করার শব্দ। তারপর

ডে-লাইটটা আচমকা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপ করে গেছে। অন্ধকারে সে নিশির পায়ের ওপর পড়েছে হুড়মুড় করে। সর্, শুতে দে।

নিশি সরে শুল নিঃশব্দে।

বিনোদিনী গজগজ করছে, যতসব বেশ্যা নিয়ে আমার নাকাল। গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে···

হয়তো নিশিকেই বলল। নিশি মুখ খুলে জবাব দিল না। মনে মনে বলল, কে বেশ্যা, নিজের মনকে শুধোও।

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। বাইরে আমবাগানে কোকিলগুলো দল বেঁধে ডেকে উঠছে। মেলা নির্জন না হলেও কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। কেবল একবার সার্কাসের তাঁবুতে বাঘটা গর্জন করে উঠে থেমে গেল। খাঁচা ভেঙে বেড়িয়ে পড়েনি তো? বুক টিপটিপ করে।

সেই সময় বিনোদিনী ডাকল, নিশি!

উঁ?

তুই বাড়ি-ফিরে যাবি?

না।

রাগ করে লাভ নেই রে। মিনসে বুড়ো বয়সে হঠাৎ কুকম্মো করে ফেলবে একটুও ভাবিনি! ঘরদোর করতে একমুঠো টাকা দিলাম···

তোমার ঘর তো আর উড়ে যাচ্ছে না!

তা না যাক্। তোর কোন কাজে লাগল না বাছা। তোর জন্যেই ওসব করছিলাম।

নিশি কনুইয়ে ভর করে উঁচু হলো। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, তবে আমাকে এখানে আনলে কেন?

বিনোদিনী গায়ে হাত রেখে বলল, শো। ভোর হয়েছে। ঘুমো। চোখ জ্বালা করবে।

নিশি দেখল বিনোদিনী তাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। আর তার বাহুতে মুখটা লেগে রয়েছে। পিচ্ছিল মনে হয় বাহুটা। নিশি চোখ খুলে—তখন অন্ধকার ফিকে হয়ে গেছে—বিস্মিতভাবে দেখল পিসি নিঃশব্দে কাঁদছে! সে মুহূর্তে সমবেদনায় কাতর হয়ে বলে উঠল—কেঁদোনা—কেন কাঁদবে? আমি··· আমি তোমাকে ফেলে কোথাও যাব না। স্বর্গেও না।

। সাত ।

তারপর কখন সকাল হয়েছে। এ সকাল অন্যরকম সকাল। এর আলোর রঙ ভিন্ন। এর হাওয়ার স্বাদ অচেনা। আর সারাটি রাতের প্রবল উত্তেজনার পর ভোরে ক্লান্তি, নৈঃশব্দ ও নির্জনতার মধ্যে গাঢ় ঘুমে অবগাহন করে রানীচকের মেলার মুখে যেন কি অপরূপ শুচিতা আকীর্ণ হয়েছে।

বিকেলের মতন ভীড় নেই। যদিও মানুষের আনাগোনা রয়েছে। কেনাকাটার ব্যস্ততা রয়েছে। পাঁপর ভাজার গন্ধ ছড়াচ্ছে শিরশিরে হাওয়ায়।

কিন্তু হল্লা নেই তেমন। অস্ফুট কথার শব্দ চারপাশে—যেন না হ'লে পবিত্রতা নষ্ট হবে। বেলুনগুলোকে উজ্জ্বলতর লাগে। নাগিন বাঁশীর সুর শোনা যায় অনেকদূরে। লোকজনের চলাচলে, সজ্জায়—তীর্থ প্রত্যাগত প্রসন্নতার আভাষ।

নিশি বালতি ভরে জল নিয়ে এল টিউবওয়েল থেকে। পেতলের কলসীতে ঢেলে দিল। তারপর বলল, পিসি, নাইতে যাচ্ছি।

বিনোদিনীর এখন পয়সা গোনার পালা। মধ্যেমধ্যে খদ্দেরও আসছে। সাজানো পান হাতে তুলে দিয়ে ফের নিবিষ্টমনে গুনছে। কাল অনেক বেচাকেনা হয়েছে। নিশির কথা শুনে সে মুখ তুলে বলল, এক্ষুণি? দুপুরে টিনের তাত লাগলে তখন আবার গা ভেজাতে হবে দেখিস!

দুপুরে তাত লাগবে বোঝা যাচ্ছে। রোদের উষ্ণতা আজ প্রকট। নিশি বলল, তা যখন লাগবে, দেখা যাবে।

বিনোদিনী হাসল। নতুন জল। ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। তাতে তুই নতুন মানুষ। আমার অবশ্যি সব গা-সওয়া। জল গায়ে লাগে না। পাথর হয়ে গেছি।

নাঃ, স্নান না করলে কেমন গা ঘিন ঘিন করে। অথচ চারপাশে এই পবিত্রতা। নিশি কাঁধে গামছা ফেলে দাঁত মাজতে মাজতে দীঘির দিকে এগোল। সেই মেলাচর খুনী পাষণ্ড গোবরা মেলায় নেই—এ খবর সকলেই জেনেছে। তাই বিনোদিনও একা যেতে বারণ করছে না।

সব ঘাটেই ভীড়। তার কি যেন একটা অধিকার বর্তেছিল ওই পাথর পড়ে

থাকা কোণের ঘাটটিতে। আজ পর হয়ে গেছে। রাজ্যের পুরুষমানুষ থুথু-কফ ফেলছে। সশব্দে একগলা জলে দাঁত ধুচ্ছে। কুলকুচি করছে। হয়তো জলের ভেতর দাঁড়িয়ে। লুকিয়ে···

পিসি বলে এই কুকম্মের গল্পটা। কে নাকি বলেছিল জলে কি করছো বলতে পারি।

কি, বলো?

···করছো।

কেমন করে জানলে?

আমিও করি ওই রকম। ······এই বলে পিসি মুখে আঁচল ঢাকে। মুখপোড়া পুরুষগুলো ওইরকম হাড়ে হাড়ে বজ্জাত। বুঝলি নিশি? মেয়েরা কিন্তু······

মেয়েদের অভ্যাস নিশি জানে।

বীণাদি বলত, কি রে নিশি? জঙ্গলে যাচ্ছিস কেন? এদিকে আয়—শিখিয়ে দিচ্ছি। শিখে কাজ নেই। মানুষ আর জন্তুতে কোন ভেদ নেই একেবারে।

দেখতে দেখতে হতাশা আর কিছু বিরক্তিতে নিশি অস্থির হচ্ছিল। পিসিও একদিন তার মতন যুবতী মেয়ে ছিল। তখন সে কি ভাবে এই দস্যির জঙ্গল ঠেলে চান করত? নাকি লাজলজ্জার মাথা খেয়ে? নিশি অমন পারবে কি? ওই থুথু কফ আর ভিতরের নোংরাভরা জলে শরীরটা ধুয়ে ফেলতে?

অনেকটা সময় কেটে যাচ্ছে। ভীড় কমছে না। সে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। নামলে গায়ে গা ঠেকাও বিচিত্র নয়। তারপর যখন উঠে আসবে—ভেজা কাপড় গায়ে মিশে থাকবে। তখন কী হবে? ··এমন করে নিজের সম্পর্কে—শরীর সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠার অবকাশ কোনদিনই নিশি পায়নি। কে দেখবে, কে ছোঁবে, কার কী আশার তুফান উঠবে দাপিয়ে—ওই মোহনের মতন!

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল নিশি। মোহনের কাণ্ডটা মনে পড়ে গেল। তেমন কী আছে নিশির মধ্যে, মোহনের মতন ভীরু মানুষও যা আশা করে বসে আর তাই গোবরা তাকে 'সন্দ' করে! এ তো বড় লজ্জার কথা। লজ্জা আর দীনতার। জীবনে এমনি করে খোলামেলায় অন্য পুরুষের সঙ্গে মেশা তো দূরের কথা, যেন তাকাবারও সুযোগ ছিল না। এই প্রথম মেলার সামান্য কয়টি দিনে কি বিরাট অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে গেছে তার অজানতে। সে মেয়ে, যুবতী—অন্যের কামনার

জিনিস······এই জানাগুলো তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকারের মতন ছড়িয়ে এল আস্তে আস্তে অনেক দূর থেকে কাছে—অনেক কাছে। নিশির গা ছমছম করে উঠল। বিচিত্র সুখদুঃখময় একটা অনুভূতি তাকে অস্থির করে তুলল। সে বুঝতে পারছে না, তার অগোচরে তাকে কেন্দ্র করে যা ঘটেছে বা ঘটতে পারে, তা সুখ না দুঃখ বহন করবে তার জীবনে! অথচ কোথাও যেন মুহুর্মুহু বিদ্যুতের দীপ্তি, অশান্ত হাওয়া, মেঘের ঘনঘটা, পুরনো বিবর্ণ পাতার রাশি, জীর্ণ বোঁটা থেকে খসে পড়ার শব্দ··· ঝরঝর সরসর···তারপর চোখে জল এসে গেল। কান্নাময় ঝাপসা দৃষ্টিপাতে নিশি দু'টি মানুষের দিকে তাকাল—যারা মেলার জগতে আলোর আড়ালে থেকে নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করছে ক'দিন ধরে।

আস্তে আস্তে ফিরে আসছিল নিশি। ভীড় কমবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সে দীঘির পাড়ে উঠে নীচের আমবাগানটার দিকে তাকাল। ঘন মুকুলে ঢাকা গাছগুলি। তার গন্ধ ছড়াচ্ছে তীব্রতর। পাখীর ডাক। ছায়ার জঙ্গলে নির্জনতা থমথম করছে। সে দ্রুত নেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। শুকনো ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসল। তারপর একটা ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে দাঁতে খুটতে থাকল। দাঁতে ঠোঁটে আঙুলে মাজনের ময়লা—গামছায় মুছে ফেলল। নিজেকে সুখী ভাববার চেষ্টা করছিল সে। মনে হচ্ছিল, হঠাৎ নিজের খুবই ভিতর দিকে একটা গভীর শুচিতা—মাজাঘষা ঝকঝকে স্বচ্ছতার ক্ষিপ্র আয়োজন শুরু হয়ে গেছে।

একটি সাঁওতাল মেয়ে ঝুড়িতে কাঠ কুড়োচ্ছে ওদিকে। রাঙামাটির পথ ওখান থেকে ঢালু মাঠের দিকে নেমে ফের চড়াইয়ে চলে গেছে। ছোট্ট গ্রাম দেখা যাচ্ছে একটা। কৃষ্ণচূড়ার ফুল ফুটেছে সেখানে, স্পষ্ট দেখা যায়। হয়তো সাঁওতাল বস্তী। কুসুমগ্রাম, লেবুতলা কোনটা?

কতক্ষণ বসে ছিল হিসেব নেই—বিনোদিনীর ডাক কানে এলো। নিশি, নিশি, অ নিশিলতা!

নিশি সাড়া দিয়ে বলল, এই যে যাচ্ছি!

পাড় থেকে বিনোদিনী বলল, আ মর, ওখানে কী করছিস? শীগ্গী আয়।

নিশি এক দৌড়ে উঠে গেল। চোখেমুখে মুহূর্তে দুষ্টুমি জমে উঠেছে। খুঁজতে বেরিয়েছো নাকি? ঘাটে লোক দেখে একটু অপেক্ষা করছিলাম।

ধন্যি মেয়ে তুই। কী ঝঞ্ঝাটে পড়েছি বল তো! নিত্যি আর খোঁজাখুঁজি করতে পারি নে। এত বদ অভ্যেস।

নিশি চোখ নামিয়ে বলল, ভয় নেই। হারাবো না।

হারাবো না! মুখ ভেংচাল বিনোদিনী। যেদিন সাবিত্রীর মতন দংশন খাবি, সেদিন বুঝবি!

নিশি লজ্জিত মুখে বলল, যাও!

ভীড় ঠেলে হুড়মুড় করে জলে নামলো বিনোদিনী। ডাকল—আয়। দোকানে ঝাঁপ ফেলে ছুঁড়িকে বসিয়ে রেখে এসেছি।

কাকে?

সাবিকে।

সাবি এসেছে? নিশি খিলখিল করে হেসে উঠল।

বিনোদিনীর লজ্জা সংকোচ নেই। দেখাদেখি নিশিও গা বাঁচিয়ে নামল। কোনরকমে তাড়াহুড়ো স্নান সেরে দুজনে ভেজা কাপড়ে ফিরে এল দোকানে। এসে দেখলো সাবিত্রী জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে টাটের গায়ে হেলান দিয়ে—ছায়ায় বেঞ্চটা টেনে নিয়ে গেছে। নিশিকে দেখে সে মুখ তুলে লজ্জা-লজ্জা অস্ফুট হেসে অন্যদিকে ফিরল। নিশি ভেজা হাতে ওর গাল খামচে ধরে বলল, সেদিন অমন করে পালালে কেন? এবার যে হাতের নাগালে পেয়েছি!

দোকানের পিছনে ছায়া পড়েছে। রান্না চাপাতে দের হয়ে গেছে আজ। নিশি উনুনটা বের করে সেখানে নিয়ে গেল। তারপর সাবিত্রীকে ডেকে বলল, এই, মশলা পিষতে জানো?

সাবিত্রী মাথা নাড়ল।

তবে কি জানো?

সাবিত্রী কিছুই জানে না। মামী কিছু শেখায় না! গলার কাঁটা নামলেই সে বেঁচে যায়।

নিশি তার দিকে বারবার তাকাচ্ছিল।

বিনোদিনী তার 'দংশন' খাবার কথা বলছিল। সাবিত্রীর কি একটা ঘটনা রয়েছে—কী সেটা? সেদিন মিষ্টি খেতে বলায় অমন করে পালিয়ে গেল!

পরে সব শুনল নিশি। বিস্ময়ে আতঙ্কে লজ্জায় সে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে থাকল। মানুষ এমন পশু হয়? তার চারপাশে যে মানুষগুলি সে অহরহ দেখছে, তারা সকলেই কি এমন নির্লজ্জ পশু, মুখোস পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? ভেতরে কুৎসিত ইচ্ছা—রক্তে মাংসে বীভৎস লোভ?

সাবিত্রী তবু এমনি একা আসতে পারছে!

বিনোদিনীকে সে সব খুলে বলেছে। মেলায় আসবার প্রথম দিনেই সকালে যে ঘটনাটি ঘটেছিল তার। কিন্তু বোকা মেয়ে, একটুও কাঁদেনি, ছুটে পালিয়ে

যায়নি। অবিকৃত মুখে মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বিনোদিনীর দোকানে এসে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, ওই লাল কাগজটা দেবে? তারপর নিশির সঙ্গে সে বেড়াতে গেল। নিশি তখন মিষ্টি খাবার কথা তুলল, সে সম্বিত ফিরে পেল যেন। ছুটে পালিয়ে গেল।

নিশির প্রতি আতঙ্ক তার কাটেনি। নেশার তীব্র আকর্ষণ তাকে মেলায় ফের পৌঁছে দিয়েছিল আজ। কিন্তু দূরে দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বিনোদিনী দেখতে পেয়ে ডাকে। সাবিত্রী ভয়ে ভয়ে বলে, ও নেই তো?

সে আবার কে রে?

ওই যে—সে! তোমার দোকানে থাকে?

বিনোদিনী হেসে বাঁচে না। নিশি? আমার ভাইঝি?

হুঁ।

ওর সঙ্গে কি?

ও ভালো না।

কেন রে?

আমাকে মিষ্টি দিতে চাচ্ছিল···

মিষ্টি! তুই খাসনা মিষ্টি?

উঁহু।

কেন?

এবার সাবিত্রী ফুঁপিয়ে কেঁদে ফ্যালে। বিনোদিনী চালাক মেয়ে—বয়স হয়েছে। চুল পেকেছে। সব কথা আদায় করে নেয়। তারপর সেও স্তম্ভিত হয়ে যায়। শেষে গালমন্দ করে: মেলায় আসতে বারণ করে। সাবিত্রী বলে—আর সে আসবে না।

ও একটা কথার কথা। সে ফের আসবে। অমনি করে ঘুরে বেড়াবে মাটিতে চোখ রেখে।

ঘটনাটি এই:

সেদিন সকালে সাবিত্রী যখন একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কে তাকে চুপিচুপি মিষ্টি খাবার কথা বলে। বোকা মেয়ে খুশীতে বাঁচে না। তারপর লোকটা তাকে দোকানের পেছনের খুপটি জায়গাটায় ডাকে যেখানে চারদিক ঘেরা আর রাতের দিকে শোবার ব্যবস্থা করা আছে। মিষ্টি আসে শালপাতার ঠোঙায়। সাবিত্রী গোগ্রাসে গিলছিল। তারপর হঠাৎ লোকটা

তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে···কিংবা ঝাঁপিয়ে পড়া হয়তো নয়—আদর দিয়ে আক্রমণ করে। কৃতজ্ঞতা বা অন্যকিছু—সাবিত্রী জানে না, হয়ত এই হঠকারিতায় সে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। বোবা চাউনি, অপ্রস্তুত হাসি,···সব মিলিয়ে একটা হাস্যকর প্রতিরোধের নিষ্ফল চেষ্টা। অসহায় আত্মসমর্পণের যন্ত্রণা। অথচ না কান্না না ক্রোধ, শুধু যেন একটা অপ্রস্তুতের জড়তা···লজ্জা আর হঠকারিতার ত্রাস।···

তারপর বাইরে এসে আস্তে আস্তে সে সবই ভুলে গেল। বাইরে উজ্জ্বল রোদে শুকনো ঘাসে সাবিত্রীর চোখ দুটি খুঁজে খুঁজে সম্ভাবনা দ্যাখে অনেক অজানা আশ্চর্য আর অলৌকিক বস্তুখণ্ডের—যা নিয়ে স্বপ্নের একটা জগতের প্রতি তন্ময় হতে পারে। সে-স্বপ্নের জগতে এইসব লাল নীল হলুদ রঙের কাগজ, ছিন্ন বেলুন, ভাঙা ব্যাঙ বেহালা, শরের ফাটা বাঁশী, কৌটোর নিকেলচটা ঢাকনা, প্ল্যাষ্টিকের ভগ্নোদর পুতুল হাসিকান্নার আলোছায়ায় ভাসমান। যেখানে তারা আর খণ্ড নয়, ব্যাপক। মৃত নয়, প্রাণময়।···

সেই লোকটির বুদ্ধি আছে বলতে হয়। সাবিত্রীর দেহের পতন ঘটেনি, মনের পতন ঘটেছে। ওই বড় দুঃখ—তার ত্রাস আর কান্নার কারণ। সে মুখ তুলে চারপাশের জগৎ থেকে অন্য মানুষের মতন একটা ভিন্নতর সুখের সম্ভাবনা পেতে গেল—যা মাটির ওপর পড়ে থাকে না অবহেলায়, অমনি আঘাত পেল। বেজাত হয়ে গেল সাবিত্রী। এ দুঃখ পোষাকুকুরের মতন পিছু ছাড়ে না। সে যেগুলি কোনদিন চায়নি, কেন চাইতে গেল হঠাৎ? এ লোভ তাকে জখম করে গেল যে!

কিন্তু লোকটা কে?

দারুণ ক্রোধে হিস্‌হিস্ করে উঠেছিল নিশি। বিনোদিনী বলেছিল, জানিনা। স্পষ্ট করে বলেনি। সাতচড়ে যার রা নেই, তার কাছ থেকে কথা আদায় করা সোজা না। হয়তো আর চিনতেই পারবে না তাকে। যে হতচ্ছাড়া বুদ্ধিহীনা মেয়ে!

সাবিত্রী কখন নিশির অজানতে ফের উধাও হয়েছিল। নিশি অনেক খুঁজেও ভীড়ের ভেতর তার পাত্তা পায়নি। আর তারপর নিশিকেও একটা ত্রাস কাবু করেছিল। সে একা একা অমন করে ঘুরে বেড়াবে না আর। গভীর উৎকণ্ঠা বারবার নিশির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সকালে যে শুচিতার আয়োজন যে ব্যস্ততা আর সুখ চুপিচুপি শুরু হয়েছিল মনের ভেতর, কখন নীরবে সমাপ্ত হয়ে গেছে। অথচ পরিচ্ছন্নতার ওপর দারুণ সন্দেহে সে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। রান্না-

ঘর শয়নকক্ষের মতন পরিচ্ছন্ন হতে পারে না মাছি ফের এসে ভনভন করে। কোথায় একটা কটুগন্ধ ছড়ায়।

নিশি যেন দেখছিল তার মেলায় এসে কুড়িয়ে পাওয়া সুখের স্বাদ ঘিরে ফুলের ওপর মাছির মত মোহন আর গোবরা ডানা নাড়ছে।

সে রাতে এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখল সে। ভুবনপুরে ফিরে গেছে। বীণাদির বর হঠাৎ তাকে চুমু খেয়ে বসল। বীণা দেখছে। পিসি দেখছে। লোচন দেখছে। মেলাশুদ্ধ লোক দেখছে। বীণাদির বর চন্দনের আল্পনা আঁকা মুখ আর গরদের পাঞ্জাবী পরে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে আসছে। কী লজ্জা, কী লজ্জা! গোবরার জন্য মন কেমন করে। সে গোবরাকে খুঁজছে মেলার ভীড়ে,·· বাঁচাও বাঁচাও···সার্কাসের সিংহটা খাঁচা ভেঙে ছুটে এল মাঠের পথে। গোবরা হাড়ির পানরাঙা ঠোঁট—সে হাসছে! · কী নিষ্ঠুর, নিশির দুর্দশা দেখেও সে হাসছে!·····

অ নিশি, নিশিলতা।

উঁ?

পাশ ফিরে শো।

পিসি, আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকো। খুব ভয় করছে।

করবে তো! বিনোদিনী গজগজ করল। দেবস্থান হলে কি হবে, হাজার বছরের পোড়ো জায়গা। কথায় বলে—শিব যেখানে, শ্মশান সেখানে! শিবই শব হয়ে থাকেন। পই পই করে বারণ করি, ঠাঁই-অঠাঁই ঘুরবিনে·· সোমত্ত মেয়ে!

হল্লা-ভীড়-উত্তেজনার রাক্ষস, বন্ধ দরজা খোলা হলে আবার বেরিয়ে পড়েছে দলে দলে। আবার নাগিনবাঁশী বাজছে, মাইকে ফিল্মের গান, পসারিদের চিৎকার, পাঁপরভাজার গন্ধ।

মেলা, মেলা!

গ্রামের ওদিকের বাঁশবনের শীর্ষে সূর্য ঢলেছে। ছায়া এল ঝাঁপিয়ে। রাখু কামার বেঞ্চে ডেলাইটটা শুয়েই পাম্প দিচ্ছে দাঁত খিঁচিয়ে। একটি দুটি করে আলো জ্বলছে ক্রমান্বয়ে। বটতলার ওদিকে কারবাইড ল্যাম্প জ্বালছে জুয়াড়ীরা। সব গন্ধ ছাপিয়ে তীব্র পচা গন্ধ ছুটছে। বিষ্ঠার মতন দুর্গন্ধ। কারবাইডের সাদা ছাই স্তূপীকৃত হচ্ছে দিনেদিনে। হেই খোলোয়াড়ী, আজ সবসে বঢ়িয়া খেল! চিৎকার করছে কে। কোলাহলের গা বেয়ে পিচ্ছিল জড়িত কণ্ঠস্বর। কে অসংলগ্ন সুরে গান গেয়ে উঠল—কালার বাঁশী ডাক দিয়েছে·· পেছনে আর ডাকিস্‌নে লো· ·। নাগরদোলায় চেপে গাইছে

মাথা ধরে উঠল নিশির। ফাঁকা মাঠে খোলা আকাশের নীচে অনেক হাওয়া। যদি যেতে পারতো! আলোয় আঙ্গুল মেলে দেখতে থাকল সে। কালো ছোপ পড়ে গেছে। এমনি করে এই নতুন জীবনের ঘন ছোপ পড়ছে তার ওপর। পেছনের সবটা ঢেকে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে।

কেন এমন হয়ে পড়ল সে? সহজ চোখে চেয়ে দেখতে পারছে না চারপাশের দৃশ্যগুলি। বড অশুচিতা, কটু গন্ধ। বারবার স্নান করতে ইচ্ছে করে!

সাবিত্রী কেমন করে বেঁচে আছে? নিশির জীবনে অমন ঘটলে সে বিষ খেয়ে মরে যেত। আর তার আগে ওই লোকটিকে খুন করে ফেলত। ছুরি বিঁধিয়ে দিত কণ্ঠনালীতে।

যাত্রার আসর শুরু হয়ে গেছে ওদিকে। গেরুয়া পোষাকে বিবেক গান ধরেছে—ওটা কালনাগিনী, ঢালছে যে রে বিষ। এক রাজার দুই রানী। ছোট রানী বড় রানীর ছেলেদের জ্বালাতন করে। কি পালা—'বিজয়বসন্ত' না কি···পিসি পা ছড়িয়ে বসে কাঠের থাকে হেলান দিয়ে শুনছে।

নিশি আস্তে আস্তে নেমে গেল নীচে। দোকানের পেছনে অন্ধকারে গিয়ে আড়ামোড়া দিল। মাথা ধরা ছাড়েনি।

বিনোদিনী বলেছিল, পয়সা দোব, টর্নী দেখে আসবি। কাল অমলি-কমলিদের আনবে চণ্ডী। গাড়ী করে আসবে ওরা। ওদের সঙ্গে যাবি। সার্কাসও দেখবি একদিন। দ্বিজুর বড় মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে শুনলাম। ওকে আসতে বলেছি। দেখবি, কেমন সুন্দর মেয়ে—ওর সঙ্গে যাবি। এই বলে ফিক করে হেসেছিল পিসি। বুঝলি নিশি, ময়রার সন্দেশে লোভ নেই। আমরা মেলার লোক, আমাদের বাইরের লোকের মতন মাতলে চলে না। ওদের কাছে মেলা একমাসের, আমাদের চিরকালের। এই করে কাল কাটিল—এখনও কাটবে। এরপর যাবো ময়নাহাট—পীরের মেলা। মুসলমানের তীর্থ। হিঁদুরও তীর্থ বৈকি···পীরবাবা সবার ইচ্ছে পূরণ করেন। তা নিশি, ময়নাহাটে অনেক নতুন জিনিস দেখবি··· নতুন লোক···

সিনেমা সার্কাস অনেক দেখেছে নিশি। ভেবেছিল, মেলায় থাকলে আরও দেখবে। বারবার দেখবে। ও দেখে আশ মেটবার কথা নয়। অথচ পিসির কথাই যেন সত্য হলো। পা বাড়াতে ভালো লাগেনা ওদিকে। নতুন আর কী? সেই একই সব···

নিশি।

ছাঁৎ করে উঠেছে বুকটা। অন্ধকারে ভূতের মতন নাকি সুরে ডাক। কে? নিশির গলার স্বর ভেঙে গেল। কে তুমি? পিছিয়ে টিনের দেয়ালে সেঁটে গেল সে।

ভয় নেই। মোহন, নেবুতলার মোহন।

কী দরকার?

এই এমনি···শুনলাম, শালা গোবরা মেলায় নেই। তাই···

গা জ্বলে গেল নিশির। তা লুকিয়ে বেড়াচ্ছো কেন ভূতের মতন? অন্ধকারে?

কি জানি···শালা কখন আসে-টাসে। ওকে বিশ্বাস নেই নিশি, ওর কাছে কিছু ঢাকা থাকে না।

নিশি আলোর দিকে সরে আসছিল নিঃশব্দে। এই হতচ্ছাড়া লোকটা তাহলে অন্ধকারে থেকে সারাক্ষণ তার অনুসরণ করে?

চলে যাচ্ছো? শোন···এক খিলি পান খাওয়াবে?

এমন দীনকাতর কণ্ঠস্বর, না হেসে পারা যায় না। আপদ একটা। দাঁড়াও।

নিশি চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এল পান হাতে নিয়ে।

জরদা নেই তো?

নাঃ। এই নাও।

উচ্ছ্বসিত হাসি চেপে, মুখে আঁচল ঢেকে নিশি পানের খিলিটা দিল। সেই ভুবনবিখ্যাত 'মোহন' পান খেয়ে ঠেলাটা টের পাক্। বুক শুকিয়ে ছটফট করে মাঠে মাঠে ছুটোছুটি করুক। মেলায় আসবারও সাধ্যি নেই—কাকে অভিযোগ জানাবে? মোহন লোকটা বেশ মজার—সত্যি, বেশ অবাক কাণ্ড তার।

পান মুখে পুরে মোহন বলল, কী জানি নিশি, না এসে থাকতে পারছি না। ছটফট করে মনটা—কতক্ষণে যাই তোমাদের কাছে। অথচ পথে কাঁটা দিয়ে রেখেছে শালা ঢাকু। ভয় করে—ও সাপকে তো বিশ্বাস নেই। সেবার চন্দ্রজুয়াড়ীকে যেমন সবার সামনে ছুরি মেরেছিল···

এই অব্দি শুনে নিশির এত ভয় হলো, সে পালিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। পিসি টাটে বসে ঢুলছে। যাত্রার আসরে একটি বাচ্চা ছেলে ঘুরে ঘুরে করুণ সুরে গান গাইছে। চারপাশে গভীর স্তব্ধতা। মূর্ছায় ঢলে পড়েছে সারা মেলা। কেবল সার্কাসের ওদিক থেকে একটা চাপা মৃদু ড্রামের শব্দ কানে আসে।

সিংহের মুখে মাথা ঢোকানর একটা মারাত্মক খেলা আছে নাকি। সেইটে চলেছে কি?

রাতে ঘুম গাঢ় হয়েছিল। কখন এসে শুয়ে পড়েছে মনে নেই। বিনোদিনী যখন শুতে এল, তখনই ঘুম ভাঙল নিশির। ভোর হয়ে গেছে। ঘুমোচ্ছিলি, তাই ডাকিনি। সে বলল। যাত্রা ভাঙলে আলবাপের গান হলো আসরে। হাসতে হাসতে নাড়ি ছেঁড়ে বাপু··· এখনও হচ্ছে। যা না, দেখে আয় গে···

পিসি আজ গান শুনে রাত কাবাড় করেছে। নিশি উঠে বসল। মাথা ছেড়ে গেছে। বাইরে এলো সে। মাঠের ওদিকে আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। কাককোকিলের ডাক শোনা যাচ্ছে। আসরে একটি ছেলে, মেয়ে সেজে দারুণ নাচছে আর গাইছে।···তার পাশে হোঁৎকা কালোকুচ্ছিত একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। সে ফাঁকে মতন কী একটা যুতসই মন্তব্য করছে আর থেকে থেকে সারা মেলাটা হাহা হাহা করে হেসে উঠছে। অদ্ভুত লাগে শুনতে। ঘোর শান্ত জল—আবার প্রচণ্ড ঢেউ—আবার ঘোর শান্ত···এই রকম মনে হয়।

নিশি উদ্দেশ্যহীনভাবে এগিয়ে চলল। বটতলায় চট পেতে জুয়ার ছক আর গুটির কৌটা নিয়ে মেতে আছে জুয়াড়ীরা। দিন হয়ে এল—তাই আড়ালে সরে যাবার প্রয়াস। একদল লোক পোকার মতন চারপাশে থকথক করছে।

নিশি প্রাঙ্গণের ভেতর ঢুকে গেল। তারপর খতকটা অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটতে হাঁটতে কখন শুঁড়ি পথ বেয়ে চলে এসেছে একেবারে গোবরার ঘরের মুখোমুখি।

দরজায় উঁকি মেরে সে অবাক হয়ে গেল! গুটানো বিছানায় মাথা রেখে খালি তক্তাপোষে চিত হয়ে শুয়ে আছে গোবরা। খালি গা। ধুতিটা হাঁটু অব্দি উঠে গেছে। কণ্ঠনালির ওপর কাত হয়ে পড়ে আছে চাঁদির তক্তি! হাত দুটো পেটের ওপর—আঙুলে আঙুল জড়ানো। একটা মোটা চাঁদির আংটি—লাল পাথর বসানো। আর তার সারা বুকের কোথাও একবিন্দু লোম নেই। নিটোল মাংসের স্বচ্ছতর পিণ্ড—স্তন বিন্দু দুটি লালচে। কেবল পাঁজরের হাড়ের রেখা একটু স্পষ্ট··· পাঁজরের হাড় দেখে মায়া লাগে—নিশির বাপ লোচনেরও ঐরকম আছে, নিশি বলত, বাবা, তুমি শুকিয়ে যাচ্ছো দিনে দিনে।

একদিন নিশি খিড়কির ঘাটে—ভুবনপুরের বাড়িতে ঘাসের বনে একটা সাপ দেখেছিল। আতঙ্কে অস্ফুট চিৎকার করে উঠেছিল সে। ইটের টুকরো তুলেছিল। কিন্তু ছুঁড়তে গিয়ে ছোঁড়েনি। লোচন ছুটে এসেছিল সঙ্গে সঙ্গে। কী, কি রে নিশি?

একটা সাপ।

ইট মার্, মেরে দে···কই, কই দেখি···

থাক।

বনে ঢুকে গিয়েছিল চিত্রবিচিত্র সাপটা। লোচন লেজটা দেখতে পেয়েছিল শুধু। বলেছিল, বাঁকরাজ মনে হচ্ছে। দুটো মুখ থাকে ওদের। দংশালে কাল। তবে সহজে দংশে না· বুকে নিয়ে ঘুমোনো যায়—এত আহ্লাদে।·

নিশি শুধু বলেছিল, কি সুন্দর!

সুন্দরকে হননের প্রবৃত্তি তার হয়নি। তাই হয়তো বল্লভ কাঁসারির আততায়ী পিছিয়ে এসেছিল মোহগ্রস্ত হয়ে। নিশি হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ঘুমন্ত গোবরার দিকে। লোমবিহীন সুডৌল বুকটা শ্বাসপ্রশ্বাসে ফুলে ফুলে উঠছে। সেই ওঠানামা দেখতে থাকল সে রুদ্ধশ্বাসে।

যে যতই বলুক, গোবরা মানুষ ছাড়া কিছু নয়। সেও মানুষের মতন ঘুমোয়। নিশ্বাস ফেলে। নিশি তন্ময়তার মধ্যে ভাবছিল—এই লোকটির পৃথিবীতে কি কেউ নেই? ঘরসংসার, বাবা-মা ভাইবোন· কেউ? এমনি করে শুয়ে থেকে কী সুখ তার?

॥ আট ॥

অরণ্যের কাহিনীতে আছে—অজগরের চোখের মায়ায় হরিণশিশু নাকি ক্ষুধার্ত গ্রাসের দিকেই চলে আসে। সর্বনাশের হয়তো অমনি মোহ। কিন্তু নিশির এই চুপিচুপি খোঁজখবর, নিষ্পলক চাহনির মধ্যে তেমন কোন মোহ ছিল না। বরং সব মোহকে সে যেন একটা প্রত্যক্ষ উপস্থিতি দিয়ে মোচন করতে চেয়েছিল। মোহহীনতার মধ্যে স্পষ্ট চোখে দেখতে চাচ্ছিল অন্ধকার আলোর দ্বৈত রূপের নীচে লুকানো কী আছে। আর তাই যেন আলোটা দেখার পর অন্ধকারকে খুঁটিয়ে দেখার প্রবল ইচ্ছে তাকে মরীয়া করে তুলল।

সেদিন মহাদেব ঠাকুর তাকে দেখতে পেয়ে না ডাকলে আর কি করত, কে জানে।

মহাদেব ঠাকুর বুড়ো মানুষ। যত গাছি চুল তার মাথায় পেকে রয়েছে, ততগুলি সুখদুঃখ পাপপুণ্য ধর্মাধর্মের কাহিনী তার জানা। সে তাকে চাপা গলায় ডেকে এনে তিরস্কার করেছিল। ভয়ডরহীনা নিশি তাকে অবাক করে বলে বসেছিল, ও আমার কী ক্ষতি করতে পারে?

পারে। মহাদেব উত্তেজিত হয় নি। সে দেখেছে এমন হাস্যকর জেদ অনেক মেয়েরই থাকে। এই মেলায় তার জীবন কেটে গেল দেখতে দেখতে। নিশি তো গেরস্থঘরের সাধারণ মেয়ে, পাকেচক্রে মেলার ঘাটে পাড়ি দিয়েছে—সেই পাক্কা বাজারী মেয়ে ঝুমুরওয়ালী এলোকেশী-তুফানী-গৌরী-চাঁপা, চুড়িওয়ালী কুসুম বেদিনী,…এমনকি তার পিসি বিনোদিনী…তাদের চোখেমুখে ব্যবসার মুখোস, বুকের স্পন্দনে টাকার টুংটাং [তখন রুপোর টাকার প্রচলন]…তারাই হার মেনেছে! ফুলেফুলে এলোচুলে কেঁদেছে—অসম্বৃত বসনভূষণ, পাপের পিচ্ছিল জিভের লালায় আটকেপড়া কীটের মতন। কারণ যত করো, যত বলো, মূলে তুমি তো আসলে মেয়েমানুষ—শুধু মেয়েমানুষ! পুরুষের প্রাণভোমরা তোমার ওই যৌবন-দেহের সোনার কৌটোয় লুকানো—সাতশো রাক্ষসের প্রাণ। তাই পলকে ছুটে আসে হাঁউ মাউ করে সাতসমুদ্দুর তেরনদীর পারে কি পর্বতে কি গহন বনে, যেখানেই থাক। সে যখন শেষ, সকলই শেষ—শূন্য, শব্দ ত্রাস গর্জনহারা, মহা নীরবতা। নিষ্ফল পাষাণের ওপর তুমি ধীরে ধীরে লুটিয়ে পড়ে শুধু মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করো। আর কেউ আসছে না। আসবে না।

ও নেশা ভালো না, মা। ঘরে ফিরে যাও। এ মেলা বড় ভেল্কীর জায়গা। যাদুকাঠি বুলিয়ে সব কেড়ে নেয়। পুরুষের অনেক সম্পদ—ধন মান প্রাণ। মেয়েদের ওই এক বই দুই নেই। যার ধন গেল, তার মান না থাক, প্রাণ রইল। আর তোমাদের? ওই এক—যৌবন। ওই তোমাদের ধন বলো, মান বলো, প্রাণ বলো—সব গেলে কিছু থাকে না।

নিশি রেগে লাল। বুড়ো এমনি করে তাকে অপমান করল? ছি, ছি, ও বুঝি তাকে মন্দ কিছু ভেবে বসেছে! ভেবেছে, নিশি গোবরার মতো শয়তানের মনের মানুষ, প্রেমপীরিতির জুয়াখেলায় মেতে উঠেছে রাতারাতি!

অপমানে লজ্জায় ক্রোধে নিশি পালিয়ে এসেছিল। হতচ্ছাড়া বুড়ো, পাপ তোমার চোখে, তোমার মনে। আমি এলোকেশী গৌরী না, কুসুম চুড়িওয়ালী না—এমনকি বিনোদিনীও না। আমি নিশি, নিশিলতা। ভুবনপুরের বীণাদির বর আমাকে ভালোই চেনে। হাতের চেটোয় চিমটি কেটে কী বলতে চেয়েছিল—তার আঙুলের মাংস তুলে নিয়েছিলাম। রুমাল বেঁধে বাড়ি ফিরেছিল সে। বীণাদিকে বলেছিল…কী যেন একটা বলেছিল, মনে পড়েনা। কিন্তু হাসি পেয়েছিল শুনে।…

তারপর গোবরা এল দোকানে।

তখন ঠিক মাথার ওপর সূর্য। রোদে চারদিক ঝাঁ ঝাঁ করছে। মেলার মানুষ ছায়ার দিক ঘেঁষে চলাফেরা করছে। চালচুলোহীন পসারীরা সরে গেছে বটতলার দিকে। জুয়াড়ীরা তক্তাপোষে চিত হয়ে ঘুমোচ্ছে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে। ওখানে প্রহ্লাদের দোকানে আবার মাল এল ট্রাকে। ট্রাকটা গেট পেরিয়ে চলে গেল। বিনোদিনী বলছিল, পেলাকে কি ভূতে পেল রে? ও যে রাজ্যের মাল এনে নদীতে চড়া ফেলবার তালে! হতভাগা, বেচবে কী করে?

জবাবটা গোবরা এসে দিল। কেনবার লোক বাড়ছে, সেটা টের পেয়েছে ব্যাটা। সত্যি পিসি, টাকার যেন জন্মবৃদ্ধি হচ্ছে। শালা গাঁজাখোর ওই ছোটুর পকেটে সেদিন দেখি একটা পাঁচটাকার নোট! বলে—ফাউন্টেনপেন কিনবে একটা! মুখভেংচে গোবরা বলতে থাকল, মুখ দিয়ে শুদ্ধ কথা বেরোয় না। মাগকে পেন দিয়ে চিঠি লিখবে··

যার আছে তার আছে বাবা—যার নেই, তার কিছু নেই।

নেই মানে—ওদিকেও নেই। বুঝলে? রক্তের জোরই নেই···চারপাশে টাকা উড়ছে, তোমার হাত যদি নুলো হয়, টাকার দোষ কি?

সেকথা না—সবাই সব জিনিষ পারে না। কেউ দুধ বেচে মদ খায়, কেউ মদ বেচে দুধ। ধর্মাধর্মজ্ঞান তো লোপ পায় নি··

গোবরা লাফিয়ে উঠল। ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির সব! রাখো শালা হাবাতে অকম্মাদের কথা—একটা পান দাও!

পান দিয়ে বিনোদিনী বলল, বিয়ে ফুরিয়ে বাজনা! এ্যাদ্দিন ছিলি কোথায় রে তুই?

গোবরা পানের একটা কোণ দাঁতে কেটে ফেলে দিল। মুখে পুরবার আগে থুথু ফেলল সশব্দে। তারপর বলল, তীর্থে গিয়েছিলাম।

সে কি রে?

হ্যাঁ। তোমরা ধার্মিক লোক—তোমাদের যেমন তীর্থ আছে। আমি পাপীতাপী—আমারও কি তীর্থ থাকতে নেই?

ছেলেকে কথায় পারা কঠিন। বিনোদিনী স্নেহপ্রকাশের ভান করল। অথচ নিশি সামনে বারবার যাচ্ছে-আসছে, তাই ভেতরে বিরক্তি আর অস্বস্তি কম নয়।

গোবরা পিক ফেলে বলল, তোমরা ধর্মের নামে বলি দাও, আমিও অধর্মের নামে বলি দিই। ক'দিন ওই বলির কাজে ব্যস্ত ছিলাম। শিবপুরের তারিণী মুখুজ্জেকে চেনো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে তো নামকরা লোক···

আর উদয় পাকড়াশীকে ?

চিনবোনা আবার ?···কত পান খেয়েছে আমার হাতে ! সেও মস্তো লোক, বাপু !

দুই ষাঁড়ে লড়াই চলছিল বহুদিন থেকে। পলিটিকসের গোলমাল···

পলিটিকস কী বিনোদিনী জানে না। তবু কিসের একটা গন্ধ পেয়ে সে শিউরে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে।

উদয় পাকড়াশী ডেকেছিল। সে আবার বলে বেড়ায়—গোবরা হাড়ি আমার ডানহাত,···পোষা কুকুর ভেবে বসে আছে। গোবরা বলতে থাকল, তা ভাবুক। গেলাম তো সেখানে। ওরে বাবা, শালা বলে, একটা বলির আয়োজন করেছি গোবর্ধনবাবু···

নিশি খিলখিল করে হেসে উঠল। সামলাতে পারল না আর। গোবধন, আবার বাবু···

বিনোদিনী চেঁচাল, মুখে ঝাঁটা মারবো, শেলাই করে দোব একেবারে।

গোবরা বলল, হাসুক। হাসতে দাও। দাঁত গজায় নি, এখন হাসিতে ট্যাকসো নেই।···মাইরি পিসি, হাসবার কথাও বটে! খাতির করে গোবর্ধনবাবুই বলে লোকে—শোননি ? গোবরা হাড়ি কেবল আমিই বলি।

তা কি হলো বল্ ? শুনতে ইচ্ছে নেই বিনোদিনীর। অথচ গোবরা শোনাতে চায় মনে হচ্ছে ! তাই প্রশ্ন না করে পার নেই।

বলি দিতে এক ঝঞ্ঝাট ! ফয়শালা-আপোষ করতে চাইলাম। উল্টে তারিণী মুখুজ্জে বলে—ধর্মের জয় আর অধর্মের ক্ষয়। আমি জিতবোই।··· ভেবেচিন্তে দেখলাম, উদোটা পাজী বেশী—কিন্তু বাঁচলে পাপের সুনাম রক্ষা হয়। তারিণীর কিঞ্চিৎ ধর্মজ্ঞান আছে, বলা যায় না···তারপর···'

তারপর কী হলো গোবর্ধনবাবু ? নিশি ফস করে বলে ফেলল। মুখে মিটিমিটি হাসি।

গোবরা হেসে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ। তারপর···সে বড়ো কঠিন, মেয়েমানুষের কোমল প্রাণ। শুনতে পারবে না।

মেয়েমানুষ দেখে তাই বীরত্ব করা হচ্ছে ? দ্যাখো, আমি কী বীর !

বিনোদিনী নিশিকে এমনিভাবে কথা বলতে দেখে একটু হতবুদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, এই নিশি, ও তোর দাদা হয়। ফাজলেমি করিসনে দাদার সঙ্গে।

গোবরা ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে বলল, দাদাটাদা হওয়া অভ্যেস নেই। পিসির বয়সী মেয়েমানুষ দেখলে যা বলে জানি, আর তোমাদের বয়সীগুলো সব···

বলো, থামলে কেন? নিশির মুখ কিছু গম্ভীর দেখাল।

পিসি মুখ আটকাচ্ছে। একলা পেলে বলব তখন।

এই রকম ফালতো কথা অনেক বলে গোবরা তার বলির কাহিনী শুরু করল।

আত্মবিশ্বাসী পুরুষ তারিণী মুখুজ্জে শহর থেকে ফিরছিল স্টেশনের পথে।

তৃতীয় তিথির বাঁকা একফালি চাঁদ—তখন যেন আগ্রাসী অন্ধকারের পিচ্ছল ঠোঁটে কুটিল বিদ্রূপের হাসি। সন্ধ্যার পর স্টেশনে নেমেছে তারিণী মুখুজ্জে। মুখ উঁচু করে হাঁটছে। বসন্তকালের সন্ধ্যাবেলার হাওয়ায় কি যেন থাকে। মাঠের বুকে নির্জনতার স্বাদ। সে গুন গুন করে গান গাইছে।

পশ্চিমে রক্তলাল মেঘগুলি অন্ধকারের বন্যায় ধ্বসে পড়ে গেল ক্রমান্বয়ে। যেদিকে তাকায় ওই কালো ছায়া। একখানি কুটিল হাসি গুটিয়ে নিয়েছে সেই ক্ষুধার্ত সর্বগ্রাস।

আকাশে নক্ষত্র। পাপের ভূষণ ঝলকায়। গোবরা পাপের অন্ধকার দোলনায় সুখে দুলছে। খালপোলের ওপর সে আরামে পায়চারী করছে। সাঁকোর দুদিকে নাচে দুজন অনুচর—অবশ্যই পাকড়াশীর লোক।

গান থেমে গেল তারিণী মুখুজ্জের। বয়স হয়েছে, লজ্জা পায়। দেশের মুখপাত্র মানুষ, পরনে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী। তখন সাদারঙটা কেমন উজ্জ্বল হয়ে ফোটে, এ বড় আশ্চর্য! গলা ঝেড়ে বলল, কে?

আজ্ঞে আমি গোবরা হাড়ি।

এখানে কি করছো?

(ঠাট্টার মতো শোনায় এ প্রশ্ন। বুকে হাত দিয়ে বলতো মুখুয্যে, তুমি জানোনা গোবরা হাড়ি এখন এখানে কেন? নাকি পাপকে এত অবিশ্বাস, এত অবহেলা, ফুঁ দিয়ে শুকনো ঘাসের মতন উড়িয়ে দিতে পারো? তুমি কি সত্যযুগের লোক তারিণীবাবু? আশ্চর্য, তোমার আয়ুর জোর। কিন্তু আমার চেষ্টার ত্রুটি হবে না। ওইরকম হুকুম আমার ওপর রয়েছে।)

গোবরা বলল, আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

কেন গোবর্ধন?

(লে বাব্বা, এ যে মায়ের দুধ ছাড়েনি এখনও!)

চুপ করে কেন বাবা?

আমি কারুর বাবাটাবা নই। ছেলেপুলেও নই স্যার। আমি নিতান্ত গোবরা হাড়ি।

হা হা হা হা করে হাসল। মুখে বললেই তা সত্য হয় না বাবা। তুমিও তো মানুষ। কাজেই সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক আছে—তার ভালোমন্দে তোমারও ভালমন্দ রয়েছে···

দীক্ষাদাতা গুরু যেন। চাপা কণ্ঠস্বরে হিসহিস করল গোবরা—থাক। আপনার জ্ঞান আপনারই থাক স্যার, কষ্ট করে শিখেছেন, ব্যানাবনে ছড়াবেন না।

তোমার উদ্দেশ্য কি গোবর্ধন?

আপনাকে খুন করা।

জীবনে অনেক মানুষ দেখেছে গোবরা হাড়ি। কিন্তু এমন বদ্ধ পাগল কোথাও দেখেনি, যে মৃত্যুর কথা শুনে, সুমুখে কুখ্যাত কালান্তক যম দেখেও হা হা হা হা করে মাঠের স্তব্ধ অন্ধকার চৌচির করে ফ্যালে!

তাই বদ্ধ পাগলের গায়ে হাত তুলতে তার যেন বাধছিল।

হাসি থামিয়ে তারিণী মুখুজ্জে বলল, আমাকে খুন করে শিবপুরে কার কি লাভ হবে জানি না, বরং ক্ষতি হবে কার সেকথা কদিন পরেই জনসাধারণ স্পষ্ট কণ্ঠে বলবে। কারণ অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার মতো লোক একটিও থাকবে না। শুধু লাভ হবে একজনের। ওই উদোটার। সে দু'হাতে সরকারী গম লুঠবে, প্ল্যানের টাকা আত্মসাৎ করবে, মিথ্যে টেস্ট রিলিফের জরীপ করিয়ে নিজের দালান বানাবে। এক ছেলে বিলেতে গেছে, আর ছেলেকে পাঠাবে অ্যামিরিকা,·

থামুন! গর্জে উঠল গোবরা। অথচ এ কি অদ্ভুত আলসেমি তার শরীরে! শিকারকে নিয়ে জীবনে অনেক খেলা সে এমনি করে করেছে। কিন্তু এমন মন্থরতা তার রক্তকে ঝিমিয়ে ফ্যালেনি।

তারিণী মুখুজ্জেও পাল্টা গর্জাল। থামবো না। কেন থামবো? ন্যায় আর সত্য যেখানে, সেখানে আমি। আমার বিবেক জাগ্রত দেবতা। সে বিনা আমার অন্য দেবতা নেই জেনো গোবর্ধন···

আপনি সেই দেবতার নাম করুন। আমি আমার কাজ সেরে নিই। গোবরা তার কোমর থেকে ভোজালিটা বের করল। নক্ষত্রের আলোয় তার দীপ্তি। অন্ধকারের গহন কন্দরে যে ভয়ঙ্করের নিঃশব্দ হাসি রয়েছে—তার ওপর নক্ষত্রের আলোর প্রতিফলন হয়তো কান্নার মতন মনে হয় আক্রান্তের চোখে।

মরতে আমার দুঃখ নেই। গান্ধীজী মরেছেন, যীশুখ্রীষ্ট মরেছেন, সক্রেটীস মরেছেন, আমি নিতান্ত সামান্য, গোবর্ধন। আমি মরলেও মানুষ থাকবে। সত্য-ন্যায়-ধর্ম লোপ পাবে না। কিন্তু একটা কথা শুধু জানতে চাচ্ছি, এতে তোমার কি লাভ হবে? কি পাবে তুমি? টাকা?

গোবরা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, হ্যাঁ। ভোজালীটা এত ভারী হয়ে গেছে, হাত কাঁপছে তার। কষ্ট হচ্ছে।

আমি যদি তোমাকে টাকা দিই?

কেন দেবেন? ব্যঙ্গে গোবরার ঠোঁট কুটিল হয়ে গেল। প্রাণের মাথায়?

যেজন্যেই হোক—ধরো যদি দিই?

আমি নেবো না।

কেন? উদোকে কথা দিয়েছো বলে?

না।

তবে?

আপনার কথাগুলো আমার অসহ্য বলে। আপনি মিথ্যেবাদী বলে। আপনার যদি বিবেক থাকে, আমি পাপীতাপী—আমারও একটা আছে।

আমি মিথ্যেবাদী, গোবর্ধন? হতাশভাবে চশমা মুছল তারিণী মুখুজ্জে। আমি সেই উনিশশো ত্রিশ সালে নন-কো অপারেশন থেকে এই বাহান্ন সাল অব্দি দেশের কাজে জেল খেটেছি, হয়রানি হয়েছি। সংসারের দিকে তাকাইনি, স্ত্রীপুত্রদের মানুষ করিনি। আদর্শের জন্য লড়াই করে চলেছি! আমি···আমি যদি মিথ্যেবাদী হই···গলার স্বর ভেঙে পড়ল তার—তবে পৃথিবীতে আর আশা করার কিছু নেই গোবর্ধন!

গোবরা অত তত্ত্বকথা জানে না। কিন্তু সে মানুষ দেখেছে। জীবন তার মেলায় মেলায় কাটল। তাই অজস্র মানুষকে জানবার সুযোগ তার হয়েছে। সে হাসবার চেষ্টা করে বলল, আশা কোনদিনই ছিল না তারিণী মুখুজ্জে! সব শালা জন্তু। মুখোশ পরে চলে। ওসব হিস্ট্রি আমাকে বাতলাবেন না।

তবে দেরী করছো কেন?

(সত্যি মুখুজ্জে মশাই, দেরী করছি! কারণ, মুখে কথা বলছি আর মনে ভাবছি কেমন করে আপনাকে মারবো! ঠিক করতে পারছি না।)

তারিণী মুখুজ্জে—সেও তো মানুষ। সুতরাং প্রাণের ভয় রয়েছে। ওই ভয় আছে বলেই হয়তো যমের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছে। বুলির উত্তেজনা শেষ হলে তখন ওই ভয়টুকু বুদবুদ তুলছে নীচে থেকে। অথচ

আশ্চর্য, গোবরা হলপ করে বলতে পারে—আচমকা দৌড়ে পালিয়ে গেলে গোবরা তার পিছু নিত না। দু একটা কিম্ভূত জীব সংসারে চরে বেড়ালে বেশ লাগে দেখতে। কথায় বলে আমে-ডুমুরে বাগান। বাগানে সবরকমের গাছ না থাকলে মানায় না।

গোবর্ধন, তুমিও মানুষ।···বিড়বিড় করে উঠল তারিণী মুখুজ্জে। ···বুঝে দ্যাখো বাবা। আমি আজ শহরে গেলাম। স্ত্রীছেলেমেয়েরা, হিতাকাঙ্ক্ষীরা নিষেধ করল, শুনলাম না। বলল, স্টেশনে থাকবে কেউ আলো নিয়ে। বারণ করে বললাম—আজ ফিরবোনা। অনেক কাজ আছে। ছেলে দু'টি ক্লাস টেনে প্রমোশন পেয়েছে। বই কিনে আনলাম। মেয়ে বলেছিল, একটা ফিতে আর ব্যাগ এনো···স্ত্রী বলল, খেজুরগুড় এনো কিছু···সব কিনলাম। কত সাধ থাকে মানুষের, কত প্রয়োজন···

অল্প একটু হাসল সে। নাক ঝাড়ল। ফের বলতে থাকল, সংসারে আপনজন থাকলেই তারা পথ চেয়ে বসে থাকে, প্রত্যাশায় ছটফট করে। ওরা অনেক আশা করে বসে আছে।···

গোবরা চারপাশে তাকাচ্ছিল। কেউ এসে পড়বেনা তো! তার ভাগ্য, তারিণী মুখুজ্জেরও ভাগ্য!

জীবনে নিজের জন্যে কিছু করিনি গোবর্ধন। অনেক লোভ দেখিয়েছে লোকে! কান পাতিনি। ছেলেমেয়েদের প্রতি স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালনে ত্রুটি ঘটেছে!···

অনেক দূরে আলো! সাইকেলের ঘণ্টা কানে আসে হাইওয়ে থেকে। এদিকে মোড় নেবে কি না কে জানে!

তবু তুমি চিন্তা করো বাবা, তোমার যদি কেউ ঘরে থাকে—শহর থেকে ফিরবে কখন—এই প্রত্যাশায় তোমার পথ চেয়ে বসে থাকে! তারপর শুনল· ·তুমি আর কোনদিনও ফিরবে না। মরতে দুঃখ নেই। কিন্তু ভাবলে কেমন লাগে। সত্যি এমন করে কোনদিন ভাবিনি।···অস্ফুটকণ্ঠে হেসে উঠল সে।

নাঃ, ছেড়ে দিত একটা কিম্ভূত পাগলকে। বোঝা যাচ্ছে, এ পাগল নয়। হাড়ে হাড়ে বুদ্ধিওলা নিতান্ত ছাপোষা মানুষ।

ভারী অদ্ভুত ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল তারিণী মুখুজ্জে।

শরীরের কোনখানে এক ইঞ্চি বসলে সঙ্গে সঙ্গে মানুষ খাবি খায়, গোবরার শিক্ষা আছে। তা সে করবে না। ততক্ষণে তারিণী মুখুজ্জের মৃত্যুর নমুনা

তায় তৈরী। শুধু একটা কিছু উস্কে দেবার অপেক্ষা। শীতে ঠাণ্ডা জলের পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে আছে যেন, নিজে থেকে ঝাঁপ দেওয়া কঠিন। কেউ পেছন থেকে আচমকা ঠেলে দিলে আর ভয় নেই। ঠিক সেইরকম।

নিজের এই দুর্বলতার ওপর যেন ক্ষেপে উঠল মুহূর্তে। মানুষ তার হননেচ্ছার কাছে গাছ পাথরের মতন। ডাক্তারের অবিকৃত আর শীতল মেজাজ নিয়ে নিপুণ হাতে সে কাজ করে যেতে পারে।

কিন্তু তার অস্বাভাবিক নীরবতাকে কি ভেবে বসল তারিণী মুখুজ্জে! সে পা ফেলল এতক্ষণে। তাহলে আসি গোবর্ধন, হাজার হলেও তুমি মানুষ। মনুষ্যত্ব অন্ধকারেও চাপা থাকে না। সত্যের জয় সর্বত্র মনে রেখো।…

গোবরা শিস্ দিল। নিজেকে যেন নিজেই ঠেলে দিল ঠাণ্ডা জলে। অনুচর দুজন ছুটে এসে তারিণী মুখুজ্জের পা দুখানি ধরল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, একি, এ কি করছো গোবরা, তাহলে সত্যি ·

হ্যাঁ, জলজ্যান্ত সত্যি।

হাতের ব্যাগটা ছড়িয়ে পড়লো সাঁকোর ওপর। দুজনে পা ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল পাশের জমিতে আর গোবরা বার বার ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকল! ভোজালি তুলে সর্বাঙ্গ কুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে করতে এগিয়ে গেল দূরে আরও দূরে—নদীর ওদিকে।

আহত তারিণী বিড়বিড় করছে। ন্যায়, সত্য, ধর্ম, পাপ, নরক, যন্ত্রণা, ঈশ্বর। সে আর মানুষক ডাকছে না। পিঠ মাথা ঘষা খাচ্ছে এবড়ো-খেবড়ো মাঠে—চষা জমির ওপর কাঁটাঘাসে। সহজে মরতে দেবে না সুগোবরা হাড়ি এমন বিচিত্র হনন তার জীবনে প্রথম। জীবনের সঙ্গে এমন কৌতুকের যোগ আর কি মিলবে কোনদিন?—কি তারিণীবাবু ধর্ম আছে?

আছে।

ঠোঁটটা ধরে পেঁচিয়ে কেটে নিল গোবরা চলন্ত শায়িত মাংসপিণ্ডটা থেকে।

ওহে ধার্মিক, কথা বলো!

তারিণী বাক্‌শক্তিহীন। কেবল অস্ফুট গোঙানি। তারপর গলায় ঘড় ঘড় শব্দ! নদীর কাছাকাছি এসে রক্তপাগল হিংস্র গোবরা হাঁকরে উঠল, ওরে শালা সত্যবাদী, কথার জবাব দে?

ক্ষীণ একটা স্বর-- জল বলল নাকি?

জল? এই শালার মুখে……

আঃ ছি, ছি, ওকি করছো গোবরাদা? অনুচরেরা জোড় হাতে দাঁড়িয়ে

গেছে সম্মুখে। রক্তাক্ত শরীরটা একটু একটু কাঁপছে। নরাধম পাষণ্ড গোবরা (মধ্যে মধ্যে নিজেকে এইরকম বলে গোবরা) ভোজালিটা ফেলে রেখে ওই অপকর্ম করেছে নির্লজ্জভাবে।

লাস গোপন করতে বলা ছিল। করল না। থাক ওখানে পড়ে। সারা মাঠ রক্তে ভেসে গেছে। গোপন করা যাবে না।

নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে চান করে নিল গোবরা হাড়ি। ধীরে সুস্থে মাজা-ঘষা করল নোংরা শরীর। ভোজালিটা ধুয়ে চুমু খেল। তারপর সেই ভেজা কাপড়ে ফিরে এল রানীচকে—তখন রাত শেষ হয়ে আসছে। দীঘির ঘাটে কাপড় জামায় সাবান দিল। শুকোতে দিল সেগুলো। রোদের চেয়ে হাওয়া বেশী শোষক। একসময় ঘরে এসে শুয়ে রইল। এমন গাঢ় ঘুম তার কোনদিন হয়নি।

গল্প শেষ করে গোবরা বলল, শালাকে দেখলে ঘেন্না করে। কিন্তু মতে মিলে যায় আমার সঙ্গে। এমনি করে যদ্দিন চলে !

বিনোদিনী কাঠপুতুল। গোবরা নিজের মুখে এত খোলাখুলি তার অপকর্মের বর্ণনা কোনদিন তার কাছে দ্যায়নি। আজ কেন দিচ্ছে ? নাকি ভয় পাইয়ে দিচ্ছে তাকে। নিশিকেও। এ হয়তো তার কুশ্রী দাবীর প্রস্তুতি। নিশিকে বাঁচাবে কেমন করে—সেই ভাবনা হয়।

নিশির কোন ভাবনা হয়েছে বলে মনে হয় না কিন্তু। সে দেখতে চাওয়া অন্ধকারের একটি বর্ণনা পেয়ে গেছে হঠাৎ। আশ্চর্য, সকালে ঘুমন্ত গোবরাকে দেখে কি সব কথা সে ভাবছিল ! তখন যদি জানত, এত নিষ্ঠুর ভয়ংকর কাণ্ড করে এসে সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে ! রক্তের গন্ধ কি ধুলেও যায় ? মানুষ দেখে কিছু বোঝা যায় না সংসারে।

নিশি বলল, তোমাকে যদি একদিন এমনি করে কেউ কষ্ট দিয়ে খুন করে ?

গোবরা মুখ তুলে একবার তাকাল মাত্র। কিছু বলল না।

যে যা করে, তার বরাতেও তাই ঘটে। দেখে নিও···ও ঘটবেই।

গোবরা একটু হাসল। তুমি সেদিন একটু কাঁদবে তো আমার জন্যে ?

ঘৃণায় মন কটু হয়ে যায়। নিশি থুথু ফেলল মুখ ফিরিয়ে। তারপর বলল, এসব কীর্তি-কাহিনী মেয়ে মানুষকে শুনিয়ে কী লাভ ? ভেবেছো, ভয় পেয়ে··· চট তুলে ভেতরে ঢুকে গেল নিশি।

গোবরা চেঁচিয়ে বলল, ভয় পেয়ে কী ? আমার সঙ্গে পীরিত করবে ?

বিনোদিনী অপ্রস্তুত মুখে বলল, দোহাই বাবা, ও আঁটকুড়ী সর্বনাশীর কথা ধরোনা। ও একটা পাগলী। রূপ যেমন মেয়েও তেমন! বাপ তো বুড়ো বয়সে বিয়ে করে বসল। এখন ও মেয়ের একটা দেখেশুনে বর দেখে দাও দিকি। আছে জানাশুনো?

বলা বাহুল্য, এ নিতান্ত কথার কথা। তবু নিশির গায়ে বিঁধেছে। সে ভেতর থেকে বলল, ওর নিজের জোটে কি না, তাই দেখুন।

বিনোদিনী ছুটে গিয়ে ভেতরে ঢুকল। লাথি মারল নিশির জানুতে। অশ্লীল গালমন্দে ফেটে পড়ল। নিশি হাসবার চেষ্টা করছিল।

এখানে গোবরাও হাসতে হাসতে উঠে যাচ্ছে।

প্রহ্লাদ এদিকে আসছিল। বলল, কি হলো, হাসলেন কেন গোবর্ধনবাবু?

গোবরা হাসি থামিয়ে বলল, আপনাকে দেখে।

আমাকে? কেন বলুন তো? প্রহ্লাদ বিস্মিত। এইমাত্র আহার সাঙ্গ করেছে সে। স্থূল উদরটিতে হাত বুলোতে বুলোতে বিনোদ পিসির ওখানে পান খেতে যাচ্ছে। আনবার লোকের অভাব নেই। কিন্তু ফাঁক পেলে নিশির সঙ্গে দুটো কথা বলার লোভ সম্বরণ করা কঠিন।

কাছে এসে চাপা গলায় গোবরা বলল, আপনার তো মশাই এখন ছপ্পর ফুঁড়ে ভগবান টাকা ঢালছে। কিছু দিন-টিন না! মেলায় না থাকে, আনিয়ে দিন।

যেন সাধের জামাইটি। প্রহ্লাদের দাঁত বেরিয়ে গেল। বাস্তবিক মেলায় দোকান করবার কথা যেমন ভেবেছিল, সব রকম হিসেব নিকেশও সে চুকিয়ে রেখেছিল আগাম।

স্কীম ছাড়া কোন কাজে সে এগোয় না। এর আগে ব্লকের কাজে স্কীমের ব্যাপারে অবিরাম লিপ্ত থাকার ফলে সে অভ্যাসবশে স্কীমের ছকটা আগে থাকতে ধরে রাখে সম্মুখে। কিন্তু, কি আপদ, গোবরা হাড়ির খাতটা একেবারে বাদ গেছে! সেদিনও ও এসে যখন দোকান দেখে গেল, প্রহ্লাদ বুদ্ধিমান—তবু আঁচ করতে পারে নি। তাছাড়া তার মনে একটা ঔদ্ধত্যও লালিত হয়েছে। এখানে ওখানে সরকারী কর্মচারী থানা পুলিশ উকিল আদালতে দিনের পর দিন পরিচয়ে একটা জয়ী মনোভাব তাকে সর্বদা মাথা উঁচু করে চলতে শিখিয়েছে। সে সচরাচর কাকেও পাত্তা দিতে চায় না। প্রহ্লাদ নতুন যুগের মানুষ। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে যুবক হয়েছে। গ্রামোন্নয়নের সরকারী প্রচেষ্টার সে একজন প্রধান স্তম্ভ। ফলে একটা চোখ তার ওপরের আলোর দিকে, আরেকটা নীচের দিকে ছায়ায়। অথচ সে ছায়ায় যারা লুকিয়ে আছে, তারা গোবরা নয়।

তারা অন্য প্রকৃতির মানুষ। আর মজার কথা এই—ওই ছায়ার মানুষগুলি যখন আলোয় আসে, ফারাক করা যায় না। ছায়া কোন ছোপ ফেলে না কারুর গায়ে।

কিন্তু গোবরা হাড়ির জাত আলাদা। ও কোন যুগের মানুষ? সকল যুগের পাপীর আদল ওর মধ্যে।

কি হলো, কথা বলছেন না যে? গোবরা গম্ভীর মুখে ফের বলল। ও বেলা বড়বাবু আসবে থানা থেকে, বুঝেছেন কি?

প্রহ্লাদ অপমানিত বোধ করছিল। কিন্তু বড় সহজে সে ক্রুদ্ধ হয় না। হলেও বাইরে তার প্রকাশ থাকে না একটুও। সে আমতা আমতা করে বলল, আমার সঙ্গে বড়বাবুর তেমন তো কোন ইয়ে আছে বলে মনে পড়ে না? খুলে বলবেন?

আছে। সামতির দশহাজার মেরে মনোহারা দোকান খুলছেন। হাজারখানেক ছাড়ুন।

প্রহ্লাদ মুহূর্তে জ্বলে উঠে শান্ত হলো। মাথা ঠিক রাখা দরকার। বলল, আচ্ছা আসুন।

গোবরা অন্তরঙ্গভাবে পাশাপাশি চলতে চলতে বলল, আছে বলেই চাচ্ছি। পাপের টাকা—পাপের দেবতাকে কিঞ্চিৎ উৎসর্গ না করলে আগুনপোড়া ছাড়া কিছু জোটে না। দলবেঁধে ভোগ করার সুখ বেশী, না একা একা বলুন তো প্রহ্লাদবাবু?

প্রহ্লাদ ঘড়ঘড় করে বলল, ও তো কম্যুনিষ্টরা বলে।

কে জানে মশাই, কারা কি বলে! আমারটা আমার নিজের।

দোকানে ক্যাশবাক্সো খুলে টাকা বের করল প্রহ্লাদ। হাত আর কাঁপছে না। যাক একহাজার। কদিনের বিক্রীর টাকা। বিকালে আদায়ে আসবে রানাচকের মায়া ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের লোক। কম টাকা হলে ড্রাইভারের হাতেই খানিক আগে মিটিয়ে দিত। এইমাত্র মাল দিয়ে গেল ট্রাকে। বেচাকেনা খুব জোর চলেছে মেলায়। সারা মেলা এমন চললে আশার কথা।

এখুনি আবার শহরে ব্যাঙ্কে পাঠাতে হয়। এগারোটা বেজে গেছে। পৌঁছোতে একটা···হিসেব করে প্রহ্লাদ চেক বই খুলল।

গোবরা টাকাটা পকেটে নিয়ে বলল, এত টাকা একসঙ্গে রাখবেন না বাক্সে। মেলার ব্যাপার, কখন কী হয়ে যায়। মেলার লুঠপাটের ঘটনা আমি অনেক দেখেছি। ডাকাতি হতেও দেখেছি রাতের বেলায়।···শালারা

এমন পাজি, আমি আছি শুনেও ভড়কায় না। তখন বড় দুঃখু হয় প্রহ্লাদবাবু। জানেন তো, মানীর মান গেলে প্রাণটার দাম থাকে না!

প্রহ্লাদের জিভটা খড় হয়ে গেছে। শুকনো কেসে মাথা দোলাল মাত্র। গতকাল তাদের গ্রামের স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির মিটিং হয়ে গেছে। ঐ এক হাজার দান করলে সেক্রেটারীর পদটা অনায়াসে পেয়ে যেত। কিন্তু হঠাৎ জেদ চড়ে গেল। সূর্য নাগ যে কমিটিতে মেম্বার, সে কমিটির ছায়াও মাড়াবে না সে। ময়রার ছেলে পাশের চেয়ারে বসে বড় বড় বুলি ঝাড়বে, এ তার অসহ্য।··· অথচ ওকে বাদ দিতেও লোকে নারাজ। আজীবন বিদ্যোৎসাহী বৃদ্ধ মানুষ—ওই স্কুল যখন তৈরী হয়, তখন নাকি নিজের মাথায় ইট বয়েছিলেন রাজমিস্ত্রীদের সঙ্গে। তা যখন করেছিলেন, তখন করেছিলেন। এখন নিতান্ত বুলিসর্বস্ব। তাও সব তাতেই নাক গলানো চাই। বই সিলেকশান থেকে মাষ্টারদের মাইনে··· কোনটায় নয়? কি আব্দেরে মহাপুরুষ! বলে, মাইনে দিচ্ছো আশী টাকা সই করবে দেড়শো টাকা, একি কথা! পাগলকে কে বোঝাবে, ওই না করলে গ্রাণ্ট বন্ধ। স্কুলে ছাগল চরবে। তখনকার যুগে হয়তো ওইসব ভালো ভালো ব্যাপার সুবাদে চলত, এখন অসম্ভব। যুগের তাল রাখতেই হবে। সূর্য নাগ বোঝে না। মান্ধাতার আমলের বস্তা পচা কথাগুলো আওড়ায়। খড়ম পায়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। বলে, এঃ, কী দুর্নীতি! সব পচে গেল রে! তোরা নতুন যুগের ছেলে, মুখ বুজে সয়ে যাচ্ছিস? আশ্চর্য! আমরা আমাদের যুগে···

ওই নিয়ে থাকো যুগাবতার মহাপুরুষ। কী করেছো তোমাদের যুগে? যা করেছো দেখাই যাচ্ছে তার ফলাফল। এবং এই নিয়ে বুড়ো বাবার সঙ্গেও বেধে যায় প্রহ্লাদের। ইস্ ভারী দুটো ব্রিটিশ মেরেছো, হরতাল করেছো, জেল খেটেছো। পড়াশোনার মাথা খেয়ে হুজুগে নন-কো-অপারেশনে মেতেছো।

প্রহ্লাদের বাবা একসময়ের নামকরা দেশসেবক। এখন রাজনীতি ছেড়ে সদ্‌গুরুর দীক্ষা নিয়েছেন। প্রহ্লাদের ওপর বর্তেছে তাঁর রাজনৈতিক পোষাকখানি মাত্র। তবে প্রহ্লাদ বলে, দেশ স্বাধীন হয়েছে। রাজনীতির একমাত্র ইস্যু এখন দল ঠিক রাখা। ইলেকশনের দেরী আছে। সেই ফাঁকে ব্যবসায়ে দু'পয়সা কামানো যাক্।

ভালো কামাচ্ছে। কণ্ট্রাকটারীতো রয়েছেই। দুটো হাস্কিং মেসিন আছে দু'নামে। একটা ফার্মিং কো-অপারেটিভে মোটা শেয়ার আছে। সেক্রেটারীও সে নিজে। আর একটা ছিল মার্কেটিং সোসাইটি। সেখানে সম্প্রতি গোলমাল

বেধেছে। তার মূলে বিরোধী দল। তাদের মুখপাত্র বলাই বাঁড়ুজ্জে—উপদেষ্টা ওই সূর্য নাগ।

চেকে সই করে তখনই পাঠিয়ে দিল প্রহ্লাদ। গোবরা চলে গেছে। এ বরং ভালোই হলো। লোকটা হাতে থাক। সুযোগ বুঝে কাজে লাগানো যাবে। কারণ প্রহ্লাদ দেখেছে—অন্যযুগে কি ছিল সে জানেনা; অন্তত এ যুগে যা দেখেছে—টাকার মার বড়ো মার। যে একবার টাকা খায় সে পোষা কুকুরের মতন ল্যাজ নাড়ে, মুখ তুলে কাঁইকুঁই করে।

করবেই। কারণ—চারপাশে সামনে স্তূপীকৃত ভোগের সামগ্রী। দিনে দিনে তা যত বাড়ছে, ক্ষিদে হচ্ছে সর্বগ্রাসী। আরো চাই আরো!

তাই টাকার মূল্য আজকাল বেশী। পেছনের যুগে এত ছিল কি? প্রহ্লাদ দেখেছে, তার মা মাসী দিদিরা কি সাধারণভাবে দিন কাটাত। কী বেশভূষায়, কী আহার-বিহারে! এখন কমপক্ষে দু'ডজন দামী শাড়ী আর রকমারী প্রসাধন দ্রব্য নইলে মুখ ওঠে না। ঘরবাড়ির আসবাবপত্রও কত বেড়ে গেছে! আরও কত প্রয়োজন! এই প্রয়োজনগুলো তীব্রভাবে সুমুখে আসছে ক্রমান্বয়ে। আরও আরও!···গ্রামের জীবনে এ এক আশ্চর্য পরিবর্তন।

সুতরাং আরও টাকা চাই। যেভাবে হোক, টাকা চাই-ই। সেযুগের মতন মাটির নীচে পুঁতে রাখবার জন্য নয়, জীবনকে সতেজ রাখবার জন্য।

দোকানের উজ্জ্বল রঙীন বিচিত্র দ্রব্যরাজির ওপর চোখদুটো বুলিয়ে নিল প্রহ্লাদ। মালগুলোর হিসেব মেলাতে হবে। ছড়িয়ে পড়ে আছে। মধু সরকার নাইতে গেছে। দোকানের শুধু বিনয় আর তপন—দু'জন ছোকরা কর্মচারী। বিনয় চেক নিয়ে বেরিয়ে গেছে। তারা কি কিছু বুঝল? গোবরাকে অমন করে প্রকাশ্যে টাকা দেওয়া ঠিক হয়নি। নাঃ অপমানবোধ লুকিয়ে জ্বালা দিচ্ছে। এ খুবই হাস্যকর। তেমনি অসহ্য।

প্রহ্লাদ গলা ঝেড়ে বলল, তপু, একটু বোস! আমি পেছনে গিয়ে ঘুমিয়ে নিই।

তপন বলল, চটের পর্দাটা ফেলে দেব? এখন তো খদ্দের নেই।

বলা যায় না। প্রহ্লাদ হাই তুলে উঠলো। চোরটোর আসতে পারে। ঘুমিও না কিন্তু।

তপন ফিক করে হেসে বলল, আর চোর আসবে না। চোরের সর্দারকে হাত করলেন!

প্রহ্লাদের মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। ধমক দিয়ে বলল, ডেঁপোমি

করোনা তো! তারপর পেছনের ঘুপটি ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। বড্ড গরম পড়েছে—ঘুম হবে না। নাকি বটতলায় যাবে একটা বেঞ্চ নিয়ে?

এদিকে বিকেল হতে হতে এখানে এক নতুন ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে। পিসি বিকেল অব্দি একশো কুচ্ছো গেয়ে, বাপান্ত করে, তাতেও রেহাই দ্যায়নি। ফের কিল মেরেছে বুকে-পিঠে। কাণ্ডটা ঘুপটি ঘরের ভেতর না হলে সারা মেলা জড়ো হতো এখানে। বিনোদিনীকে না চেনে এমন লোক নেই।

নিশি নায়নি-খায়নি। সেই থেকে শুয়ে আছে ভেতরে। বেরুনোর নাম নেই। তার মনের জ্বালা ঘোচে না।·· আমি গোবরা হাড়ির পীরিতে পড়েছি! তাই এত সাহস···অমন করে যা-তা বলি ওকে? ছি, ছি, এ লজ্জা মলেও সঙ্গ ছাড়ে না। ওই ছোটজাত হাড়ি না মুদ্দোফরাস তার সঙ্গে নিশির নাম মেশানোর দুঃখ কেঁদেও যাবার নয়। তবু কাঁদছিল নিশি। নিঃশব্দে উপুড় হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছিল বিছানায়। তার বাবার কথা মনে আসছিল। সে তো শত্রুর বাড়া! ছেলেবেলা থেকে নিশিকে কেমন করে মানুষ করেছে, নিশির তা সবই মনে আছে।

এই সব ভেবে সে কাঁদছিল। সান্ত্বনার অবকাশ কোথাও নেই আর। পিসি তাকে এত নীচ প্রবৃত্তির মেয়ে মনে করবে কল্পনাও করেনি কোনদিন। তাই সে ক্ষোভে অভিমানে গর্জে উঠেছিল—হ্যাঁ, তোমার মতন আমিও মেলায়-মেলায় পীরিতের নাগর খুঁজে বেড়াচ্ছি!

বিনোদিনী বলেছিল, হ্যাঁ, ওই করতেই তোকে এনেছি এখানে। তুই বাজারে হবি আর আমি কাঁড়িকাঁড়ি টাকা গুনবো। ছেনাল—বেজন্মা···কালই তোর চুলের ঝুঁটি ধরে ভুবনপুর পাঠিয়ে দিচ্ছি। সৎমায়ের লাথিঝাঁটা খা গে···বর তো জুটবে না!

এই বলতে বলতে বিনোদিন ও কেঁদে আকুল। বাইরে বাইরে কারা বলছিল, ও পিসি কাঁদছো কেন?

কাঁদছি, সখ হয়েছে, তাই।

নাঃ, পিসিকে ঘাঁটালে হাউই তুবড়ী উড়িয়ে দেবে। চিল শকুন উড়ে যাবে মেলার ওপর। তাই, কাঁদছো, কাঁদো। আমাকে একখিলি পান দাও, ব্যাস!

খানিক পরে কে এসে বলল, ও পিসি, একখিলি নতুন পান দাও তো, ওই যে কি নাম রেখেছো শুনলাম···নিশিলতা!

বিনোদিনী হাঁ করে গেছে। জিভটা লালায় চবচব করে কাঁপছে স্পষ্ট দেখা যায়, কে বললে রে? ওসব ফালতু কথা কার কাছে শুনলি?

মাইরি নেই ?

ঝাঁটা মারবো মুখে। ভাগ্‌ পিচেশ কোথাকার !

যেভাবেই হোক্‌ কথাটা রটেছে মেলায়। অনেকেই চাচ্ছে একখিলি নিশিলতা। ঘেমে চবববে হয়ে উঠল বিনোদিনীর মুখমণ্ডল। কে রটাল এই অনাছিষ্টি কথা ? গোবরা নয় তো ?

কমবয়সী ছেলে একদল। পিসি, নিশিলতা চাই, নিশিলতা। নির্ঘাৎ ঠাট্টা। কিন্তু···কিন্তু এ সর্বনাশের ঘণ্টা বাজাল কে ? রানীচকের মেলা থেকে পাততাড়ি গুটোতে হবে যে এবার ! পাগলীর পেছনে যেমন করে লাগে তেমনি লাগা লেগেছে মনে হচ্ছে। সকালের দিকে হলে, একে ওকে বলে সামলানো যেত। কিন্তু এখন জমাটির সময়। হাজার হাজার বিশৃঙ্খল ভীড়ের মানুষ সামলানোর উপায় নেই। কেউ তো মানে না।

এ মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলা অন্য মানুষ। এ যেন বানের স্রোত। এর থেকে বাঁচাতে পারে না নিজেকেই !

মুখ গোমড়া করে ঝাঁপ ফেলে দিল বিনোদিনী। সন্ধ্যা হয়ে আসে। সবখানে আলো জ্বলে উঠেছে একটি দুটি করে। তার দোকানে আলো জ্বলল না। বন্ধ দেখে ফিরে গেল অনেক কৌতুকপ্রিয় মানুষ। বিনোদিনী আস্তে আস্তে মেলার বাইরে চলে গেল। ফাঁকা মাঠে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ ধুপ করে বসে—অনেক অনেক দিন পরে, স্বামী মন্মথর নাম ধরে খানিক কাঁদল। বেঁচে যখন ছিল—তখন জোর করে আটকে রাখলে, এপথে পা বাড়াতো না তো বিনোদিনী !

কান্না ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এল। আকাশে একফালি চাঁদ। মৃদু জ্যোৎস্না বিষন্নতা ছড়াচ্ছে মাঠের ওপর। ফের সে ফুঁপিয়ে উঠল। নন্দ সরকারের নাম ধরে কাঁদতে থাকল এবার।—তুমি বলেছিলে কলকাতার বাসায় নিয়ে রাখবে তোমার বিনুকে ! গেলে না। আশায় আশায় আমার দিন চলে গেল। আজ বুড়ো হয়েছি। চুল পেকেছে। দাঁত নড়বড় করছে। একি লাঞ্ছনা ভাগ্যে ছিল !

নিশিও ততক্ষণে বেরিয়েছে।

শুয়ে শুয়ে সব শুনছিল সে। আর চুপ করে থাকতে পারল না। বেরিয়ে এল বাইরে। আলোকিত মেলার এই একটি প্রান্তে যেন একদলা অপমানের গ্লানি কালো রঙ ধরে অন্ধকার হয়ে আছে। সে স্পষ্ট বুঝছিল, গোবরা হাড়ি তার ওপর এমনি করে প্রতিশোধ নিচ্ছে। আজ এ তার নিতান্ত তুচ্ছ একটু

কৌতুক। কিন্তু নিশিদের কাছে লজ্জা অপমানের মারাত্মক আঘাত। শিউরে উঠল নিশি। কী সাংঘাতিক শত্রুকে সে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছিল কদিন ধরে!

কিন্তু বিনোদিনী কোথায়? বোধহয় দ্বিজু ঘোষালের কাছে। দ্বিজু ঘোষাল কী করতে পারে এতে? তাছাড়া সে যখন শুনবে, গোবরা এর পেছনে আছে, সেও তো লেজ গুটিয়ে সরে যাবে। তখন? দোকান গুটোনো ছাড়া উপায় নেই।

পিসির চুল পেকে গেল মেলায় ঘুরে। অনেক কাণ্ড জীবনেও ঘটেছে। তার মতো বিনোদিনীও একদিন এমনি যুবতী ছিল। নিশির চেয়ে শতগুণে সুন্দরী ছিল সে। আজও কাঁচা-পাকা চুলগুলি রেশমী সুতোর মত সুন্দর, কোঁচকানো ভ্রূত্ব'টি টানাটানা, বড় বড় চোখ বলিরেখা ঘিরে উজ্জ্বল চিকন মুখখানি, দুপুরে পান খেয়ে লাল টুকটুকে ঠোঁটে যখন পা মেলে বসে থাকে, মনে হয় পটের জগদ্ধাত্রী। তেমনি সুঠাম দেহগঠন—হাঁটলে মনে হয়, যুবতীকেও হার মানিয়ে দিল।

আর নিশি তো শীর্ণ লতার মতন। শুধু নাকি চোখ আর কপালের গুণে রূপ খোলে তার! অথচ সে মেলায় এসে এ কি অনাছিষ্টি ঘটতে থাকল? ফিরে যাবে ভুবনপুর? এখনই এই রাতের প্রথম প্রহরে চুপচাপ দশ মাইল পথ!

পথ তো চেনে না নিশি।··

তার আগে গোবরা হাড়িকে একবার মুখোমুখি পেতে চায় সে। কী ক্ষতি করবে তার? সাবিত্রীর মতন তারও শরীরকে অশুচি করে দেবে—এই তো?··· তখন··তখন··হাত মুঠো হয়ে এলো। দাঁতে ঠোঁট কামড়াল নিশি। সেই ভোজালিটা কি গোবরার কাছে আছে?···

ভীড় ঠেলে দ্রুত এগোল নিশি। ইটের টুকরোর অভাব নেই। আগে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুধু জেনে নেবে—এই রটনাটা কার। কেন সে এমন রটালো? সে যদি অতোবড়ো বীর, একটা নিরীহ নির্দোষ মেয়ের পেছনে অমন চুরি করে লাগল কেন? মুখোমুখি যেমন করে টাকা চায়, তেমন করে তাকে দাবী করল না কেন? তাহলে বোঝা যেত তার মুরোদটুকু।

ছেলেবেলায় মা মারা গেলে নিশি একা একা বেড়ে উঠেছে। বাবাও তার প্রতি লক্ষ্য রাখেনি। ফলে নিজের ক্ষমতায় নিজেকে চালানোর দীর্ঘ অভ্যাস তার রক্তে একটা দুঃসাহসের আগুন ধিকি ধিকি জ্বালিয়ে রেখেছিল। আজ সুযোগ পেয়ে সে আগুন লকলক করে শিখা বিস্তার করল। নিশি পাঁচিল পার হয়ে প্রাঙ্গণে ঢুকল। তারপর গোবরার ঘরের দিকে এগোল রুদ্ধশ্বাসে।

বিনোদিনী ফিরে আসছে এতক্ষণে।

দ্বিজু ঘোষালের কাছে একবার চেষ্টা করে দেখবে। বলবে দুজন পাইক আমার দোকানে দাও। সব খাওয়া-দাওয়া পানবিড়ি খরচ আমার। যে মুখপোড়া ফষ্টিনষ্টি করবে, দেবে মাথা লাল করে। মামলার কড়ি জোগাব।... নয়তো এক্ষুণি হাঁটলাম থানার দিকে! বড়বাবুকে এক খোক টাকা গুঁজে দোব। টাকায় সায়েবে এসে কাঁধে করে ঢাক বাজিয়ে দেয়। ও তো তুচ্ছ দারোগা।

কিন্তু নিশি কোথায়?

অ নিশি, নিশিলতা! গলা তুলে ডাকল বিনোদিনী! লন্ঠটা হাতড়ে জ্বালাল। নিশি নেই। গেল কোথায় ছুঁড়ি? নাকি ·

নাঃ। সে অসম্ভব। তাহলে মেলায় এতক্ষণ হট্টগোল পড়ে যেত। সেবারে ময়নাহাটে মেলা দেখতে এসে কাবা একটা বৌকে একা পেয়ে কাঁধে তুলে পালিয়েছিল মাঠের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে রটতে দেরী হয়নি। মেলার লোক সবখানে। চোখ এড়ানো কঠিন।...

হতভাগী বৌটাকে মাঠে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। একেবারে রক্তপাত। তাতে তিন মাসের নাকি পোয়াতি। হাসপাতালে যেতে যেতে খাবি খাচ্ছিল; আর বাঁচল না।

মেলায় যে বাঘ ভালুক ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে। একটু এদিক ওদিক হলে কারোর রক্ষে নেই। ওরে রাক্ষস, ওরে পাপিষ্ঠ, সৃষ্টিছাড়ার দল, তোরাও তো ওইরকম মেয়েমানুষের কেউ বাপ, কেউ দাদা, কেউ কাবা জ্যাঠা। মেলায় এসে এ কী কাণ্ড তোদের!

মনে মনে এই গালমন্দ দিতে দিতে সারা মেলা খুঁজল বিনোদিনী। তার বুক ধুকধুক করছিল। পাকা নয়, বুদ্ধিসুদ্ধি বড় কাঁচা। সংসারের বোঝে কী। জানে কী। কার ছলে ভুলে গিয়ে ফাঁদে জড়ায়।

অস্থির হয়ে উঠল বিনোদিনী। সার্কাসের তাঁবুর ভেতর উঁকি মেরে চেঁচিয়ে ডাকল। পাত্তা নেই। সিনেমার তাঁবুতেও ডাকল। কে বলল, এই চেঁচিয়োনা এখানে।

চেঁচাবোনা? যাস পান খেতে···মোহিনী পান।

বেরিয়ে যখন দোকানের দিকে ফের ফিরে আসছে—অন্ধকার থেকে কে বলল, পিসি?

কে? বিনোদিনী এগিয়ে গেল।

মোহন, আমি লেবুতলার মোহন।

মরণ। ওখানে কী কচ্ছিস তুই? আর যে দেখি না তোকে এঁ্যা?

সে পরে বলবো। তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

ছুঁড়িকে খুঁজছি। দেখেছিস তাকে?

মোহন চাপা গলায় বলল, দেখেছি। সেকথা বলবার জন্যেই তোমাকে খুঁজছিলাম। বলে পালিয়ে যাবো।

বিনোদিনী শিউরে উঠে বলল, কোথায় সে?

এইমাত্র তাকে গোবরার ঘরে দেখে এলাম। ওই ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে···

বিনোদিনী পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল।

দেখে খুব দুঃখ হলো পিসি।·· মোহন ঢোক গিলে বলল। ধিক্ মানুষের জীবনে!·· সবই চোখের ভুল। রাঙতা দেখে সাবি ছুঁড়ির মত তুষ্ট তুই···

কে জানে কী মানে ও কথার। কিন্তু নিশি, তার ভাইঝি নিশিলতা গোবরার ওখানে·· কেন? বিনোদিনী মোহনের কথার জবাব না দিয়ে আলোর দিকে এগিয়ে গেল।

॥ নয় ॥

ধনা ঠিকই বলেছিল। মেলা একটা দেখনদারীর জায়গা। ভালো দেখাও, মন্দ দেখাও. চূড়ান্ত দেখাও! এ যেন মানুষের ইচ্ছা সাধ প্রবৃত্তির না-মেটাগুলোর বৎসরান্তিক প্রদর্শনী। যেগুলো মেটে না, সেগুলো উন্মোচন করে বসে থাকা। হৃদয় খুলে বসে থাকা জনপদের বাইরে প্রান্তরে। হনুমানের মতন শুধু ওখানে তো রাম নাম লেখা নেই, রাবণও খোদাই করা রয়েছে! সু আছে, কু আছে। সকলই প্রকট হয় উন্মোচিত এই পটে!

কেন বসে থাকা এমনি করে? ইচ্ছাকে প্রবৃত্তিকে সাধকে সংকোচবিহীন স্পষ্টতায় কেন তুলে ধরা? ভাবতে অবাক লাগে বিনোদিনীর, সমাজে যে মানুষটি সম্মানী গুণী ধীর পদে হাঁটেন, শান্ত কণ্ঠে কথা বলেন, ব্যয়ে আছে পরিমিতি; মেলায় এসে ভিন্নরূপ ধারণ করেন তিনি। জ্ঞানী সৎগৃহস্থ মেলার জগতে নানারঙের ছোপে কি হাস্যকর, কি ভাঁড়···সকলেই সেই লতিফ ডিমওয়ালা। তাই হাইস্কুলের হেডমাস্টার টেকো বঙ্কুবাবু বেঞ্চে বসে কড়মড় করে পাঁপড় ভাজা চিবোন রাক্ষসের মতন। পঞ্চায়েত প্রধান মনি বাগ—

ভোরের দিকে তাকে ধরে নিয়ে গেল মাতাল অবস্থায়। তেঁতুলতলায় তক্তপোষে শুয়ে বমি করছিল! কবাটওয়ালাদের কে একজন এখনও চুল ছিঁড়ে কাঁদছে—জুয়োর দানে একশো টাকা হেরে গেছে আজ! আর কাঁদছে ভুজঙ্গ চানাওয়ালা। আরে বাপরে বাপ, মর গইল রে, শালা বিচ্ছু কা কইলে… হা রাম! ট্যাঁক কেটে সর্বস্ব চুরি—ঘুমিয়ে পড়েছিল আসরের খুঁটিতে হেলান দিয়ে।

ভোর হয়ে এলে এই হাহাকারের হাওয়া কিছুক্ষণ। সারা রাতের উদ্দাম অসতর্ক উচ্ছলতার পর এখন বিলাপ। কেউ ঘরে ফিরে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে শোনে একবার। কিংবা শোনে না। দাগ পড়ে না মনে। তারা মেলায় আসে বাইরে থেকে। মেলা তাদের বাইরের সুখ। তারা যেন টাকা দিয়ে বারবনিতার ঘরে রাত্রিযাপন করে যায়!

আস্তে আস্তে রোদ এল মেলায়। অন্ধকার কাটিয়ে আলো জন্মগ্রহণ করলো। স্পষ্টতায় সকলই মোহহীন। ক্লান্তি আনে। ঘুম ভারী করে চোখের দুটি পাতা। সারাটি রাতের অশুচিতার আবর্জনা জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়। ভাবনার পট এখন ধূসর। শুচিতার আয়োজন মুহূর্তে মুহূর্তে। কোথায় যেন গুরুতর ভুল ঘটে গেছে রাতে। এমনি মনে হয়, আর ফের প্রস্তুতির ব্যস্ততা পরবর্তী রাতের জন্য।

খোয়ানোর রাত। সাধ করে খুইয়ে বসি সকলই ধন, মান, প্রাণ,—যৌবন। নেশা! নেশা! অব্যক্ত বিমূঢ় কামনার বল্গা-বিহীন ঘোড়া ছুটোছুটি করে প্রান্তরে—কোলাহলে আলোয় উচ্ছ্বাসে। সকালে দেখি তার ক্ষুরে যায় রক্ত, খুরে রক্ত, পৃষ্ঠে বেত্রাঘাতের দীর্ঘ চিহ্নগুলি, তার দুচোখে কান্নার জল জমেছে।

ভোরে দলবল নিয়ে রানীচক থানার বড়বাবু হাজির হয়েছে!

বটতলায় চেয়ার পেতে বসে রয়েছে। পাশের চেয়ারে দ্বিজু ঘোষাল। আর গোবরা সামনে দাঁড়িয়েই হাই তুলে তুড়ি দিচ্ছে!

দৃশ্যটা দেখে আনন্দে বিহ্বল হলো বিনোদিনী। ধরুক ধরুক। পাষণ্ডকে ধরে নিয়ে যাক্ হাতে হাতকড়া কোমরে দড়ি দিয়ে। হাজতের ঘরে উল্টোমুখে ঝুলিয়ে দিয়ে একশোবার বেত্রাঘাত করুক পাছায়। জিভে পেরেক বিঁধিয়ে দিক্! মুখে রক্ত উঠে মরুক পাপী গুণ্ডাটা!

অস্ফুট কণ্ঠে স্বগতোক্তি করে ফেলল সে, এই কী হয়েছে, আরও কত হবে! পৃথিবীর নরক যন্ত্রণা সয়ে ফের ওপারে আরেক নরক—জ্বলো নিরবধিকাল। বিষ্ঠাপূয দুর্গন্ধে চুবানি খাও—দাঁত ছরকুটে পড়ে থাকো। পাপিষ্ঠ প্রাণ কিন্তু সঙ্গ ছাড়ছে না! ওই প্রাণ তোমার কাল। এই বলেও মুখ থামে না। কোন

সর্বনেশে বেটি গর্ভে ধরেছিল, তলপেটে কিল মারতে পারেনি? জন্মো হলে নুন ঢেলে দেয়নি গলায়?...হতভাগী বুঝি জানত না!...

কোন মা জানে তার সন্তান কী হবে। এই গোবরার মা নাকি হাড়ির মেয়ে ছিল। বাপ ছিল শহুরে বাবু। সে কোথায় কে জানে--কোন হদিশ নেই! কেমন করে মানুষ হলো, কেউ জানে না। নানান জনে নানান কথা বলে। কেউ বলে শহরে পকেট মারত ছেলেবেলায়! কেউ বলে—ধুর. জানো ওর আসল ইতিহাস? ওর মা ছিল পাকিস্তানের মেয়ে। দাঙ্গার সময় মোছলমানে ধরে নিয়ে যায়। গোবরা মাকে খুঁজতে খুঁজতে এদেশে চলে আসে। এই রকম যে বলে, যে গোবরাকে ভালবাসে বোঝা যায়। দেশ ভাগ দাঙ্গাহাঙ্গামার ক্ষয়ক্ষতি তার বিলক্ষণ জানা আছে। এই লোকটি নির্ঘাৎ খবরের কাগজ পড়ে প্রতিদিন।

বিনোদিনী একবার জিজ্ঞেস করেছিল স্বয়ং গোবরাকে। তখন সে ওই কথা বলেছিল। মা হাড়ির মেয়ে, বাপ শহুরে বাবু। সেই থেকে নাকি শহুরে বাবুরা তার দুচোখের বিষ।

যে কথা অন্ধকারে চাপা আছে, চাপা থাক। কিন্তু ভেবে দেখলে ভয় করে। ছেলে কেমন হবে, কী হবে—তার ওপর মা বাবার হয়তো কোন হাত নেই। বিনোদিনী ঠোঁট উল্টে আপন মনে বলল, বেঁচে গেছি বাবা, কোলে একটা হয়েছিল মারা গেছে। ভগবান বড্ড বাঁচিয়ে দিয়েছেন। নৈলে অহরহ জ্বলেপুড়ে মরতে হত ভাবনায়। দ্যাখ, কোথায় কি করলে, কার তছনছ...

কেমন হাসল সে। কেমন আশ্চর্য হাসি। তৃপ্তি অতৃপ্তির মাঝামাঝি অদ্ভুত কি অনুভূতি তাকে হাসাল, তাই ওই হাসি স্পষ্ট হতে পারল না বুঝি।

নিশি এখনও ওঠেনি। রাতে হাত ধরে টেনে এনেছিল বিনোদিনী। গোবরাও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল দোকান অব্দি। কাল থেকে নিশির মানইজ্জত বিনোদিনীর মর্যাদা—সব কিছুর জিম্মা তার হাতে রইল। কোন ক্ষতি হলে গোবরা পিঠ পেতে দেবে! বিনোদিনী যেন তার পিঠে মুড়ো ঝাঁটা মারে।

তাহলে নিশির জয় হয়েছে। কিন্তু এ কেমন জয়? নিশির যৌবনের জয়—যেমন জয়ের গৌরব বিনোদিনী নিজের জীবনেও বহন করেছে!

অথচ বিনোদিনীর জীবনে কোনদিন গোবরা হাড়ির মতন চাল-চুলোহীন খুনী গুণ্ডার উদয় হয়নি। তাদের আর যত দোষই থাক্, তারা ছিল সমাজের নামজাদা লোক। অর্থবান রূপবান ব্যক্তিত্ববান পুরুষ।

হতভাগিনী নিশি! তার অদৃষ্টে এ কি নষ্টচাঁদের উদয়!

অনেক দূরের মেলায় চলে যাবে বিনোদিনী! যেখানে গোবরা হাড়ি কোনদিনও যাবে না। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি দোকান ভেঙে চলে যাওয়ার ঝামেলা কম নয়। নানান লোকে নানান কথা বলবে। এমন কি গোবরা তাদের হয়তো চলে যেতে দেবে না। কখনও না।

বড়বাবুর দিকে তাই অনেক প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে বিনোদিনী। গোবরা বারবার আড়ামোড়া ভেঙে হাই তুলছে। তোর চোখে আমার নিদ্রা আছে? নিদ্রা তোর যম! বল্লভ কাঁসারি এখনও সুযোগ খোঁজে। তাদের প্রতিহিংসা সহজে দমে যাবার নয়।

কথায় বলে সুন্দর মুখের জয় সবখানে। আমার বড়বাবুও কি গলে গেল গো? যেন প্রাণের সখা কেষ্ট আর সুদাম মনের কথা বলছে। হাহা করে হাসছে।

নাঃ, কিছু হলো না। বড়বাবু চলে গেল সাইকেল চেপে। জুয়াড়ীরা সুমুখে বসেছিল মাটির ওপর। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে বিদায় দিল জোড়হাতে। ভিজু গোমস্তা এগিয়ে দিতে গেল খানিক পথ।

গোবরা এদিকেই আসছে। বিনোদিনী মুহূর্তে বদলে গেল। সংযত ভাবে নড়েচড়ে বসল সে। কী রে ভাইপো, খারাপ কিছু নয় তো?

গোবরা যেন ন্যাকা। খারাপ কি হবে?

বিনোদিনী চাপা গলায় চতুর ভঙ্গীতে ভুরু নাচাল। কেন, সেই শিবপুরের খুন?

তাই বলো! গোবরা বেঞ্চে বসল। নাঃ? উদোকে ধরেছে শুনলাম। কালই জামিন হয়ে যাবে! সাক্ষী দেবে কে? উদো শালা সাক্ষাত যম। লোকে ছেলেপুলে নিয়ে ঘরসংসার করে তো!

একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল বিনোদিনী। তা হ্যাঁ রে গোবর্ধন, সেই বইগুলো, চুলের ফিতে, খেজুর গুড়···সে গুলোর কি হলো?

জানি না।

মাঝের হাটে একটা খুন হয়েছিল। আজকাল নাকি কুকুর দিয়ে খুনীকে খুঁজে বার করে। সেখানে কুকুর এসেছিল।

গোবরা নিষ্পলকে তাকিয়ে বলল, এখানে আসবে না। উদোর ভগ্নিপতি ব্যারিষ্টার, মামাতো ভাই মন্ত্রীর ছেলের সম্বন্ধী···জ্যাঠতুতো দাদা দেশনেতা, কলকাতার ভাইটি যে কলেজে মাষ্টারী করে, সেই কলেজে কোন জজ সাহেবের মেয়ে পড়ে। দুজনে বয়সের ফারাক আছে, তবু পীরিতের আগুন জ্বালিয়ে গতর সেঁকছে···

কথাগুলি হুবহু যথার্থ কি না কে জানে। ওর ওইরকম বলা অভ্যাস। দ্বিজু ঘোষাল বলেন—স্টাইল। গোবরার স্টাইল। বড়বাবু বলেন—কোবরা স্টাইল। চেষ্টা করে দেখো, নকল করা কঠিন।

বিনোদিনী ডাকলো, অ নিশি, নিশি রে, ওঠ, বেলা বারোটা বেজে গেল। নাইবিনে-খাবিনে? কাল রাত থেকে উপোস।

ভিতর থেকে অস্পষ্ট সাড়া এল শুধু।

গোবরা বলল, সে কি? রাত থেকে উপোস! এখনও রান্নাও চড়াওনি দেখছি। খুব দাঙ্গা হয়ে গেছে নাকি? বিনোদিনী শুধু মুখটিপে হাসল।

আমার এ বেলা নেমন্তন্ন। ফজল চাচা মুরগী কাটছে ওই দ্যাখো। বাচ্চা ছেলের মতো শরীর নাচাল গোবরা।

ফজলের মনোহারী দোকান। জুতোও পাওয়া যায় ওখানে। শহরে বড় কারবার। তবু মেলায় আসা নেশা তার। বিনোদিনী বলল, তুই জাত-টাত আর রাখলিনে বাবা··

গোবরা জাত রাখে না। কারুর গায়ে কি খোদাই করা আছে জাত? মানুষ মানে মানুষ। সে বেঞ্চ বাজিয়ে বলল, ওকে তোলাও। বেলা বাড়ছে। খাবে কখন সব?

আসর যতক্ষণ চলে সাজঘরও ততক্ষণ রাখতে হয়। আর এই সাজঘরের মেলায় নিশির যে দিনগুলি কাটছিল, সব মিলিয়ে তা একটা অস্বস্তির।

এবার যেন সে সাজঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। ফুল্লমনে তাকাল চারপাশে। এক আনার নাগিনবাঁশির সুরে কান পাতল। পাঁপর ভাজার গন্ধে বিহ্বল হলো। বটতলায় দাঁড়িয়ে মুড়মুড় করে চিবিয়ে খেতে খেতে সে দেখল চারপাশের সকল মানুষের মধ্যিখানে নিজেকে আলাদা করে খুঁজে পাচ্ছে না।

রানীচকের ভদ্রঘরের মেয়েরা আজও এসেছে। দল বেঁধে ঘুরছে দোকান থেকে দোকানে। আলাপ করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু চাউনী আর চলন দেখে তার ভালো লাগে না। কেমন স্ফিদের ঘোরলাগা মাতাল চলন। অকারণে রুমালঢাকা হাসি, ঢলে পড়া; ভীড়ের মাঝে অমন করে হাত ধরাধরি, হাঁটলে ঘষা খেতে হয়।

কি সুখের গরবে গরবিনী কে জানে। অঙ্গবেয়ে ভূষণে লালিত্যে সেই গরব ছলকে ছলকে পড়ে। মেলাশুদ্ধ যুবাপুরুষ হাঁ করে তাকায়।

কি ভেবে নিশি ফিরে এল দোকানে। পিসি বলল, একা যে? ওরা কোথায়?

কারা? নিশি যেন স্বপ্ন ভেঙে উঠল।

কেন, চণ্ডীর বোন—অমলি-কমলি?

কে জানে তোমার অমলি-কমলি কোথায়? ভীড়ে হারিয়ে গেছে। নিশি ভিতরে ঢুকে গেল। তাইতো, ওদের কথা একেবারে ভুলে বসে আছে! হঠাৎ পাঁপড় কিনতে দাঁড়িয়ে গিঁট খুলে গেছে! দোষ কি নিশির? বিনোদিনী একটা টাকা দিয়েছে কী ভাগ্যে। টাকা কি হবে? টাকায় কেনবার মতো নতুন কিছু নেই। দেখে দেখে লেবুতলার মোহন হয়ে গেছে একেবারে। বরং অনেক-অনেক টাকা পেলে মেলাশুদ্ধ কিনে ফেলে মজা দেখিয়ে দিত মানুষকে।

শাড়ী খুলে ফেলল নিশি। একটু আগে পরা চাঁপারঙ তাঁতের শাড়ীটা ফুলের পাপড়ির মতন চারপাশে খসে পড়ল। আর কেন্দ্রে শীর্ণ সতেজ স্থির পরাগের রেখার মতন ক'মুহূর্ত দাঁড়াল সে। এ ঘরে বড়ো আয়না থাকলে কেমন দেখায় তাকে, দেখে নিত। সবুজ শায়ার ঘাঘরা, রক্তলাল ব্লাউস, গলায় সেই সাদা পাথরের হার।···বেতের প্যাটরায় তার নিজের সম্পত্তি রয়েছে। খুলে সিল্কের শাড়িটা বের করল সে। ব্লাউসের রঙে রঙ। পরবার সময় বুকে হাত রেখে একটু থামল। কি কাঁচুলি বেরিয়েছে আজকাল. বিশ্রী উঁচু হয়ে আছে।·· একটু সময় লাগল ভাবতে। আরো একটা কাঁচুলি রয়েছে—অনেক দিনের পুরনো। ক্রিপের মরচে পিঠের দিকে খয়েরী ছোপ ফেলে দিয়েছে। প্রথম শাড়ী ধরার সময় বীণাদি তাকে ওটা দিয়েছিল। পরে কিন্তু নিশি হেসে বাঁচেনা·· 'ও বীণাদি, চাপড় মেরে একেবারে থেঁৎলে দেবার মতন···ছি, ছি, কী লজ্জার কথা · তোমার বর মেরেছে বুঝি?' নাঃ বীণাদির বুক যেন হঠাৎ বিয়ের পর আরও বেড়ে গেছে। কি করে হলো?···অনেক ভেবেছিল নিশি। তারপর পিসি কোন মেলা থেকে ফিরে এই কাঁচুলিটা এনে দিয়েছিল—তখন সব বুঝতে পারে সে।··

বদলে দিল না। যেন অগোচর থেকে ধীর মৃদু পদসঞ্চারে সারা দেহমনের প্রান্তে প্রান্তে পৃথিবীতে নতুন ঋতুর আগমনের মতন—গভীর আলোড়ন হতে হতে এগিয়ে আসছে সর্বনাশা বন্যা। কল্লোলের ধ্বনি কানে আসে। আত্মসমর্পণের পথে ঠেলে দিতে ভয় নিজের সব কিছু, নিজের এই অলৌকিক উত্থানের পায়ে। আর সেই আত্মরহিত চেতনার বিপুল চাপে নিশি যন্ত্রের মতন বেশভূষা করতে থাকল। বেরোল যখন, বিনোদিনী তাকে পানের মশলা রাখতে গিয়ে একবারের জন্য থামল। মুখটা কিছু গাঢ় দেখাল তার। শুধু বলল, মেলার বাইরে-টাইরে যাস্‌নে বাছা। অমলিদের খুঁজে তাদের সঙ্গে বেড়াগে যা।

একটুখানি হইচই ওদিকে। সেই মেয়েগুলি বুঝি? এগিয়ে গিয়ে দেখল, দ্বিজু ঘোষাল তাদের ডাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওগো, মেলার রাখাল, কী হয়েছিল? কারা মুখ টিপে হাসছে। নিশি অনুমান করে নিয়েছে ততক্ষণে॥

ঠিক হয়েছে, ভালো হয়েছে! অত শুচিবায় যাদের, তাদের আবার মেলায় আসার সখ কেন?

নিশি পিছন ফিরে দেখল, জটাচুলো সেই ভৈরবীটা। হাতে ত্রিশূল আর কমণ্ডলু। গেরুয়া কাপড়। সিঁদুরের মোটা মোটা লাল রেখা সারা কপালে। পানও খায় সে। বিনোদিনীর সঙ্গে জমিয়ে নিয়েছে আজ।

মেলায় এরাও আসে। রাজ্যের সাধু-সন্নেসী, মুসলমান ফকির। আর একদল রুগ্ন ভিখিরী। তাদের কারুর সারা শরীরে ঘা, কারুর পা নেই, কেউ অন্ধ, কুঁজো,···কিছু কিছু অদ্ভুত বিকট গঠনের মানুষও দেখা যায়। ছোট্ট একটা বাড়তি হাতওয়ালা ভিখিরী বেশ কামাচ্ছে।

ধনা বলেছিল, দেখনদারীর জায়গা। ভালো দেখাও, মন্দ দেখাও।···

অমলা-কমলা ঢুবোন প্রহ্লাদের দোকানে। নিশি পাশ কাটিয়ে গেল। আজ বড় ভীড়। ভীড়ে জড়িয়ে যাবার ভয়ে সে একটু ফাঁকায় হাঁটতে থাকল। কেউ কি দেখছে তাকে?··এমনি কোন মেলায় বীণাদির হাত ধরে কে নাকি টেনে দিয়েছিল। মনে পড়ে ফিক করে হেসে ফেলল সে। কিন্তু ওকি? কাটাপোষাকের দোকান থেকে রোগাপটকা লোকটা একটা চোখ টিপছে বারবার তাকেই কি?···ঘামতে ঘামতে সরে গেল নিশি। বেশী ফাজলামী করলে গোবরাকে লেলিয়ে দেবে। মনে মনে উচ্চারণ করল সে। তারপর গোবরার হাতে কি দুর্দশা ঘটতে পারে কল্পনা করে ফের নিঃশব্দে হাসিতে মুখটা ভরে উঠল তার।

নিশি চলেছিল এলোমেলো। যেন সারাক্ষণ গোবরা তার সম্মানের পাহারায় কুকুরের মতন সঙ্গে সঙ্গে চলছে। অগোচরে নিশির মুখ উঁচু হয়ে গেল। পদক্ষেপে সাহস আর ঔদ্ধত্য ফুটতে থাকল। এবং তেমনি একটা নারীসুলভ-যুবতীসুলভ কমনীয়তা, তার প্রগলভতার ঋজু ও নিটোল প্রকাশখানি ঘিরে পাথরের চারপাশে জলের উচ্ছ্বাসের মতন ছলকে ছলকে পড়তে থাকল। এত সাহস, এত গরব, এত আনন্দ জীবনে বুঝি এই প্রথম।

আজ সার্কাস বা সিনেমা যাহোক কিছু দেখার ইচ্ছা ছিল। অমলা আর কমলা তাকে অবশ্যই খুঁজবে সময় হলে। কিন্তু নিশির মধ্যখানে এই অপরিমিত আলোড়ন অন্য কী প্রত্যাশা করছিল যেন। আর তীব্র কোন কিছু—এই মেলার

সকল উত্তেজনার চরম নিবৃত্তির বাইরে যদি কিছু থাকে। কী হতে পারে, সে জানে না। অথচ মনে হয় আগুনে ঝাঁপ দেবার মতন দারুণ আয়োজন এখনই চলেছে কোথাও।

ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা নেমেছে।

আলোর ভূষণ পরে শব্দময় বিরাট একটি হাস্যোজ্জ্বল মুখের ছবি এই মেলা এখন। ঘুরে ঘুরে এক সময় স্থিরভাবে দাঁড়াল নিশি। বাইরে এখানে-ওখানে মাঠের পথে, গ্রামের পথে, কাদের ঘরে ফেরার অস্ফুট কোলাহল কানে আসে। বাঁশীর সুর, শিশুদের হাসি—কচিৎ কোলে ওঠবার কান্না·

সেই বাচ্চাটা নাকি? চাষাভূষা মানুষ—স্বামী আর স্ত্রী, দুজনের পরনে নতুন কাপড়, স্বামীর চুল বেয়ে কপালে তেল ঝরছিল, মেয়েটির ভ্রূমধ্যে মোটা সিঁদুরের টিপ··হাত ধরে আছে হাঁটি-হাঁটি পা-পা বাচ্চা ছেলে, জাঙিয়াটা ভেজা, সস্তা ছিটের বেমানান জামা—নীচের দিকটা পেটে তাই গুঁজে দিয়েছে। দোকানে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় বারবার। আটকে রাখে দুজনে। আঙুল তুলে দাপায় আর কাঁদে।··কী কিনতে চাইছিল? অবোধ শিশু বুঝি মেলাশুদ্ধ কিনে দিলেও তুষ্ট হবে না। শুধু কাঁদবে। কারণ কী চায়, তা কি সে জানে? কান পেতে শুনল নিশি। কান্নার ধ্বনি অন্ধকারে দূর থেকে দূরে হারিয়ে যাচ্ছে, ক্ষীণ হতে ক্ষীণতম। তারপর শোনা যায় না।

আস্তে আস্তে একটা অব্যক্ত গভীর নির্জনতার মতন নিশির সেই আলোড়ন ফিরে ধরল ক্রমান্বয়ে। জলাশয়ের ওপর কুয়াশা যেমন আড়াল করে সব প্রতিফলন, তেমনি একটা ধূসরতা।

কী যেন করার ছিল, কী যেন পাবার ছিল, সকলই নিষ্ফল হয়ে ওঠে। ওই শিশুর মত কাঁদতে ইচ্ছে করে। কী কিনতে চায়, তা যে ছাই নিজেও বোঝেনা।

রাত ফুরিয়ে সকাল। সকাল থেকে বিকেল। আবার ব্যস্ততা প্রস্তুতির ক্ষিপ্রতা শিরায় শিরায়। কী হবে, কী হবে, উৎসব, দীপ্তি, আলোড়ন··নিশি সাজে। ঘুরে বেড়ায় বিহ্বল ভাবে। তারপর রাতের দিকে ফের সেই হতাশার ক্লান্তি। আবার ঘুম। সকাল, বিকেল, সন্ধ্যা, শেষ রাতে কখন ঘুম তাকে নামিয়ে দ্যায় ভাবনার পথে। রক্তলাল শাড়ি আর ব্লাউজ, উদ্ধত বুক, পানরঞ্জিত ঠোঁট, সাদা পাথরের কণ্ঠহার। নিশি ঘুরে বেড়ায়। গোবরার দেখা নেই।

ক'দিন পরে। মেলার অজস্র ভীড়ের মধ্যে এ এক আজব তামাসা।

মাটির ওপর নতুন বই বিছিয়ে বসে রয়েছে কে। কারবাইড ল্যাম্প জ্বলছে শোঁ শোঁ করে। সেদিনই এসেছে লোকটা। নিশি বসে পড়েছিল সেখানে। কতসব রঙীন বই, নামও সুন্দর। তন্ত্রমন্ত্রের বইও কম নেই। লোকে কিনছে তু'চারখানা। নিশির বই কেনবার সখ চেপে গেল। কয়েকখানার দাম জেনে পাতা উল্টেপাল্টে সে ফিরে গেল বিনোদিনির কাছে। বিনোদিনী তাকে দোকানে বসতে আর জেদ করে না। সে নিশির আচরণে অবাক হয়েছে, শুধু একটু ভয়ে তার গা ছমছম করে। হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে নিশি, বুঝতে পারছে, তবু অসহায় হয়ে পড়েছে যেন। সে রাতে গোবরার ঘরে নিশির উপস্থিতি বিনোদিনীকে নিশির সম্পর্কে কেমন আড়ষ্ট করে তুলেছে। তার ভয় হয়—নিশি গোবরার প্রতি আসক্ত, এবং সে নিশির আচরণে বাধা দিলে, গোবরাকে বলে তাকে অপমান করবে সে। এই অসহায়তার তুঃখে সে কাতর! মুখ ফুটে বলতে পারেনা। শুধু বলে, একটু গা বাঁচিয়ে চলাফেরা করিস বাছা।··· যেন নিজের অতীত জীবনকে সে নিশির মধ্যে আজ নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করছে— তন্ময়তার মধ্যে হারানো দিনকে সে প্রতিফলিত দেখছে ওই দর্পণে। তাই বাধা দিতে আলসেমি। যেন মনে মনে বলে আরও দেখি! তারপর গোবরার সঙ্গে দেখা হলে তাকে বলে, মেয়েটা আমার কথা শোনে না! আস্তে আস্তে হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। কাঁচা বয়স, মেলার বিপদ তো জানে না। তুই একটু লক্ষ্য রাখিস্ বাবা।

গোবরা বলে, রেখেছি। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই পিসি, এ মেলায় ওর যদি কিছু নষ্ট হয়—সে আমি বই অন্যের দ্বারা না। কাজেই ভয় পেয়ো না।

বিনোদিনী পরক্ষণেই ভাবে— কথাটা কেন বলতে গেল ওকে? আর গোবরা, তুই তো গঙ্গাজলে ধোওয়া মহাপুরুষ নোস্ রে পাষণ্ড! তোকেই বা বিশ্বাস কী?

নিশি ফিরলে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তখন বিনোদিনী তাকে নিরীক্ষণ করে। গোবরার কাছে অশুচি হয়ে এল না তো? বলে, অ-নিশি বাইরে ঘুরে এলি, শতেক জাতের ছোঁয়া লেগেছে, কাপড় বাইরে ছেড়ে আয়। নিশি ঠোঁট উল্টে বলে, হাঁ! ওই অন্ধকারে কাপড় ছাড়তে যাই, আর বাঘভালুকে মুখে তুলে নিয়ে গিয়ে পালাক। কি অসভ্য হয়ে উঠেছে মেয়েটা!

বিনোদিনীর ফেটে পড়তে ইচ্ছে করে। পারে না। ফের মরীয়া হয়ে গোবরাকে বলে, আমার বড্ড ভাবনা গোবর্ধন, ভালোয়-ভালোয় ওকে বাপের কাছে রেখে আসতে পারলে বাঁচি!

গোবরা চোখ ছানাবড়া করে। সেকি পিসি? মত বদলালে কেন?

না, পাপিষ্ঠের কিছু গোপন নেই। সে সব জানে। বিনোদিনী থেমে যায়।

গোবরা বলে, তুমি বুড়ো হয়েছ, ভালোমন্দ একটা ঘটলে, কে দ্যাখে?… এনেছ, ভালোই করেছ বরং থাক্ না। ঘরে গিয়েও তো বেচারার সুখ নেই। যা আন্দাজ করছি, সৎমায়ের সঙ্গে বয়সের ফারাক ওর বেশী হবে-টবে না। তাহলেই বুঝে দ্যাখো তুই সতানের মতন…

বিনোদিনীর খারাপ লাগে। বলে, মুখে যা আসছে, উগরে দিচ্ছিস মুখপোড়া ছেলে?

মুখ পুড়ে গেছে তাই। গোবরা নির্বিকার। পোড়া মুখে নোনতা কি, মিষ্টি কি সব সমান। তা শোনো পিসি, খাঁটি কথা বলি। তুমি আমাকে বড্ড মন্দ ভেবে বসে আছো। কিন্তু দ্যাখো পিসি, ভোগের মেয়েমানুষ অনেক পাওয়া যায়। তোমার ভাইঝির মতন রোগাপটকাতে আমার চোখ তেমন পড়ে না। তবে কী জানো?… ওর কী একটা আছে।…জোর করলে কারুর সাধ্য নেই ওকে বাঁচায়। কিন্তু জোর করে সেই জিনিসটি পাওয়া যাবে না! কারুরই পাওয়া যায় না!… একটু থেমে ফের বলে, হ্যাঁ, এই হচ্ছে খাঁটি কথা। ওর মধ্যে কী আছে যেন…আমি গোবরাহাড়ি, আমারও বড় ভয় করে, তুমি মায়ের মতন। তাই বলছি আমারও বড্ড ভয় করে… আমি হাত তুলে নিতে পারি কিন্তু পাছে ওটা ভেঙে যায়, হাল্কা কাঁচের খেলনা—আর দুষ্ট পাপীতাপী হাত… অনেক রক্ত লেগে আছে হাতে…

বলতে বলতে উঠে গিয়েছিল হঠাৎ। কী বলতে চাইছিল পারল না, সেই অক্ষমতায় পাষণ্ড খুনটার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল যেন।…

নিশি এসে বলল, পিসি আমাকে দুটো টাকা দেবে?

বিনোদিনী গম্ভীর মুখে জবাব দিল, গোবরার রোগ ধরেছে বুঝি? লোকের সুমুখে চেঁচিয়ে না চাইলে চলে না? আর এমন করে বলা হচ্ছে—যেন কোনদিন আমি কিছু দিইনি, দিই না…

নিশি অপমানিত বোধ করে নিঃশব্দে ভেতরে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ধুপ করে বসে পড়ল অন্ধকার বিছানায়। আস্তে আস্তে পিসির সঙ্গে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে—ধরা পড়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। পিসি তাকে আর শাসন করে না অকারণে। হাসি মুখে কথা বলে না। অথচ এমনটি তো সে চায়নি! ক'দিন ধরে যা কিছু করেছে, তার পিছনে ছিল ঐ একমাত্র আশ্রয়। যেমন করে রঙীন

ঘুড়ি আকাশে নির্ভয়ে বিচরণ করে—তার সুতোর মতন বিনোদিনীর অস্তিত্বকে সে ভেবে নিয়েছিল। এ মেলার আকাশে এমন হাওয়া খুবই শান্ত! আর একটা বাজপাখি মাথার ওপর ঘুরছে।

বাজপাখিটার প্রতি তার দৃকপাত নেই।···

মধ্যে মধ্যে অন্ধকারে মেলার নেপথ্যে মোহন ফিসফিস করে উঠেছে, মোহন, আমি নেবুতলার মোহন। আকাশের নীচে একটা ক্ষুধার্ত নেড়িকুত্তা মুখ তুলে তাকিয়ে আছে নিশির দিকে।

আঃ কী পান সেদিন খাওয়ালে নিশি, আমার সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছিল···

আজ পান খাবে না?

ভয় করে। আমার সবকিছু পুড়ে যাবে যাবে মনে হয়··

না, খাও। সাদা পান এনে দিই!

ফিরে এসে দ্যাখে মোহন নেই। একটা নেড়ীকুত্তার চোখ আলোর রেখায় মুহূর্তে জ্বলে সরে গেল অন্ধকারে। ওই সেই মোহন। আপদ, সঙ, ভিখারী!··· নিশি হাঁটুতে চিবুক রেখে বিষণ্ণ ভাবে বসে থাকল। ফিরে যাবে ভুবনপুর? কালই ভোরে সবার চোখের আড়ালে সেই বরং ভালো হবে। কিন্তু···

সেখানেও সেই একই বিষণ্ণতা। একই শূন্যতার সুর—দিন যায় রাত যায়, লক্ষ্যবিহীন নির্জন সময় যাপন। এখন টের পাচ্ছে, কেন সে পিসির সঙ্গে আসবার কথায় মুখোমুখি প্রতিবাদ জানায় নি। শুধু একটা অস্পষ্ট ভয়ের দুঃখে বাবার কাছে একবার মাত্র অসহায় মতটুকু প্রকাশ করে ফেলেছিল। লোচন অবশ্যই কথার কথা ধরে নিয়েছিল। ওটা নিতান্ত কথার কথাই বটে।

বিনোদিনী বাইরে থেকে বলছে, অ নিশি, খেয়ে নে। আমার দেরী হবে।

নিশি সাড়া দিয়ে বলল, ক্ষিদে নেই। পরে খাবো।

তারপরই বিনোদিনী ঘরে এসে ঢুকল ভিতরে। অন্ধকারে কেন? লম্ফ জ্বালিস নি? বলে তক্তপোষের নীচটা হাতড়ে লম্ফ বের করে নিয়ে গেল বাইরে। জ্বেলে এনে বলল, টাকার জন্য রাগ করেছিস না? অমন করে সবার সামনে চাইতে নেই। বয়স হয়েছে একটু বুদ্ধি করে চলবি তো? লোকে হ্যাংলা ভাববে। আবার মেলায় তো মতলববাজের অভাব নেই। ভাববে মেয়েটার টাকা চাওয়া খাঁকতি রয়েছে। তখন সে কী করবে জানিস। ওই সাবির মতন খুকু খুক করে হেসে ফেলল বিনোদিনী। তারপর একটা পাঁচ টাকার নোট হাতে গুঁজে দিল নিশির।

নিশি মুখ তুলে একটু হাসল মাত্র।

চলে গেল বিনোদিনী। টাট খালি রয়েছে। খদ্দের দাঁড়িয়ে আছে। আড্ডা দিচ্ছে চেনা মানুষেরা। নিশি টাকা রুমালে বাঁধল। নেবার ইচ্ছে ছিল না, অথচ পিসির রূপ অন্যরকম। না নিলেই খারাপ লাগে।

মুহূর্তে নিশির সব বদলে গেছে।

টাকা পাবার সঙ্গে সঙ্গে সে বিকেলের মত গরবিনী মুখ তুলে বেরিয়ে এল বাইরে। বইয়ের দোকানে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল একেবারে। কার সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে। নিশি গাল দিল, চোখের মাথা খেয়েছে নাকি?

না তুমিই খেয়েছো। নতুনফোটা চোখ কি না!

স্বয়ং গোবরা। ভ্রূভঙ্গী করে হাসছে। লোকের সুমুখে আড়ষ্ট হয়ে উঠল নিশি। ওরা ভাববে, গোবরা হাড়ির সঙ্গে এই মেয়েটার চেনা-জানা আছে তাহলে! লজ্জা, কী লজ্জা!

পিছন ফিরে চলে এল তক্ষুণি। ওখানে দুদণ্ড থাকলেও কথা বলতে ছাড়বে না।

গোবরাও আঠার-মতন এসে গেল পিছনে। বই কিনতে নাকি?

হুঁ।

দোকানের লোকগুলি হাঁ করে দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে। নিশি ফের ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল। রাগে ক্ষোভে সে লাল হয়ে গেছে একেবারে। হাত বাড়িয়ে লম্ফটা উস্কে দিতে যাচ্ছে, অমনি পর্দাটা সরে গেল। আপদটা ভিতরে ঢুকে পড়েছে যে! বাইরের লোকে দেখছে, বিনোদিনী দেখছে, গোবরাহাড়ি নিশিলতার গুহায় ঢুকে গেল। সেখানে সেজেগুজে নিশিলতা বসে রয়েছে।

কি করবে ভেবে না পেয়ে হাতের থাবায় লম্ফটা নিবিয়ে দিল সে।

গোবরা পর্দার এপাশে দাঁড়িয়ে আছে। একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে সে নিঃশব্দে চলে গেল।

আত্মসম্বিতহারা কাঠপুতুল নিশি কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল মনে নেই। হঠাৎ একসময় তার কানের পাশে ঠুক ঠুক শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। টিনের দেয়ালের ওপাশে কে মৃদু ঘা দিচ্ছে। শেয়াল কুকুর নয় তো? একটু ভয় পেয়ে সে জোরে থাপ্পড় মারল সেখানে।

বিনোদিনী বাইরে দোকানে বসে আছে। আসরের গানের সুর ভেসে আসছে। সে শুনতে পায় নি। নিবিষ্ট মনে গান শুনছে হয়তো।

থাপ্পড় খেয়ে চুপ করে গেল টোকার শব্দ। ক'মুহূর্ত পরে সেই ছোট্ট ফুটোয় মানুষের ফিসফিস কণ্ঠস্বর—নিশি, নিশি!

নিশি চেঁচিয়ে উঠল পিসি, ও পিসি !

বিনোদিনী ছুটে এল হুড়মুড় করে। কিরে, কী হয়েছে ? স্বপন দেখছিস ?

ডাকটা থেমে গেছে। নিশি হাঁসফাঁস করে বলল, কে আমার নাম ধরে ওখান থেকে ডাকছিল !

স্বপন দেখছিলি। বিনোদিনী অভিজ্ঞ মুখে বলল। খানিক বাইরে গিয়ে বোস। কবিগান হচ্ছে আসরে।

উঠে বসে লম্ফটা টানল নিশি। জ্বেলে দাও। খিদে পেয়েছে।

খাসনি ? বিনোদিনী অবাক। আমি যে তোর জন্যে ভাত বেড়ে রেখে গেলাম। তোকে জাগিয়ে দিয়ে গেলাম। উঠে বসলি···

কিছু মনে নেই। ঘুমের ঘোরে কী সব ঘটেছিল।

থালার ভাতে পিঁপড়ে গিজ গিজ করছে।

বিনোদিনী বেরিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। নিশির গা ছমছম করছিল। যেই হোক, সে মানুষ এবং তাকে ডেকেছে, এ কখনো মিথ্যা নয়। সেও বেরিয়ে এল। দোকানে পা ঝুলিয়ে বসল। শেষরাতের মেলা। আসরে কে সুর ধরে ছড়া কাটছে। চুপচাপ শুনছে অসংখ্য মানুষ। দোকানে দোকানে চলাফেরা, আড্ডা তবু কথাবার্তা খুবই কম। আলো অনুজ্জ্বল হয়ে আসে। আকাশে নক্ষত্রও মুছে এল। কাক ডাকছে বটগাছের পাতার ফাঁকে আবছা অন্ধকারে। আমবাগানে কোকিলের ডাকও শোনা যায়। হিমের স্পর্শ লাগে।

কে তার নাম ধরে ডাকছিল ? কেন ডাকছিল অমন করে ?

মৃদু ঢোলের শব্দ আসরে। কবিয়াল গান ধরল—

নদীর স্রোতের মত, কালের গতিতে আমার
হেলায় বেলা বহে যায় গো··।

সুরটা ভোরের শান্ত ধূসর আকাশের নীচে বিলাপের মতন ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে।

বিনোদিনী শালপাতার ঠোঙায় খাবার আনল এতক্ষণে। মুখ ধুয়ে খেয়ে নে। না খেয়ে খেয়ে কি কালীর গতর করছিস, আয়নায় দেখিস দিকি।

নিশি ভেতর থেকে জলের বালতিটা বের করে দোকানের পেছনে নিয়ে গেল। আর দেখলো, কে একজন অদূরে সামনের ঢিবির ওপর চলে যাচ্ছে। কাঁটাঝোপের মধ্যে যে শুঁড়ি পথটা মাঠের দিকে নেমে গেছে, সেই পথে।

স্পষ্ট চিনতে পারা যায়। মোহন, সেই লেবুতলার মোহন।

ও কি সারাটি রাত অমনি করে নিশি যেখানে শুয়ে থাকে, তারই ওপাশে

টিনের পাঁচিলের ওদিকটায় শুকনো ঘাসের ওপর শুয়ে থাকে? নৈলে কাগজে জড়ানো এই ইট দুটো ওখানে পড়ে থাকার কী মানে হয়? দেয়ালটা না থাকলে নিশির বালিশের পাশেই ওই হাস্যকর কঠিন বালিশটা দেখা যেত। কাগজে তেলের ছোপ। হাসতে গিয়ে হাসল না নিশি। ফের তাকাল। ভোরের লালচে আলোয় তার মূর্তিটা ঢিবির শীর্ষ থেকে হঠাৎ মুছে গেল। হতভাগা পুরুষ!

হয়তো মোহন তাকে কত নিবিড়ভাবে কল্পনায় ছুঁয়েছে, কত কুৎসিত দৃশ্য মনে মনে ভেবেছে। বেচারা! আজ হয়তো কল্পনায় তৃপ্তি না পেয়ে ডাক দিয়ে বসেছিল! কিন্তু কিছু দিতে তো পারে না তাকে নিশি। আজ থেকে যেন আরও পারবে না। না কথা, না হাসি, না পানের খিলি। যাকে দিতে পারা যায়, সে মোহন নয়। সে ভিন্ন মানুষ। সে কে তাও যে ছাই জানে না। অথচ মনে হয়, আসবে, ঠিকই আসবে একদিন। বীণাদির বরের মতন মুখে চন্দনের আল্পনা, চাঁপার গন্ধ গায়ে… এলে ঠিকই চিনে নেবে সে।

সকালে গোবরা এল। বেহায়ার হাসি মুখে। রাতের অপমানটা তাহলে গায়ে মাখেনি। এসে বলল, পিসি কোথায়?

নিশি মুখ নিচু করে বলল, নাইতে গেছে।

তুমি সঙ্গে গেলে না?

শরীর ভালো না।

মেয়েদের শরীর মধ্যে মধ্যে ভালো থাকে না, জানি।

নিশি চুপ করে থাকল। দুষ্টের মুখ, গলগল করে বমির মতন কুশ্রী কথা উগরে দেবে।

আবার রাগ হয়েছে দেখছি। গোবরা টাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসল। কেন? অপরাধ কী হয়েছে? যেন নাগর এলেন মানভঞ্জনে। কেষ্টযাত্রার কেষ্ট ঠাকুরটি।

নিশি আর চুপ করে থাকতে পারল না। কাজেকম্মো তো নেই, কেবল খুনখারাবি আর নাকডাকিয়ে ঘুম। আমাদের অনেক কাজ থাকে। খদ্দের সামলাতে হয়। বাজে কথায় কান দিলে চলে না।

গোবরা শিস কেটে বলল, আহা রে নতুন পানওয়ালী! পথ ধরেছে তাহলে। তাই অত সাজগোজের বাহার—

নিশি কাঁচিতে পানের বোঁটা কাটল কচ করে। হ্যাঁ, বেশ করি। তোমার কী?

গোবরা সকৌতুকে বলল, দেব নাকি সেদিনের মতো লোক লেলিয়ে? নিশিলতা পান!

মুহূর্তে নিশি ফেটে পড়ল। বেরোও, বেরোও বলছি এখান থেকে। খুনী গুণ্ডা ডাকাত কোথাকার! কী পেয়েছো তুমি?…

গোবরা দমল না। উচ্চকণ্ঠ হাসিতে সে ভাসিয়ে দিল নিশির ক্রুদ্ধ কথাগুলি। যে দেখতে মিষ্টি তার সবই মিষ্টি।

অত জাঁক দেখিও না। এখনও বল্লভ কাঁসারির লোক ঘুরছে পেছনে। বাগে পেলে দেখিয়ে দেবে মজাটা। আর মোহন, লেবুতলার মোহনও ঘুরছে ছুরিহাতে নিয়ে… একদমে কথাগুলি বলে নিশি হাঁপাতে থাকল।

তাই নাকি! জানি না তো! গোবরা হঠাৎ চুপসে গেল যেন। তার চোখ দুটি নিষ্পলক হয়ে উঠল। তারপর সে আস্তে আস্তে উঠল। ক'পা হেঁটে ফিরল, যখন ঝগড়া করবে আমার সঙ্গে, একটু আস্তে করো। ওই দ্যাখো, চারপাশে লোক হাঁ করে শুনছে। নিজের সম্মান নিজে রাখতে শেখো।

কথাগুলি বেশ গম্ভীর। নিশি আড়ষ্ট হয়ে পড়ল। তাইতো, সে ভেবে দেখল না—উত্তেজনার মুহূর্তে নিজের সম্মানকেই সে খুইয়ে বসেছে যে! কাল সন্ধ্যায় মান খোয়াবার ভয়ে গোবরার সঙ্গে লোকের সামনে কথা বলতে চায়নি।

কিন্তু মেলায় হুজুগ অন্যরকম। রটতে দেরী হলো না কিছু। ওইরে, গোবরার চোখ পড়েছে বিনোদ পানওয়ালীর ভাইঝির ওপর! নির্ঘাৎ কপাল ভেঙেছে মেয়েটার! ফিসফাস কানাকানি আরও প্রকট হলে দ্বিজু ঘোষাল এল সন্ধ্যায়। সর্বনাশ হয়েছে। গোবরা আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, বল্লভ কাঁসারির লোক নাকি ওকে খুন করার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায় সে? ও ঘটনার কথা আমি কেবল জানতাম। তোমাকে আমিই বলেছিলাম পিসি। গোবরা বলল, তোমার কাছে শুনেছে! ব্যাপার কি?

বিনোদিনী কিছু জানে না সকালের ঘটনা। কেবল কেউ কেউ ওকে চুপিচুপি ডেকে বলেছিল, তোমার ভাইঝিটাকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও। গোবরার চোখ পড়েছে ওর ওপর। সে মাথা নেড়েছিল মাত্র। দ্বিজু ঘোষালের কথা শুনে সে আঁতকে উঠল, আমি…আমি তো কোন কথা বলিনি বাবা!

নিশি সাজতে বসেছিল। অসমাপ্ত সাজে বেরিয়ে এসে বলল, আমি বলেছি। কেন, কী হয়েছে তাতে?

বিনোদিনী—আগের সময় হলে ঝাঁপিয়ে পড়ত ওর ওপর। কিন্তু হতবুদ্ধি হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল শুধু। কথা বলতে পারল না।

দ্বিজু ঘোষাল ফুঁসে উঠল, অসভ্যতা হচ্ছে? হতভাগা মেয়ে কোথাকার! নিজেরও সর্বনাশ করবে, আমাকেও জেল খাটাবে! কালই তুমি বাড়ি ফিরে যেও, নৈলে···

নিশি ফুঁসল, নৈলে কী করবে শুনি? তুলিয়ে দেবে জোর করে? বেশ তো দাও না দেখি, কেমন জোর!

বিনোদিনী জড়িয়ে ধরল এবার। নিশি, অ নিশি, চুপ চুপ, কাকে কি বলছিস যে হতচ্ছাড়ী মেয়ে।

দ্বিজু ঘোষাল কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। পাশের দোকানে কে মন্তব্য করল, বড্ড ঝগড়াটে মেয়ে রে বাবা! একেবারে ঝুমরী!

দেখলিনে, সকালে গোবরাকেই কেমন তেড়ে গিয়েছিল। ওর নাম বাবা গোবরা হাড়ি। নাকের জলে চোখের জলে করে দেবে একেবারে। এখনও চেনে না, তাই জাঁক!

বিনোদিনী ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সর্বনাশী মেয়ে, তুই আগুন জ্বেলে দিলি মেলায়! ছি ছি, আমি কেন তোকে এনেছিলাম এখানে? ভেতরে ঢুকে টিনের দেয়ালে মাথা ঠুকতে শুরু করেছে সে।

নিশি ধরল ছুটে গিয়ে। আদিখ্যেতা করো না বুড়ো বয়সে। আমার ভালোমন্দ আমি দেখবো।

খানিক পরে লিখিত নোটিশ নিয়ে পাগড়ীওলা পাইক হাজির। কালই মেলা ত্যাগ করতে হবে! মেলা কমিটির সেক্রেটারী স্বয়ং সই করেছে।

কাগজটা নিশির মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলল বিনোদিনী।

॥ দশ ॥

অদ্ভুত বশীকরণ তন্ত্র; কামাখ্যাতন্ত্র···ব্রজবিলাস···প্রভাসখণ্ড···প্রণয় প্রতিমা··· সচিত্র প্রেমপত্র···কোকশাস্ত্র—সুরথ উদ্ধার নাটক···অদ্ভুত রামায়ণ···

লিখতে পড়তে পারে তাহলে। পেন্সিলে সুন্দর করে নাম লিখেছে বইয়ের ওপর। ভেতরে যেখানে দুজন উড়ন্ত পরী একটা কাগজ ধরে আছে, সেখানে চোখ পড়তেই চমকাল। উপহার দিয়েছে!

তা ওসব বই কি হবে? আজকাল কত ভালো বই বেরিয়েছে। লাইব্রেরি

থেকে আনিয়ে পড়ে লোকে। ওইসব অদ্ভুত বই আবার পড়ে নাকি? আর ওই বশীকরণ?

বিশ্বাস নেই মোটে। তবু কি ধাঁধা—সত্যি হলে বেশ হতো কিন্তু। যাকে ভালো লাগল মন্ত্র আওড়ে মুহূর্তে কাছে আনা যেত। একালে ওসব হয় না নয়, কোনকালেই হয়নি। সব স্রেফ গুল। ওই ধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে ছটফট করো আর কি।

তাহলে কিনলে কেন?

ভালো লাগলো ভাবতে—সত্যি হলে বেশ হতো। কত সোজা হয়ে যেত সব জটিলতার গোলমাল। বইগুলো পড়ে নেশা ধরে যায় মনে। এই জীবনের বাইরে আরেকটা জীবন আছে মনে হয়। তার জন্যে মধ্যে মধ্যে পড়া ভালো।

এতদিন অন্যরকম মনে হত। সব বাজে, মেকী ব্যবসাদারী আর মুখোসের কারবার। পোষাকের নীচে যা আছে তাই সত্য। বাদ-বাকীটা নিতান্ত আয়োজন।

আজ মনে হলো কিছু হারাচ্ছিনা তো? মনে হওয়াটা অবশ্য হঠাৎ নয়। কদিন আগে এক সন্ধ্যায় মাঠে এর সূত্রপাত। আচ্ছা, এ বড় আশ্চর্য, তারিণী মুখুজ্জে মৃত্যুর আগে টের পেল ওর পথ চেয়ে বসে আছে পুত্র-কন্যারা। অথচ সারাজীবন ধরে টের পেল না সেটা! আর যেন সব মানুষের জন্যেই অমনি পথ চাওয়ার প্রতীক্ষার সময় রয়েছে; আমার তো নেই! কে বলবে, আমার সে এখনও ফিরল না কেন, না জানি কি বিপদ আপদ, সময় বড় খারাপ।

সেই প্রতীক্ষার মানুষটি কিন্তু খোলসটির দিকে তাকিয়ে নেই। খোলসে আমি খুনী, দেশসেবক, উকিল, মেলা-কমিটির সেক্রেটারী—উদো পাকড়াশী। কিন্তু অন্য—সেই অন্যটিকে নিজেই চিনিনে। এ দুঃখের শেষ নেই জীবনে। সেই প্রতীক্ষার মানুষটি শুধু চেনে তাকে। তাই তার পথ চাওয়া। তাই সে বলে—হলো কী? এখনও আসে না কেন? সময় বড় খারাপ···

একটা ঘরে কতদিন ধরে লুকিয়ে আছি। বন্ধ দরজা জানালা, কটু-গন্ধ বাতাস—বিষাক্ত দেওয়ালে হাজার সাপের ছবি আঁকা, রক্ত, কান্না, অপমান, অনুশোচনা। বেরোতে চেয়েছি বাইরে। কিন্তু কেউ তো নেই চারপাশে। শঙ্খচূড় নাকি যেখানে থাকে আশেপাশে কোন প্রাণী বাস করে না। ঘাস গজায় না। পাথুরে বন্ধ্যা মাটিতে বিষাক্ত বাতাস ঘুরপাক খায়।

তোমাকে দেখলাম—যে সাহস করে কাছে এল। দরজা জানালা খুলে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে। সব বিষাক্ত বাতাস বেরিয়ে গেল। তোমার মুখে তার ঝাপটা

পাগল। ঘৃণায় মুখ বিকৃত করলে তুমি। মুখে বললে, মেয়েমানুষকে ভয় দেখাচ্ছি। তবু হয়তো তাকিয়ে দেখলে একবার, এই ওর ঘর, এই ওর আশ্রয়।

আমি হাল্কা হয়ে গেলাম।

তবু তোমার কাছে পৌঁছোতে পারিনে। আমার ঘরের দেয়ালে ওই রক্ত কান্না বিষ। পাপের অহঙ্কার। আমার হাতে মানুষের রক্ত।

হাতের রক্ত মুছবার নয়। জীবনকে টেনে ছুঁড়ে ফেলা যায় না। ফেললে আমার কি রইল। আমার সঙ্গে ওই মোহনটার কোন ফারাক থাকে না।

মোমবাতিটা আচমকা দপ্‌ করে নিবে গেল। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো ছলকে এল সঙ্গে সঙ্গে। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে নিশি বলল, আসি তাহলে।

যাবে?

হ্যাঁ। উপায় কি? ভোরে চলে যাচ্ছি। বাবাকে খবর পাঠিয়েছে পিসি। ভুবনপুরের লোক এসেছিল।

কেন যাবে?

তোমার মতন জোরতো নেই। মেয়েমানুষ। থাকবার মুখ আছে নাকি আর?

কেন? কলঙ্ক হবে? বিয়ে হবে না?

কলঙ্ক? তা হতে বাকী আছে নাকি?

তুমি কলঙ্ককে ভয় করো বলে মনে হয় না। নৈলে এমন করে বারবার এখানে আসতে না।

তুমি গণক ঠাকুর!

হ্যাঁ। আচ্ছা নিশি, কলঙ্ক কি ক্ষতি করতে পারে? তুমি মেলার মানুষ— তোমার পিসির অনেক কলঙ্ক ছিল। কে কি ক্ষতি করতে পেরেছে তার?

একটুখানি চুপ করে থাকল নিশি। বাইরে দূরে অস্পষ্ট কোলাহল মেলায়। তারপর বলল, তুমি ভেবেছো, আমিও পিসির মতন সারাজীবন মেলায় কাটিয়ে বুড়ি হয়ে যাবো?

আশ্চর্য নয়।

ওকথা মিথ্যে। আমি অকালেই চলে যাবো।

বইগুলো নেবেনা?

নাঃ।

গোবরা দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। অন্ধকারে মিটিমিটি হাসছে। সাবিত্রীর ঘটনাটাও তাকে খুলে বলেছে। চলে যাবার আগে সবকিছু যেন

জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চিন্তে ঘুমোতে বারণ করেছে। যেন ঘরের মাগ—বাপের বাড়ি যাবার মুখে···খিস্তিটা স্মরণ করেছে গোবরা ; বলতে পারেনি তবু।

জানালায় বিনোদিনীর মূর্তি। ফিসফিস করে ডাকছে, গোবরা অ গোবর্ধন ?

কি হলো পিসি ? গোবরা উঠে গেল।

নিশি আছে এখানে ?

আছে।

ছি, ছি, কি লজ্জার কথা। বিনোদিনী ককিয়ে উঠল। জাতকুল কিছু রাখলিনে হতচ্ছাড়ী !

নিশি গর্জাল সঙ্গে সঙ্গে—চুপ করো, মুখে কুষ্ঠ হবে। আমি এসেছি নিজের কাজে।

বিনোদিনী স্তম্ভিত আর হতাশ। আস্তে আস্তে ফিরে গেল। একদিন অমনি করে নন্দ সরকারের কাছে সেও এসে বসে থাকত। অমনি সব জ্যোৎস্নার রাত। এমনি কেলেঙ্কারীর রটনা। ঠিক এমনি বোকাপড়ার পালা সবার চোখের আড়ালে।

তখন এই ঘরগুলিতেই নন্দ সরকারের আপিস ছিল।

গোবরা বলেছিল, সুন্দর পবিত্র মহান যা কিছু তা তার চক্ষুশূল। হিংস্রহাতে আঁচড়ে কামড়ে আঘাত না করে থাকতে পারে না। সে বলেছিল—এই মেলায় সুন্দরী মেয়েরা যখন হেঁটে যায়, উজ্জ্বল রঙীন শাড়ির ঝলকানিতে ঢাকা দেহের দোলা, নিটোলতার নানান স্তরে ছলকে পড়া বয়সের গরব—সে নির্লজ্জ চোখে তাকিয়ে দ্যাখে। তার এ তাকিয়ে থাকায় লোভ থাকে না—থাকে হিংসা।

আজ যেন সে অন্যরকম ভাবে। কদিন আগে নিশি রক্তলাল বসনখানি পরে সারা মেলা ঘুরে বেড়িয়েছে, সে তাকে ঠিক মোহনের মতনই অনুসরণ করেছে। পুরনো চোখ দিয়ে দেখতে গিয়ে চোখে যেন ছানি পড়ে গেছে হঠাৎ। অদ্ভুত, ও খুবই অদ্ভুত, গোবরা হাড়ির বুক ভয়ে ত্রুরুত্রুরু কম্পমান। নিশির পেছনফেরা দেহের গরব—গরব শুধু নয়, চোখ রাঙিয়ে শাসন করে : সাবধান, পবিত্রতা নষ্ট করো না। ও যেন যৌবনের দেহের অধিক—যৌবন নিজে। সে ভ্রূভঙ্গী করে ছুঁয়োনা, এ পাপের ভোগ নয়।

তবে কি পুণ্যের ? দেবতার ?···হিংস্র গোবরা।

লোভে আক্রোশে ছুটে গেছে বারবার বিনোদিনীর দোকানে। আর নিশির

মুখোমুখি পৌঁছে কী.একটা হয়ে গেছে তার। তখন সেই অদ্ভুত রঙীন তুলতুলে রাঙতামোড়া খেলনার মতন জিনিসটার কথা ভেবেছে—ছুঁলে বুঝি তুমড়ে যাবে। জীবনে অনেক জিনিষ এমনি করে তুমড়ে দিয়েছে। এখানে কিন্তু হাত কাঁপে।

হয়তো এ তার পাপী জীবনের আফশোষ ঃ গোবরা এইখানে তোর হার।

কি জানি তবু ভাবতে ভালো লাগে। আশা করে না—শুধু ভাবে। যেমন ভাবে, ওই বশীকরণ সত্যি হলে বেশ হতো কিন্তু!

নিশি বলেছিল, মন্ত্র দিয়ে মেয়ে ভুলোতে চাও? তোমার তো ওইরকম ক্ষমতার অভাব নেই। তোমার হাতে রক্ত—সেও এক বশীকরণ।

তাতে সুখ নেই ওর। সুখী হলে আর এমন ঘোরাঘুরি কেন পেছনে? কুকুরের মত অনুসরণ?

খবর পেয়ে সকালে ধনা গাড়োয়ান ঠিকই হাজির হয়েছিল। লোচন আসতে পারেনি। ছাদ কংক্রিট হচ্ছে। সিমেন্ট আনতে যাবে আজ। কানকাটি বৌটা সংসার গুছিয়ে নিয়েছে। ফিরে গিয়ে বাড়ি দেখলে তাক লেগে যাবে। ঝকঝকে তকতকে রান্নাঘর—খিড়কির ঘাট। ঘাটের জঙ্গল ঘাসের বন একেবারে পরিস্কার। তবে ইট চুন-সুরকী উঠোনে জড়ো আছে। ঘর শেষ হতে দেরী! পুরনো মাটির ঘরখানিতে ঢুকলে কিন্তু এই গরমের দুপুরে মনে হয় খালি মেজেয় কাত হয়ে ঘুমোই।

ধনা বলেছিল, এতক্ষণ নিশির জন্যে ঘরবাহির করছে বৌদি। খিড়কির পুকুরে জলে নামবে। মাছের ঝোল খাবে গিয়ে।

নিশি বলেছিল, থাক্। তুমি ফিরে গিয়ে মাছের ঝোল খেও।

কেন, কেন?

আমরা যাচ্ছিনে। সব মিটমাট হয়ে গেছে বাবাকে বলো।

বিনোদিনী ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। এই কদিনের ঘোরপ্যাচে মাথায় ঝিম ধরে গেছে। চিন্তাশক্তিও হারিয়েছে যেন।

সেই সময় আকাশ খুবই মেঘলা ছিল। তারপর ছিঁটে ফোঁটা বৃষ্টি। ধনা আস্তে আস্তে মাথা চুলকে ফিরে গেল গাড়ী জুতে নিয়ে। গোবরা বসে বসে পান চিবুচ্ছে।…তাহলে যা ভুবনপুর অব্দি রটেছে, নিতান্ত ফেলনা নয়। ভাইঝি পিসির সখই ধরল!

বিকেলে বৃষ্টি আরও জোর নেমেছিল। গোবরা তখন ঘুপটি ঘরের ভেতর নিশির পায়ের কাছে বসে। কিন্তু জল গড়াচ্ছে মাটিতে। বিছানাপত্র সব কিছু দুজনে টিনের বড় বাকসোর ওপর রাখল। ভিজতে ভিজতে খানকয় ইট এনে দিল

গোবরা বটতলার ওদিক থেকে। ইটগুলো বাকসোর নীচে দিল। ফ্যাকাসে ঘাসে ছপ্ ছপ্ জল। বৃষ্টির ফোঁটা চড়বড় করে টিনের ছাদে টিনের দেয়ালে গড়াচ্ছে। মাথার ওপর ফুটো দিয়ে জল ঝরছে টিপ টিপ করে! মাথা বাঁচিয়ে বাকসোটার ওপর উঠে বসেছে নিশি। গোবরার দুর্দশা দেখে সে বলল, ভিজতে ভিজতে তোমার ঘরে চলে যাও বরং। গা মুছে শুয়ে পড়গে!

গোবরা মুখটিপে হেসে চলে গেল।

বিনোদিনী দোকানে ঝাঁপের সঙ্গে ত্রিপলটা মেলে দিয়েছিল অবস্থা দেখে। গোবরা চলে গেলে সে ঝাঁপটা ফেলে দিল। দোকানে স্বল্পপরিসর জায়গায় খাঁচার পাখির মতন জবুথবু হয়ে বসে রইল সে। ভীমরতি ধরে গেল এতদিনে। ঝিমুনি চাপে।

কিন্তু কি কুহরামো জানে নিশি! পাষণ্ডটাকে পা-চাটা কুকুর করে ফেলেছে একেবারে। এই অহঙ্কারে সে এখন দিবানিশা বাছে না। গুমোর ভাঙলে তখন এসো কাঁদতে পিসির কাছে। মাথাটা কাদায় রগড়ে দোব একেবারে। ও লজ্জা মলেও ঘোচে না—দ্বিজু ঘোষালকে গোবরা হাড়ি সোজাসুজি জানিয়ে দিল —মেলাশুদ্ধ লোক শুনল: ওরা আমার লোক। ওদের ভালোমন্দের জিম্মা আমার হাতে! নোটিশটা ছিঁড়ে ফেলে দিল সে। আর দ্বিজু ঘোষাল ক্ষুব্ধ মুখে সরে গেল অন্যখানে। এতদিন বিনোদিনীর সঙ্গে তার একটা সুন্দর সম্পর্ক ছিল। বিনোদিনীর যত কেলেঙ্কারীই থাক, তা এত অধঃপতনের নয়—লোকে তাকে এমন চোখে ঘৃণা করেনি। তাছাড়া এমনি করে প্রকাশ্যে তো কিছু করেনি সে!...আজ শুধু দ্বিজু ঘোষাল নয়, সব চেনা অচেনা লোকের সঙ্গে তার পুরোনো মধুর সম্পর্কের যোগসূত্রটা ছিঁড়ে গেল। এখন সে বাজারের মাসি—বিনোদ পিসি নয়।

তবু প্রতিরোধের ক্ষমতা নেই। স্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছে সে। হা ঈশ্বর, আর কতদূর নিয়ে যাবে এমনি করে! অসহায় বিনোদিনী চোখের জল মুছল—যেন নিজের কাছে কান্না লুকাতে চায়।

সন্ধ্যার পর বৃষ্টি কমল। তাই মেলা আজ জমল না! অল্প কিছু লোক—অনেকেই মাতাল। শিশু ও মেয়েরা কেউ আসেনি। সার্কাসের তাঁবুতে বাঘ ডাকছে থেকে থেকে। দোকানপাট আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। পরিব্যাপ্ত অন্ধকারে ডুবে থাকল রানীচকের মেলা।

মেজেয় বিছানা পাতা যাবে না। শোবে কোথায়? নিশি বলল—পিসি, শোব কোথায় আজ?

বিনোদিনী মনে মনে বলল, তোর তো ঘর রয়েছে। মন্দিরের ওদিকে গেলেই পারিস। দেবতার ঘরে নরকের আগুন জ্বালা গিয়ে। মুখে স্তব্ধ থাকল। তারপর তক্তাপোষের ওপর কাঠের থাকগুলো সরাতে থাকল। পানের গামলা আর পেতলের বড় থালাটা ভেতরে এনে রাখল বাকসের ওপর।

নিশি খুশীমুখে বলল, বাঃ, আজ রাজশয্যা।

সে রাজশয্যা সমানে চলেছে দুদিন ধরে। নিশি সুখে ঘুমোয়। ঘুমের ঘোরে পিসির গলা জড়ায়। পিসি ছাড়িয়ে দ্যায়।

বৃষ্টি টিপটিপ ঝির ঝির সারাবেলা। কিছুক্ষণ থামে, ফের শুরু হয়। আকাশ চলমান মেঘে ঢাকা। কখনো হাওয়ার শিরশিরানি। যে শীত মুছে গিয়েছিল একেবারে, বৃষ্টির আর্দ্রতায় একটু করে ফুটল। রাতের দিকে তার ঠাণ্ডা থাবা জনহীন নিঃঝুম মেলাটাকে ঠেসে ধরে।

অকালবর্ষণ মেলার ভাগ্যে থাকেই। তবে এবার শিবরাত্রে ফাঁকা গেছে। দোলপূর্ণিমা এদিকে এসে পড়ল। দোলের দুটি দিন অব্দি এর জোর চললে বড় ত্রাসের কথা। ওই দুটি দিন একটাকা পুঁজির পসারওয়ালাও পাঁচটি টাকা কামিয়ে নেয়। দূর দূরান্তের লোক আসে রানীচকে। সেখানে শ্যামচাঁদের পূজো হয় ঘটা করে। সেই সুবাদে রুদ্রদেবের মেলায় একবার ঘুরে যাওয়া। কেনাকাটা ফূর্তি।

কিন্তু মেলাখেলায় মেঘ-বৃষ্টি সত্যই ত্রাসের কারণ।

অজ পাড়াগাঁয়ের স্বল্পবিত্ত মানুষ এই মেলার মরশুমেই বছরের রোজগার কামিয়ে নেয়। এই তার আশা আর বিশ্বাসের উৎস। ওদিকে সার্কাস-ম্যাজিক-সিনেমা-ভ্যারাইটি শো—তাদের অবস্থা আরও কঠিন। হাতি ঘোড়া বাঘ ভাল্লুক রয়েছে—একদঙ্গল করে মানুষ রয়েছে, দিনে পাঁচশো হাজার টাকা খরচই লেগে যায়। একদিন একবেলা শো বন্ধ থাকলে প্রোপাইটার প্যান্ট কোট ছেড়ে লুঙ্গি পরে গালের আকামানো দাড়িতে হাত বুলোয়।

দুর্ভাগ্যটা বয়ে আনল প্রোফেসর সামন্ত।

দেরী করে তাঁবু পাতল আমবাগানের পাশের চটানে। জায়গাটাও খাপছাড়া, মেলার সঙ্গে সংযোগ কম। তবু তার অনেক আশা। রানীচকের নাম শুনে নতুন পাড়ি জমিয়েছে। সঙ্গে লোকজন খুবই কম। লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, যে প্যান্টকোটটি পরে থাকে, ওইটিই শেষ। টাই পরলে ছেঁড়া ডগাটাও চোখে পড়ে। প্যান্টের পকেটে হাত পুরে মেলায় ঘুরঘুর করল প্রথম

বৃষ্টির বিকেলে। তারপর পালাতে বাধ্য হলো। সব ভিজে যাবার তালে! তবু বিরাম নেই আনাগোনার। বৃষ্টি থামলে এসে দোকানে-দোকানে আড্ডা জমিয়ে যায়। যেচে ভাব করে। খোঁজ খবর নেয় হাজার রকম। গোবরার কথা শুনে একবার আলাপ করেও এসেছে। খুব জমে গেছে নাকি। কে বলছিল এই বৃষ্টির মধ্যে গোবরার ঘরে বসে দুটিতে তাস খেলছে।

বিনোদিনী শুনতে পেয়ে মন্তব্য করেছিল, তাস নয় জুয়ো। ফেলাস্, ফেলাস্। যে যেমন, তার জুটি তেমন। সন্ধ্যার দিকে গোবরা এসে বলল, নিশি, এক মজার লোক পেয়ে গেছি, মাইরি। শালা ওস্তাদ লোক! তাসের হাত যা দেখালে, থ বনে যাবে। দুচারটে শিখে নিয়েছি।

নিশি বলল, বেশতো। যখন রক্তের জোর যাবে কমে ওই করে খাবে।

গোবরা হাতের ভঙ্গীতে গেলাস ধরা দেখিয়ে বলল, ওদিকেও সাগর। বোতল-বোতল গেলে খচ্চরটা।

আর তুমি? তুমি বুঝি নদী?

গোবরা ঠাণ্ডা চোখে তাকাল। এইরকম তাকালে তার খাঁটি কথাটি বলার আয়োজন টের পাওয়া যায়। সে বলল, আগে আমিও সাগর ছিলাম। একবার কে মদের সঙ্গে কি খাইয়েছিল—খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। তা, পাপীতাপী লোকের ওপর দয়া করার লোক অনেক আছে, নামটা বলেই ফেলি. মহাদেব ঠাকুরকে চেনো তো? ওই বুড়ো রানীচক থেকে রিকশো ডেকে এনে চাপাল আমাকে। কাঁচা রাস্তায় রিকশো চলা কঠিন—তখন পেছনে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল হাসপাতাল। শেষে সিঙ্গি মশাইরাও খোঁজখবর নিলেন. ডাক্তার বলল, আর দুএক গ্লাস খেলেই, ব্যাস্!

একটু থেমে ফের বলল, প্রতিজ্ঞা করিনি। তবে খেতে ভয় করে। যদি নিজের হাতে চোলাই করি, তবেই খাবো, নৈলে নয়।

নিশি বলল, যদি বিশ্বাসী লোকে খাওয়ায়?

গোবরা হাসলো—বিশ্বাসী? সে কে? তুমি নও তো?

নিশি বলল, আমার চৌদ্দপুরুষে মদ কী দ্যাখেনি। বাবা কোন নেশার ধার ধারে না।

আমি কাকেও বিশ্বাস করিনে নিশি।

তবে যে এখানে সেখানে নেমতন্ন খাও?

গোবরা এককুচি সুপুরি মুখে ফেলে দিয়ে বলল, খাই। তবে সবার হাতে নয়। এ মেলার মধ্যে এক খাই পিসির কাছে আর খাই ফজল চাচার কাছে।

চাচা জানে, গোবরা মলে তাকেও পাকিস্তানে পালাতে হবে। ওর ওপর অনেক ঝামেলা—সে কন্দবখন। আটকে রেখেছি বানের মুখে বাঁধ দিয়ে বুঝেছ? এতদিন পরে হঠাৎ আজ নিশি প্রশ্ন করে বসল, অন্যসময় খাও কোথায়? নাকি বাতাস খেয়ে থাকো?

খাওয়া? গোবরা একটু চোখ বুজে থেকে বলল, বলবো? কাকেও বলে দেবে না তো?

বলে কি লাভ?

বল্লভ কাঁসারিকে খবর দেবে—অনেক টাকা পেয়ে যাবে।

নিশি ক্ষুব্ধভাবে বলল, আমি না হয় টাকার লোভে তাই করব, কিন্তু যার কাছে খাচ্ছো সেই বা কেমন—টাকার লোভে বিষ দেবে তাতে?

আমি নিজের হাতে রান্না করতে পারিনে নিশি। অনেক চেষ্টা করেছি। তাই বাধ্য হয়ে অমন করে খেতে হয়। অথচ প্রতিবার খেতে বসে বুক কেঁপে ওঠে। তোমাকে লুকোব না—সে এক বিশ্রী জ্বালা। যতক্ষণ না হজম হয়, শুধু গা ছমছম ভয়···বলতে বলতে গোবরা হঠাৎ থেমে গেল। ওই দ্যাখো, নিজের কান্না কাঁদতে শিখে ফেলেছি মনে হচ্ছে। ধেৎ, তুমি যেন কী···

বাইরে এমন কজলচাচা আর পিসি নিশ্চয় আছে? নিশি প্রশ্ন করল।

আছে। সংসারে সব মানুষ আমাকে ঘেন্না করে না। ভালোও বাসে। কারণ তারা জানে, আমি তাদের ক্ষতি করবোনা—উপকারই করবো।···কিন্তু এত খোঁজখবর কেন?

সেই লোকটি কে, তা তো বললে না?

মহাদেব ঠাকুর—আবার কে? ব্যাটা ভগবানের অবতার, পাপীর উদ্ধার করার মতলব ছাড়া কিছু নয়।

নিশি একটু স্তব্ধ থাকার পর বলল—আমাকে বিশ্বাস করো?

কী জানি!

আজ থেকে এখানেই খেও। আমার দিব্যি···নিশি মুহূর্তে পেছন ফিরে ভেতরে ঢুকে গেল। গোবরা চুপ করে বসে থাকল। কোন জবাব দিল না। এতক্ষণে বিনোদিনী ফিরল চায়ের কেটলী আর শালপাতার ঠোঙা হাতে। গোবরাকে দেখে কোন কথা বলল না সে। ডাকল, নিশি, আজ এই দিয়েই রাতটুকু কাটা বাছা। এ জলকাদায় আর উনুন ধরিয়ে কাজ নেই।

নিশি ভেতর থেকে বলল, বিষ্টি ছেড়েছে। উনুন জ্বেলে দিচ্ছি আমি।

বিনোদিনী কাঠের থাক থেকে চায়ের কাপ পাড়ল। তারপর চা ঢেলে বলল, নে রে ভাইপো, তুইও খানিক নে। তিনজনে ভাগ করে খাই।

গুমোট মুখে নিঃশব্দে চাটুকু খেয়ে গোবরা চলে গেল। নিশি ডেকে বলল, ঘন্টাটাক পরে এসো। আলুভাতে আর ডালসেদ্ধ করছি। নাকি ডিম খাবে?

বিনোদিনী একটু চমকে উঠেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়েছে।

কিন্তু রাত ভারী হয়ে আসে, বৃষ্টি আবার পড়তে থাকে টিপ টিপ ঝির ঝির, মেলার দোকানে আলো ঢেকে যায় ঝাঁপের আড়ালে—তবু গোবরার আসবার নাম নেই।

নিশি বেরোল।

হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে মাথায় গামছা জড়িয়ে সন্তর্পণে প্যাচপেচে কাদায় পা ফেলছিল সে। পিছল হয়ে আছে প্রাঙ্গণটা। টাল সামলে নিচ্ছিল অন্ধকারে চলতে। হেরিকেনটা কি ভেবে সঙ্গে নেয়নি। প্রথমে সেই মন্দিরের ঘর। তারপর একেবারে আমবাগানের প্রান্তে প্রোফেসর সামন্তর ছোট্ট তাঁবুর দরজায়। একটু ইতস্তত করে সে পর্দা ঠেলল। ভেতর থেকে ভারী গলায় কে বলল—কে রে?

প্রোফেসর সামন্ত। টর্চের থাবা নিশির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। নিশি চোখে হাত ঢাকল। দূর থেকে দেখলে কাকেও নিজের তুলনায় ছোট কি বড়ো আন্দাজ করা কঠিন। কাছে এলে হাড়ে হাড়ে বোঝা যায়! এই ম্যাজিকঅলা সামন্ত কাল বিকেলে যখন বৃষ্টির মধ্যে ছোটাছুটি করছিল, নিশি তার শরীরের বিশালতা-মোটেও টের পায়নি। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে এখন অনুভব করল, সামনে একটা পাহাড় তার দিকে অন্ধকার মুখ নিয়ে তাকিয়ে আছে।

বগলের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে, তক্তপোষের কোণে একটা প্রকাণ্ড থালায় ভাত, ছটাকখানেক নুন, দুটো ডিমসেদ্ধ। খবরের কাগজ বিছিয়ে দিয়েছে থালাটার নীচে। সামন্ত সবে খেতে বসছিল বুঝি। এখন আচমকা তাঁবুর ভেতর মেয়েমানুষ দেখে ভাত ফেলে হুড়মুড় করে দাঁড়িয়েছে।

বয়স আরও কম হলে কিংবা ভুবনপুরের জীবনে—নিশি মুহূর্তে চেঁচিয়ে ছুটে পালাত। মুখোমুখি জ্যান্ত রাক্ষস দেখার ধৈর্য তার ছিল না।

মেয়েদের একটা অন্যরকম চোখ রয়েছে। সে চোখে জন্তু-মানুষের ফারাকটা অনুমান করে। পুরুষের চাউনি; বাকভঙ্গিমা, সকলই বাছাই করে নিতে জানে। অন্তত নিশি তো জানেই। সে সাবিত্রী নয়।

সেই চোখে সামন্তর ভাত ফেলে ছুটে আস., স্তব্ধতা, বৃষ্টির রাতে আম-বাগানের নির্জন প্রান্তদেশ, মুহূর্তে দেখে নিয়ে সে জেনেছে ভয়ের কারণ নেই।

মেলা বলেই এসব ভাবতে হয়। পিসির কাছে মেয়ে মানুষের জীবনে মেলা কত রকম বিশ্রী নিষ্ঠুর তুঃসহ ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি করে ক্ষণে ক্ষণে, নিশির পা বাড়ানোর একটা গুপ্ত সতর্কতা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। হয়তো এমনি কোন অসহায়তার মধ্যে গোবরার অবলম্বনটা সে আঁকড়ে ধরেছে ক্রমশ, নিশি জানতে চেষ্টা করে না, তা নয়। তাই বলে বসে, ও তো আমার কুকুর। চু চু করে ডাকলে পায়ের তলে এসে লেজ নাড়বে।

কাকে চাই? স্বর নয় ঢাকের বোল—এঁ্যা? কি চাই বলুন? আস্তে আস্তে পিছিয়ে গেল প্রোফেসর সামন্ত। তারপর টেবিলের ওপর হেরিকেনের দম বাড়িয়ে দিল।

যেন ম্যাজিক দেখানোর ভঙ্গীটা। নিশি বলল, কিছু না। এমনি।

এমনি? সামন্তর প্রকাণ্ড মুখখানা হাসিতে ফেটে পড়ার তালে। পরক্ষণে হাসি সামলে নিয়ে ফের বলল, ম্যাডামকে আমি দেখেছি মনে হচ্ছে মেলায়। বলুন খুলে বলুন, আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি? ঝুঁকে ভেজা হাত সেলামের ভঙ্গীতে নাচাল। আই অ্যাম অলওয়েজ্ এ্যাট ইওর সার্ভিস!

গাজনের সঙ! যে গন্ধ ছুটছে, মদ গিলেছে পিপেটাক। তবে যা বোঝা যাচ্ছে, লোকটার মনে কুটিলতা নেই। নিশি মজা টের পেয়ে বলল, আপনি ম্যাজিক দ্যাখান বুঝি?

ইয়েস! সামন্ত পিছিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে টুপি আর একটা ছোট্ট হাড় ছোঁ মেরে তুলে নিল।—এই যে হাড়টা দেখছেন, এটা বনমানুষের হাড়। বলবেন, তুচ্ছ হাড়—তাতে মানুষের নয়, বন মানুষের। এর কি ক্ষমতা রয়েছে? চাপা স্বরে ভ্রূ নাচিয়ে সামন্ত বলল, আছে, আছে। এই তুচ্ছ জিনিসটা অসাধ্য সাধন করে। যদি শুনতে চান, শুনিয়ে দোব। দেখতে চান, দেখিয়ে দোব। বটে···কিন্তু কানে শোনার চেয়ে দেখায় বিশ্বাস বেশী! কানে শুনে বিশ্বাস করে যে সে বোকা। চোখে দেখে যে বিশ্বাস করে, সে··সে কী?

নিশি ফিক করে হেসে উঠল!

হাসবেন না। হাসবার কথা নয়। বলুন, সে কী? বলুন?

বুদ্ধিমান।

রাইট ইউ আর। সে বুদ্ধিমান। ম্যাজিক লাঠিটা নাচাতে নাচাতে একটু পিছিয়ে ফের এগিয়ে এল সামন্ত। বাট আই মাস্ট সে, সেও বোকা।

কেন ?

চোখেও ভুল দ্যাখে। মানুষ চোখে যত ঠকে, অন্য কিছুতে নয়। আর এইখানেই এই হাড়ের যত কারচুপী। ম্যাডাম, আপনি নিশ্চয় রেল লাইন দেখেছেন ?

হ্যা। নিশি কচি খুকীর মতন টেনে উচ্চারণ করে ঘাড় নাড়ল।

আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, দূরের দিকে তাকালে লাইন দুটো মিশে গেছে দেখা যায় ?

হুঁ।

কিন্তু যারা রেলগাড়ি চেপে শেষ অব্দি গেছে, তারা জানে দুটো লাইন কোথাও মেশেনি।

নিশি সপ্রশংস দৃষ্টিতে বলল, হ্যাঁ, হ্যা।

প্রফেসর সামন্ত উৎসাহে যেন মেতে উঠল। হেয়ার ইউ আর। আমরা সেই রেলগাড়ীর লোক। আমরা জানি সব মিথ্যা, পেটটাই সত্য। পেটের জন্যেই দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, পেটের জন্যই এই রানীচকের মেলা। পেটের জন্যই এ ঝড়বাদলের মধ্যে তাঁবু গেড়ে বসে রয়েছি··· (ফের পায়চারী করে হঠাৎ ঘুরে) হাড়টার কথায় ফিরে যাই। বলেছিলাম যে এই হাড় অসাধ্য সাধন করে। চোখে ইন্দ্রজালের কাজল পরায়। এখন লক্ষ্য করুন এটা···

এগিয়ে এসে নিশির কাঁধ ধরে নাড়া দিল। হ্যা, অমনি সোজা হয়ে দাঁড়ান। উঁহু হুঁ, একদম সোজা হয়ে দাঁড়ান। হ্যাঁ, ঠিক আছে···ব্যস্, এবার তাকান এর দিকে। পলক ফেলবেন না···না, না, ভয়ের কিছু নেই···তাকান, তাকান··· মাষ্টার বুধনের ছাত্র প্রফেসর এইচ সামন্তর হাতের মুঠোয় এখন সারা দুনিয়া। যা বলি তাই করে, তাই বলে,···উর্ র্ র্ র্···লাগ, ভেল্কী তুক্ তাক্···ফুঁ···উ··· উ বশীকরণ ফু···উ···লাগ···লাগ···লাগ···লাগ···লাগ···লাগ···লাগ···

আচমকা নিশি পেছন ফিরে পর্দা তুলে হুমড়ী খেয়ে টলতে টলতে দৌড় দিল। এদিকটায় মেলার মদমত্ত লোকজনের চলাচল কম, তাই ঘাসগুলি অক্ষত আছে। নৈলে আছাড় খেয়ে হাড়গোড় ভেঙে যেত।

পেছনে যাদুকর ছুটে আসছে কিনা দু'একবার ত্রস্তে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে দেখতে একেবারে মেলার গেট পেরিয়ে এসে থামল সে। হাঁফাচ্ছিল নিশি !

কিন্তু হতচ্ছাড়াটা গেল কোথায় ? নিশির ক্ষিদে পেয়েছে। তবু খেতে কেমন লাগে। যেন সাতপাকের স্বামী, অগ্নিসাক্ষী করা বর-পুরুষ, ঝাঁটা মার ওর মুখে। কদিন আগে একটা নিরীহ নির্দোষ ভালোমানুষকে অমন নিষ্ঠুর

ভাবে খুন করে এল, মানুষটা মরণ-যন্ত্রণায় জল চাইলে, তার মুখে···করে দিলে ! নরকেই জায়গা হবে ওর ?··· আর তার জন্য এই নিশুতিরাতে বৃষ্টিকাদায় নিশি ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে !

ভুবনপুরে নিশির বাবা লোচনের একটা সখের কুকুর ছিল। তার নাম ভুলু। ভুলু কম জ্বালাতন করত না। পুকুরপাড়ে ছুটোছুটি করে হাঁস তাড়া করত, দুলে পাড়ার মুরগী কামড়ে নিয়ে আসত। পথে ভেড়ার পাল দেখলে রক্ষে নেই। লাফিয়ে মধ্যে ঢুকে কাঁধে লেজে পিঠে খামচা-খামচি। আর ভেড়াগুলোর দশা দেখে হাসতে হাসতে প্রাণ যায় এদিকে।···সেই ভুলু মধ্যে মধ্যে উধাও হয়ে গেলে লোচন সুর ধরে ডাকত। একহাতে এঁটো থালায় একদলা ভাত, অন্য হাতটা মুখের কাছে চোঙ বানানো···ভুলু··উ ভুলু···উ ! কিন্তু যত দোষই থাক, একেবারে পায়ের চাকর, লেজ নাড়া একান্ত অনুগত, রাত-দুপুরে কেউ ত্রিসীমানায় এলে যেন দেয়াল ফুঁড়ে দৃষ্টি গেছে, ঘেউ ঘেউ করে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে ! পাঁচিলের ওপর মাধবীলতার ঝাড় ছিল। তার ওপব রক্তজবার গাছটায় অনেক কষ্টে ফুল ফুটত। পটের দেবতাব পায়ের কাছে জবা ফুল রেখে রোজ সকাল সন্ধ্যা প্রণাম করত। ছোকরা পুরুত নবা পাণ্ডার রাজ্যের জবায় খাঁকতি মেটে না, তার লোভ নিশিদের গাছেই। প্রথম প্রথম দুচারটে দিয়েছিল নিশি। শেষে একেবারে না করে দিল। তখন নবা পাঁচিলেব মাধবীলতা সাপটে ধরে একদিন চুপিচুপি পাঁচিলে উঠতে যাচ্ছে, পরণে খাটো পট্টবস্ত্র, একহাতে পেতলের ফুলের সাজি, কোষায় গঙ্গাজল, মাটিতে রাখলে পাপ হবে, তাই সেটাও সাবধানে ধরে আছে, সর্ সর্ সর্ শব্দ হতেই ভুলু এক লাফে পাঁচিলের ওপর। তারপর নবা···

উঃ মাগো ! পেটে খিল ধরে গেল হাসিতে। নিশি তলপেট চেপে ধরে, কুঁজো হতে হতে, সামলে নিল। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে ফের। বটগাছেব পাতায় পাতায় বাতাস শনশন করে উঠছে। সর সর করে জল ছলকে পড়ছে পাতা থেকে। জুয়াড়ীরা যেন গর্তে ঢুকে গেছে। সন্ন্যাসী ভিখিরী, ফকির, বিকলাঙ্গ আর সেই ভৈরবী, সামন্তর যাদুর ভেল্কীতে কোথায় অদৃশ্য। যাদু-টুপীর ভেতর থেকে পিলপিল করে একদিন হয়তো বেরিয়ে আসবে ফের।

পায়ে ছেঁড়া মাদুর ঠেকল। কি অন্ধকার বটতলাটা ! মড়ার মাথা মনে করে মুহূর্তকাল গা ঝাঁকাল। তারপর ফিরে এল নিশি।

হঠাৎ তার মোহনের কথা মনে পড়ল। এই বৃষ্টির রাতেও সে অমন করে আসে নাকি তাকে আড়াল থেকে দেখতে ? সে মুরোদ নেই। পিসি একটা

গল্প বলে : খেজুর তলায় শুয়ে আছে লোকটা, গোঁফের ওপর পাকা খেজুর পড়েছে। পাশ দিয়ে কে যাচ্ছে সেই সময়। তাকে ডেকে বলছে, খেজুরটা মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে যাও তো। স্বপ্নের খাওয়া খেয়েই জীবন কাটাও তুমি। মোহনের মেলায় আসা গল্পটাও মনে পড়ল নিশির। তাই মনে মনে বলল, স্বপ্নেই খেয়ে পেট ভরিয়ে নাও। হতভাগা কোথাকার! তোমার জন্য নিশি জন্মায়নি। লোচন বলত, একটা লোক স্বপ্নে মুড়ি খেয়েছে বলে আনন্দে গল্প জুড়েছে। তাকে কে বলেছিল, তোর মতো বোকা নেইরে গর্দভ, যখন স্বপ্নেই খাচ্ছিস তখন দুটো রসগোল্লা খেলিনি কেন?···স্বপ্নের খাওয়ায় মানুষের হয়তো হাত নেই। কিন্তু মোহন স্বপ্নে কী খায়, নিশি টের পেয়ে গেছে সেদিন। মা গো কি লজ্জার কথা, একেবারে পাশে টিনের পাতলা পর্দা মাত্র মধ্যিখানে। মাথায় ইটের বালিশ দিয়ে শুয়ে ছিল সারারাত। মাথার চুল লাল হবে, মাথায় ব্যথা হবে, তাই বুদ্ধি করে কাগজও জড়িয়েছে। স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া করে শুয়ে নাকি মধ্যিখানে পাশবালিশটা রেখে দ্যায়। বীণাদির গল্প এটা—বীণাদি, তুমিও শোও বুঝি?···মধ্যে মধ্যে শুতে হয়। ভালো লাগে।·তারপর?···তারপর শেষরাতে···আর বলেনি! বীণাদি নিশির এসব কেলেঙ্কারী শুনলে কী ভাববে কে জানে?···যা ভাবে, ভাবুক। বীণাদির বর আছে। সে তার সঙ্গে চোর পুলিশ খেলে। নিশির নেই, তবু নিশির খেলতে সাধ।···

অন্যমনস্কভাবে নিশি প্রহ্লাদের দোকানের সামনে এসে পড়েছিল। ঝাঁপের ফাঁকে আলো দেখা যাচ্ছে। অস্ফুট কথাবার্তার শব্দ ভেতরে। ওখানে গোবরা নেই তো?

আলোর ফাটলে চোখ রেখে দেখল, প্রহ্লাদ পা ছড়িয়ে বসে রয়েছে। তার সেই ছোকরা কর্মচারী দুটো ফর্দ মেলাচ্ছে আর কি জিগ্যেস করছে তাকে। হ্যাসাকটা শোঁ শোঁ করে জ্বলছে। আলো ঝলমল করছে। প্রহ্লাদের চারপাশে অসংখ্য জিনিসপত্র। সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বলতা, সবচেয়ে বেশী রঙ, সবার সেরা সৌন্দর্য, ঝিকমিক করছে। উচ্ছল উচ্ছ্বসিত মুখের সমুদ্র একটা—আর তার মধ্যিখানে দ্বীপের মত শান্ত সবুজ চোখে বসে আছে প্রহ্লাদ। সে যেন সাবিত্রীর মতন কোন স্বপ্নছবি দেখে মগ্ন। শুধু রূপ আর রূপ, অনন্ত অপরূপ শ্রীময়তার একটি ছোট্ট অংশ তার হাতের নাগালে এসে পড়েছে। সে মানুষের সব প্রয়োজনের বাইরে দাঁড়িয়ে তার সম্পদকে দেখছে।···বস্তুত নিশি নিজে হলে যা ভাবত, বুঝত, তাই ভাবছিল প্রহ্লাদের জন্য। নিশি যেন এ মুহূর্তে সাবিত্রীকেও বুঝতে পারছিল। বিনোদিনীকে—এমনকি নিজেকেও।

শুধু রূপ, রূপ নিয়ে মগ্নতা। রূপকে আঁকড়ে বেঁচে থাকা জীবনে। এই মেলা কোলাহল আনন্দ সকলই ওর রূপের আলোকিত রেখায় ধরা আছে। আর তার ছায়ার নীচে অস্বস্তি, কান্না, সর্বস্বান্তের বিলাপ, পাপের হাত, রক্ত। তাই গোবরার জন্য মধ্যরাতে বৃষ্টিতে আবৃত জ্যোৎস্নার আবছায়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন করে। তাই হয়তো মনে হয়—একজনকে খেতে বলেছিল, সে এল না তাই নিজেরও মুখে অন্ন ওঠেনা। সে যেই হোক, খুনী হোক, পাপী হোক, সে একজন যার খেতে আসবার কথা ছিল, এল না।…

বিনোদিনী বলে, রূপ, রূপেই আমার সব গেছে। এই রূপের টানে তোর সব যাবে নিশি। এখন সামলে নে। কি সামলাবে সে? এক রূপ ছেড়ে আরেক রূপে চলে যাবে? সে যাওয়া কি সহজ কথা? ভৈরবী বলেছিল—সে কি সহজ কথা? যাকে শিব বলি, তাকে শ্যামচাঁদ বলা কি মুখের গ্রাস? আমি ভজি শিব—তুমি চাও শ্যামচাঁদ। নানারকম চাওয়া নানান রূপ। যা হয় একটা খুঁজে নাও। কিন্তু পগার ডিঙিয়ে লাফ মেরোনা। হাড়গোড় ভেঙে যাবে। তারপর কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল, আসল কথা কি জান দিদি? আমরা আপন আপন মনের মানুষটি খুঁজে পাই ভগবানের এক-এক রকম রূপের মধ্যে। ওইটি সার—বাদবাকী অসার। মনে রেখো কথাটা।…

নিশি এসব গুহ্যকথা বোঝেনা। সে শুধু বুঝতে পারে, বাইরের রঙ দিয়ে হাসিকান্না খেলার ঘটা পড়ে গেছে। সে তাই হাসে, কাঁদে, খেলা করে।

প্রহ্লাদ বলছে, বুঝলি তপু, আর রাজনীতি করব না রে। মেলায় মেলায় এমনি করে ঘুরব। বেশ লাগে।

নিশি সরে এল। ঝাঁপের ফাঁকে শুয়ারের মত ঠোঁট দুটো গোল করে এগোচ্ছে। থুথু ফেলবে।

কিন্তু গেল কোন চুলোয়?

ফজল মিয়ার দোকানে স্তব্ধতা। কেবল একটা বিড়বিড় কণ্ঠস্বর। গোবরা ওখানে থাকতে পারে। চাচার সঙ্গে খাতির অন্যরকম। কি একটা বিপদের বন্যা রুখে সে দাঁড়িয়ে আছে বলছিল।

ফাঁকে চোখ রেখে দেখল—হাঁটু ভাঁজ করে বসে নামাজ পড়ছে ফজল চাচা। মাথায় সাদা টুপি। হাতে কালো পাথরের মালা। জপ করছে বুঝি। নিশি আশ্চর্য হয়ে গেল। ফজল বুড়ো বিড়বিড় করে কি মন্ত্র বলছে আর তার চোখের জল চুইয়ে দাড়ি ভিজে যাচ্ছে।

কেন কাঁদছে ও? গোবরা বলেছিল, চাচার দুই বিবি। দুপক্ষে ডজনটাক

ছেলেমেয়ে। বড়বিবি তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে দাদার সঙ্গে পাকিস্তানে চলে গেছে। সতীনের সঙ্গে বনিবনা নেই। ছোটবিবি গোবরাকে দেখা দেয়, লজ্জা করে না। তবে বয়স যা, তাতে চাচার মেয়ে বলে ভুল হবে। কিন্তু কি পাকা মেয়ে। ওখানে নাবালক ছেলে দিয়ে কাপড়ের দোকান চালাচ্ছে। কর্মচারীরা ভয়ে তটস্থ। ফজলু রেফুজি ব্যবসায়ীদের পাশেই দোকান পেতেছে। পাকিস্তানের ওপর রাগটা এ বেচারার ওপর ঝাড়বার মতলব। কিন্তু ভালমন্দ লোকের অভাব সংসারে নেই। স্থানীয় হিন্দুরা রেফুজিদের ওপর চটা। কারণ কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে ব্যবসায় সতীনপনা করবে এটা সওয়া যায় না। তবে কি জানো, পলিটিকসে খেলে দেশটাকে। পলিটিকসের মার আজকাল বড় মার। চাচা একখানা ঘর ছেড়ে দিলে, নে, তোরা এখানে আপিস কর পার্টির। তাতেও রক্ষে নেই। দলাদলি। লুকোচুরি। চাচার আপনপ্রাণ বাঁচা তখন···বেচারা শ্যাম রাখে, না কুল রাখে! কংগ্রেস-কম্যুনিষ্ট-হিন্দু মহাসভা· মাইরি, ইচ্ছে করে দিই একটা করে ভোজালির রামকোপ্···এ দল বলে, চাচা চাঁদা দাও, ওরা বলে চাচা চাঁদা দাও··· দাও দাও রব—তাতে পুজোপার্বণে তো কথা নেই। বাচ্চা ছেলে এসে বলে, চাচা, সরস্বতী পুজোর চাঁদা দশ টাকা দাও···নৈলে ··নৈলে কী ?·· ওপারে পাঠিয়ে দেব। দ্যাখো কাণ্ডটা, কেমন সব শেখানো হচ্ছে কচিকাঁচাগুলোকে।··· তবে আমার নাম গোবরা হাড়ি। কাজে যতটুকুই করি না কেন, নামের ডাকে পিলে চমকায়। কাকেও একবার শালা বললে, রটে যায়—গোবরা হাড়ি ওই বাবুকে আজ জুতোপেটা করেছে। কেউ বলে, মাইরি চোখের দিব্যি, শালাকে দেখলাম মন্ত্রীর গাড়িতে পাশাপাশি চেপে বসল ··বোঝ ঠ্যালা! তা—আমি এতে খুব খুশী। কারণ, যত বেশী মহিমা রটে, দেবতার ওপর ভয় ভক্তিও ঘটা করে বাড়ে। তাই রটিতে দিই জোরসে—চালাও বাবা, যত পারো আর বুঝেছ নিশি ? মধ্যে মধ্যে শুধু নিদম্মা রটিতে দিলেই তো চলে না। দুএকটা নজীরও দিতে হয় লোকের চোখের সামনে। মোক্ষম নজীর। গায়ের জোরে হয়তো টিকবোনা—তাই দিলাম ভোজালি ঝেড়ে···আর এমন লোককে দিলাম, যার শত্রু বেশ গুণীলোক, মহাপুরুষ বলে খ্যাতি আছে সমাজে। ব্যাস, কাজ সেরে সামনে গেলাম···কোল দিন স্যার, আপনার মান রাখতে পেরেছি মাত্র! কোল দেবে না—তোর বাবা দেবে, নরকস্থ চোদ্দ পুরুষ হাত বাড়াবে—আয় রে চাঁদ আয় না, গড়িয়ে দোব গয়না···

বিনোদিনী বলে, আজকাল বড্ড কথা বলছে ছোঁড়াটা। এমন তো বলত

না আগে। নিশি মুখ টিপে হাসে। বলে, আমাকে শোনায়, বুঝেছ? মনে করে শুনে টুনে ওর সেবাদাসী হয়ে যাই ভয় পেয়ে।

বড় বিবিকে মনে পড়ে কাঁদে কজ্জলচাচা! ওর খোদার কাছে বুঝি কিছু কামনা জানিয়ে কাঁদে?···মনটা নরম হয়ে গেল নিশির।

এই তেলেভাজার ছোট দোকানটার মধ্যে আড্ডা দেয় গোবরা। নিশি সচ্ছিদ্র ত্রিপলের পর্দায় চোখ রেখে দেখল—ঠাণ্ডা উনোনের গায়ে বড়ো একটা লোহার কড়াই অবহেলা করে রাখা আছে। উনোনভরা সাদা ছাই। কাঠের প্রকাণ্ড থালায় দুএক টুকরো তেলেভাজার অংশবিশেষ। কালোকুচ্ছিত কিছু হাতা ছাঁকনি—বিশৃঙ্খল ভাবে ছড়ানো আর সেই সবের মধ্যে একটা লোক মাদুরে চিত হয়ে শুয়ে আছে। গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জী। দুটো হাত মাথার ওপর ভাঁজ করা। তার একটা পা তৈলাক্ত কড়াইয়ের উপর দিয়ে উনোনের গায়ে ঠেকেছে। সে ঘুমোচ্ছেনা—কারণ একটা পা অনবরত নাচাচ্ছে। চোখ দুটি বোজা। গভীর চিন্তায় মগ্ন বলে মনে হয়।

দৃশ্যটা এত খারাপ লাগল নিশির। উনোনে পা তুলে দিয়ে কি ভাবনায় বুঁদ হয়ে গেছে সে। বৃস্টির কথা, নাকি স্ত্রী পুত্র পরিজনের কথা, এই নিষ্ফল মেলার রাতে তাকে সবকিছু অবহেলা করে ভাবতে হয়!

পাশের ছোট্ট মনোহারী দোকানে টুকরো আলাপ।

হেরিকেনের সুমুখে ঝুঁকে বসে আছে কমবয়সী ছেলে। পরনে হাফপ্যান্ট, খালি গা। খাতায় কি লিখছে। ওই লোকটা বুঝি বাবা। ফর্দ দেখে কি বলছে। লেখো, চুড়ি পাঁচ ডজন, হেয়ারক্লিপ দুপাতা, সেফটিপিন—

বেশ মজা লাগে দেখতে। ছেলেটি পেট চুলকোচ্ছে বারবার। হাই তুলছে। হয়েছে?

একুনে?

উঁ?

ইস্কুলে শেখায় না? একুনে মানে যোগ। যোগ করো। বৃস্টির রাতের মেলায় যোগের অঙ্ক কষছে তাহলে। নিশি সরে আসতে আসতে অস্ফুট হাসির শব্দ শুনল। ছেলেটি হাসছে। কেন হাসল, জানতে ইচ্ছে করে।

বাসনের দোকানে কাতরানির শব্দ। সেই বুড়োটার বাত বুঝি বেড়েছে ঠাণ্ডার রাতে। তিনজনে মালিশ করছে। নিশি শুনল, কালই আমাকে গাড়ি করে রেখে আয় নৃসিংহ, এ পাপিষ্ঠ জায়গায় মরে যাবোরে।

এক-একটি ঘরে এক একরকম দৃশ্য। কিন্তু ও মহাদেব ঠাকুরের ওখানে নেই

তো? না, নিশি কোনদিনই ওখানে যেতে পারবে না। সে ফিরল সঙ্গে সঙ্গে। মহাদেব ঠাকুরের উপদেশ শুনে ঠাণ্ডার রাতে মন ভারী করে লাভ নেই।

বাইরে থেকে মনে হয়, সব স্তব্ধ, সব অন্ধকার। অথচ মধ্যরাত্রের বৃষ্টিময় নির্জন মেলার নেপথ্য জগতে একটা করে অদ্ভুত দৃশ্য চলেছে। কেউ ঘুমিয়ে নেই। সবাই একটি করে কামনাবাসনার দীপ জেলে বসে আছে।

ক্লান্ত নিশি যেন সেই বাসনার নিশি-ডাকে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল অচেতন বিহ্বলতায়। এতক্ষণে জেগে গেল। কেন সে বৃষ্টিতে ভিজছে, কাদায় পিছল পথে টলে টলে একটা গুণ্ডাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে?···কেন শুধু মনে হয়—একজনকে খেতে বলেছিল, সে এসে খেল না?

ক্ষোভে দুঃখে অপমানবোধে নিশির চোখে জল এসে গেল। সে আস্তে আস্তে ঝাঁপ তুলে ঢুকল। বিনোদিনী জেগে ছিল। বলল, খুঁজে পেলি?

নিশির ইচ্ছা করছিল—বিনোদিনী তাকে অপমানে অস্থির করুক। লাথি মারুক আগের মতন। চুল টেনে অশ্লীল গাল দিয়ে বলুক, বেশ্যা, তোর মরণ হয় না! অথচ একি বলল সে? এমন করে কেন বলে উঠল?

গভীর ঘৃণার জমাটপিণ্ডে বসে বিনোদিনী যেন শুধু মুখ ফেরাল অন্যদিকে। খুঁজে পেলি? আমি কি আমার বরকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম, না পীরিতের নাগরকে, জীবনমরণের সাথীকে?···খুঁজে পেলি? পিসি তার হৃদপিণ্ডের ভেতরে একটা নখ বসিয়ে দিল। বিনোদিনী বৃষ্টি বাতাসের মতন কোন একটা প্রত্যক্ষ বস্তুর ওপর পলকে চোখ বুলিয়ে অক্লেশে যেন বলে দিল, ওটা হচ্ছে এই। অন্য কিছু না।

ভেঙ্গে পড়ল নিশি। দুহাতে বিনোদিনীর পা দুখানি ধরে মাথা ঠুকতে লাগল, পিসি, পিসি, আমাকে তুমি বিষ খাইয়ে মেরে ফ্যালো···কেন আমার মরণ হয় না।

বিনোদিনী চুপ করে আছে। একদিন সেও অমনি করে কেঁদেছিল মাথা ঠুকে। সেদিন কেউ সাক্ষী ছিল না সে কান্নার। আজ একটা দর্পণ সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিবিম্ব সুন্দর ফুটছে সেখানে।

॥ এগার ॥

কদিন বৃষ্টির পর প্রসন্ন রোদের দিন। তিল তিল করে মুহূর্তে-মুহূর্তে যেন নরকের ছায়া জমে উঠেছিল এতদিন ধরে। বৃষ্টি মেঘের আকাশের নীচে মানুষের ত্রাস-দুঃখময় বাসনা-কামনার আবর্জনার সামনেটা আড়াল করছিল ক্রমাগত। সকলই ক্ষয় পেল উজ্জ্বল চৈত্রের রোদে। গাছের পাতার রঙ গাঢ় দেখাল। দলিত ঘাসের বুকে লাবণ্য ফিরে এল। বৃষ্টি ধোওয়া মেলার জগত পবিত্র তীর্থের মন্দিরচূড়ার মতন আবার স্বপ্নসঞ্চারী অলৌকিক হয়ে ভেসে উঠল নীল আকাশের নীচে।

নরম মাটির পথে চাকার দাগ এঁকে ধনা গাড়োয়ান গাড়ি এনেছে আবার।

সঙ্গে লোচন এসেছে। ঘরদোর শেষ। ঠাকুরঘরও তৈরী। শ্যামচাঁদ প্রতিষ্ঠার দিন এসে গেছে দোলপূর্ণিমার সকালে। বিনোদিনীকে নিয়ে যাবে। নিশি ?

তার ইচ্ছে। লোচন বসল বেঞ্চে। ইচ্ছে হলে যাবে, নয়তো যাবে না। মুখটা বেশ গম্ভীর তার। নিশির কীর্তি ভুবনপুরে পৌঁছে গেছে। ধনাও কিছু বলেছে।

নিশি হঠাৎ এসে বাপের পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেছে দীঘির ঘাটে। শুধু বলেছে, মাকে আনলে না যে। লোচন কথা বলেনি। মুখ ফিরিয়ে মেলার দোকান দেখেছে শুধু।

বিনোদিনী বলল, হ্যাঁ রে লোচন, এযে বড় সমস্যা। তখন ভেবেছিলাম, দোকানে ঝাঁপ ফেলে কাকেও দেখতে বলে চলে যাবো একদিনের জন্যে। এখন দেখছি, কাকে বলে যাই !

লোচন একটু বিস্মিত হলো। কেন, তোমার আবার লোকের অভাব ! গোমস্তামশাইকে বললেই তো হবে। দেবে দুজন পাইক বসিয়ে ! বিনোদিনী বেজার মুখে মাথা নাড়ল। তারপর একটু ঝুঁকে চাপা গলায় হাত নেড়ে বলল—সব্বাই শত্তুর হয়ে গেল। বুঝলি লোচন, কেউ আর হেসে কথা বলে না !

লোচন নড়ে বসল। কেন!

জীবনে এমন কথা সে পানওয়ালী বিনোদিনীর কাছে শুনবে আশা করেনি। সারা পৃথিবী তার দিদির আপন বই পর নয়, সবখানে চেনা-জানা—ফরমাস করতে দেরী, হনুমানের মতন বিশল্যকরণী আনতে বললে আস্ত গন্ধমাদন তুলে আনে! আর একি কথা আজ! আসলে ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে, রটনা শুনে সে বুঝতে পারে নি মোটে। ধনা হাবা মানুষ। একরকম হয়েছে, হয়তো অন্যরকম বলেছে তাকে। গুছিয়ে না বলার দোষ যেমন তার—তেমনি নিশির রকম দেখে ভয়ও কম নয়। তাছাড়া গোবরা হাড়ি রয়েছে—মেলায় ধনাকে যে আসতে হবেই, সে তো জানা কথা। তার ওই বলদ দুটি বিনোদিনীর টাকায় কেনা। আর লোচন ইদানীং দিদির দু'পয়সা হাতে পাওয়াতে—চাইলে হাসিমুখে ফেরে না। ধনার মুশকিল কম নয়। লোচন শুনেছে—নিশি গোবরা হাড়ির সঙ্গে মেতে গেছে! লোকজন মানে না—লাজলজ্জার মাথা খেয়েছে। দুটিতে নাকি হাত ধরাধরি করে মেলায় ঘোরে, সিনেমা দ্যাখে। দোকানে এসে আড্ডা মারে অষ্টপ্রহর। বিনোদিনী ভয়ে কিছু বলতে পারে না।

শুনেটুনে প্রথমে ক্ষেপে উঠেছিল সে! ঘরে নতুন বৌ। সেও শুনছে সংমেয়ের কীর্তি। হয়তো লুকিয়ে হাসছে। তাই মানসম্মান রক্ষার জন্য লোচন ভেবেছিল তখনই ছুটে এসে মেয়ের চুলের মুঠি ধরে মারতে মারতে বাড়ি নিয়ে আসবে। কিন্তু পরে ঝিমিয়ে পড়েছিল সে। বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল!... উঠোনের ওদিকে কানকাটা বৌটা ঘোমটা টেনে ঝাড়ু দিচ্ছে। মাটির ঢিবিতে তুলসীগাছ রোপণ করছে। রাঙামাটির লেপনের ওপর লক্ষ্মীর পায়ের চিহ্ন, পদ্মফুল, ধানের শীষ, পাখি আঁকছে। পুরনো ময়লা হাড়জিরজিরে কাঁথার ওপর থান কাপড়ের ঢাকনা সেলাই করে কোণে লাল সুতোর নক্‌সা আঁকছে—ভুলোনা। আর ঠিক মাথার কাছে দেয়ালে খড়ি গুলে লিখেছে—শ্রীচরণেষু।

এই মেয়েটি হঠাৎ কোত্থেকে এসে লোচনের জীবনের চারপাশে ছায়াময় উদ্যান রচনা করে বসল এতদিনে। আহা, এত ছায়া, এত আরাম পৃথিবীতে থাকতে আছে। নগ্ন শূন্য প্রান্তরের ওপর ধীরে ধীরে পা ফেলছিল লোচন যখন কড়া রোদে পায়ের নীচে নিজের ছায়াটিও লুকিয়ে পড়ে। তখন ফিক করে হেসে লোচন বলেছিল, ও হরি, এই জন্যেই লোকে বেঁচে আছে তাহলে!

কিন্তু নিশি শুনলে কী ভাববে। আচমকা ধুড়মুড় করে ঘুম থেকে উঠে একা করে বসল সে। ওই কানকাটা বিধবা মেয়েটি ছাইডোলের গম নিয়ে ফিরছিল—পথে হঠাৎ দেখা মুখোমুখি। একটু হেসেছিল সে। ব্যস! কি

হয়ে গেল লোচনের। নিশি চলে যাবার পর যেন অগাধ জলে হাত পা ছোড়াছুড়ি করছিল। হঠাৎ উদ্ধারের মতন এই হাসি ভেসে এল কাছে। কেন হেসেছিল, তা লোচন কোনদিনও জানবে না। সে বীণার মায়ের কাছে অনেক কষ্টে কথাটা পেড়েছিল। মেয়েটা এ্যাদ্দিন ছিল—বুঝতে পারিনি। দিদি তাকে জন্মের মতন কেড়ে নিয়ে গেল—হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। কি আর বলবো, বলো। বাপের কর্তব্য যা, তা কি করলাম কোনদিনও? কত সাধ ছিল তোমার বীণার সঙ্গে পাশ করে বেরোবে। বীণার হঠাৎ বিয়ে দিলে, মেয়েও বেঁকে বসল ইস্কুলে যাবে না। ওদের দুটিতে অভেদাত্মা ছিল, বুঝলে দিদি।...আমিও আর জোর করলাম না। থাক্। পাস দিয়ে কি চাকরী করবি! ছোট জাতের মেয়ে, বিয়ে হবে যেখানে, সেখানে চাষাভূষো সোয়ামীর উঠোনে ধানসেদ্ধ করতে হবে। কালি-ঝুলি মাখতে হবে।...হাঁ এই রকমই অদৃষ্ট ওর।...তারপর মাথা চুলকে, ঢিলে ধুতির বেড় টাইট করে দিয়ে ফের বলেছিল, আমার এই এক অব্যেস। দশহাত ধুতি কিনে দ্যায় দিদি। বলে, পায়ের গোড়ালি ঢেকে পরিস্ যেন। কিন্তু গতরের দোষ রয়েছে—বাবুকোঁচা করে ঠিকই পরলাম। খানিক পরে দেখি—ও হরি, সেই হাঁটুর ওপর গুটিয়ে ফেলেছি কখন। এই দ্যাখো না...এই রকম নানা কথার পর আসল কথায় গিয়েছিল সে—রান্নাবান্না পোষায় না। কাঁচা চাল ভিজিয়ে কদিন চলেছে। ভাতের জন্য মন ছোঁ ছোঁ করে—বীণার মা বলেছিল, বেশ তো, এখানে এ বেলা খেয়ে যা! লোচন জোড়হাতে বলেছিল, তুমি আমার দিদির অধিক; খেতে বললে ধন্য হই। কিন্তু, কথাটা হচ্ছে...

কানকাটা মেয়েটি বীণাদের বাড়ি কাজকর্ম করত মধ্যে মধ্যে। তাই বীণার মা ঘটকালিতে সিদ্ধ হলো। পাড়াগাঁয়ের সমাজ দশবছর আগে হলে বিধবা বিয়ে নিয়ে দুচারখানা ছড়া বা সঙ বেঁধে গাজনে গাইত। আজকাল গ্রাহ্য নেই, চোখের ওপর কত কী ঘটে যাচ্ছে। ললিত বাঁড়ুজ্জের ছেলে অবিনাশ দিল্লীতে থাকে। মিলিটারীর ডাক্তার বর্মি মেয়ে বিয়ে করে বসল। পরাশর চক্রবর্তীর ছেলে কাজল ভুবনপুর হাসপাতালের নার্স মেয়েটাকে বিয়ে করল পেটে সন্তান নিয়ে। আর বিধবা বিয়ে? দুচারটে নজীর এখানে ওখানে রয়েছে। এখন সমাজে যুবা-পুরুষদের প্রাধান্য। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট আর সদস্যেরা সকলেই বয়সে তরুণ! প্রবীনদের যুগ কেটে গেছে এখন।...তাতে লোচনের মত শুদ্দুর, উলঙ্গ নাচলেও মাথা ব্যথা নেই। ভুবনপুরে সরকারী আপিস বসছে নতুন-নতুন। কত শুদ্দুরের ছেলে প্যান্টকোট পরে মুখুজ্জে-বাড়ুজ্জে

বাড়িতে একাসনে পাত পেড়ে যাচ্ছে ভোজনে-নিমন্ত্রণে···লোচনকে কে গণ্য করে হিসেবে। বরং লোকে খুশীই হয়েছে। মেয়েটার দুঃখের অন্ত ছিল না। এই বয়স, ওই রূপ, যে রূপকে নষ্ট করতে চেয়েছিল সোয়ামী, ড্রাইভোলের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে প্রতি শনিবারে। তিনকূলে কেউ নেই যে গিয়ে ইজ্জত বাঁচায়। বয়স আর রূপও যে মেয়েমানুষের বড় শত্তুর! সুতরাং লোচন তাকে বুক দিয়েছে, ভালো বই মন্দ হয় নি।

কিন্তু মন্দ মানুষের অভাব নেই কোথাও। যারা লোভ নিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত, ওকে রাতবিরেতে জ্বালাতন করত, আজও পিছু ছাড়েনি। তাই লোচনের একটু ঝামেলা। ঢিল পড়ে রাতের উঠোনে। ভোরবেলায় উঠোন সাফ করতে গিয়ে ও কেঁদে ফ্যালে। গালাগালি করে তীব্রকণ্ঠে। লোচন গিয়ে দ্যাখে আর ক্ষুব্ধ হয়।

বাড়ি ছেড়ে এক রাত লোচনের সে কারণে বাইরে থাকা কঠিন।

সে বেঞ্চে বসে সব কথা বলল বিনোদিনীকে। বিনোদিনীর কথাও শুনল। নিশি তার গলার কাঁটা হয়ে উঠছে দিনে দিনে। এমন চলতে থাকলে কপালে বুড়োবয়সে অনেক লাঞ্ছনা আছে হয়তো। বিশ্বশুদ্ধ পর করে বিনোদিনী কেমন করে বাঁচবে?

লোচন বলল, চুলোয় যাক দোকান। চলো, সব গাড়িতে তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরি। ঘরদোর হলো, ঠাকুরঘর হলো, আর কী চাই তোমার? এ বয়সে ওসব নেশা ছেড়ে দাও এবার।

বিনোদিনী ম্লান হাসল।—নেশা! নেশা ছাড়া কেউ তো নেই সংসারে। তুই বাউণ্ডুলে অকর্মার ধাড়ী লোচন, তুইও কি নেশায় মেতে নেই! শুধু নেশার রকমফের, একটা অছিলা করে নেশা মেটানোর কারচুপী। কিন্তু······

একটা কিন্তু কোথাও খচখচ করে সারাজীবন। কোথাও একটা কাঁটা বিঁধে রয়েছে রক্তেমাংসে।

লোচন ওকে চুপ করে থাকতে দেখে চাপাস্বরে বলল, কেন? পারবে না? গোবরা বাধা দেবে?

বিনোদিনী বলল, না সেকথা নয়।

তবে?

আবার খানিক চুপ করে থেকে বিনোদিনী বলল, নিশি যদি না যায়!

নিশি যদি না যায়! একি কথা বিনোদিনীর মুখে! কোথায় গেল তার সে শাসন তর্জনগর্জন, নিমেষে আকাশ-পাতাল একশোখানা করে ফেলা, তাড়কা

রাক্ষসীর রূপ? লোচনের মনে হলো, তার সামনে বিনোদিনী বসে নেই, একটা নিষ্প্রাণ ঠাণ্ডা মাংসপিণ্ড মাত্র। তবু সে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল, চুলের মুঠি ধরে মারতে মারতে নিয়ে যেতে পারবেনা হতচ্ছাড়াকে!

তুই পারবি লোচন?

লোচন মুখ তুলে তাকাল।

তুই পারবি! তোর নিজের মেয়ে, তুই তার বাপ তুই পারবি?

আমি? লোচন ঢোক গিলছে বারবার···আমার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক দিদি? সম্পর্ক থাকলে তুমিও কি অমন করে নিয়ে আসতে পারতে আমার কাছ থেকে?

বিনোদিনী আগের সময় হলে, পলকে ঝাঁপিয়ে আসতো তার দিকে, এখন সে খুবই শান্তস্বরে কথা বলছে। সে বলল, আমার কী যেন হয়ে গিয়েছিল রে, হঠাৎ রূপপুরের মেলায় জ্বর হয়ে সেই থেকে কেমন ভাবনায় জ্বলে মরছিলাম। আমি ভাবিনি, এমন হবে···

ভাবো নি? লোচন সোজা হয়ে বসল। মিছে কথা বলো না দিদি! তুমি কি জানতে না মেলায় এলে মানুষের কী হয়? সারা জীবন তুমি দেখেছো সেটা। চিরকাল তুমি বলেছোও ওই কথা। আর আজ বলছো, ভাব নি! তুমি জেনেশুনে মেয়েটাকে পাপের সাগরে এনে ফেললে। লোচন উদ্গত অশ্রু সম্বরণ করে বলতে থাকল, একটা সাদা ফুলের মতন নিশি আমার ফুটেছিল, বোঁটা ছিড়ে এনে তাকে কালো করে ফেললে। যাই বলো, এর দোষ তোমার। এর জন্যে তুমি যদি আমাকে তোমার ঘরদোরের খোঁটা দাও, আমি বলবো, তোমার ঘর তোমারই আছে। আমিও এবয়সে যখন একটা অপকম্ম করে ফেলেছি তার প্রায়শ্চিত্তির করতে পিছপা হবোনা। পুরুষ তো বটে আমি।

এক নিঃশ্বাসে কথা বলে লোচন হাঁফাতে লাগল। বিনোদিনী কোন জবাব দিল না। ছোট ভাইয়ের এত তীব্র গঞ্জনা তার প্রাপ্য। তার প্রাণশক্তি যেন আস্তে আস্তে জবাবদিহির ভয়ে লুকিয়ে পড়ছে কোথায়।

লোচন তাকে এমনি চুপ থাকতে দেখে আবার বলে উঠল, তা নয়। আসলে নিজের জীবনে যে সাধ মেটেনি, তাই মেটাতে চেয়েছো ভাইঝিকে দিয়ে। এত করেও তোমার শান্তি হয় নি। ধিক্ তোমাকে।

সে এবার উঠে দাঁড়াল। বিনোদিনী পাথরের মতন স্তব্ধ।

নিশি দোকানের পিছনে কাপড় মেলে দিচ্ছিল। তার কান ছিল এদিকে। এতক্ষণে সামনে এসে দাঁড়াল সে। বলল, কি হয়েছে নিশির? সাদা ফুল কালো হয়ে গেছে বললে না? তুমি জন্মদাতা বাবা, ওকথা তোমার মুখে

বাধলনা একটুও ?

লোচনের চোখদুটি জ্বলে উঠল মুহূর্তে। আমি তোকে নিতে এসেছি। এক্ষুণি যেতে হবে তোকে।

পিসি যাবে না ?

পিসির ইচ্ছে। তোকে আমি নিয়ে যাবো। আর একদণ্ড এ পাপের জায়গায় রাখবোনা। আমার উঁচু মাথা ধুলোয় লুটিয়ে দিলি তুই !

তুমি আমার কে, যে বললেই তোমার সঙ্গে যেতে হবে ?

নিশি ! লোচন নিশির যে-রূপের কথা কানে শুনেছিল, চোখে দেখে চমকে উঠল এবার। নিশি, আমি তোর বাপ।

বাপ ? ব্যঙ্গে নিশির উদ্ধত মুখটা কুঁচকে গেল ভাঁজেভাঁজে। নিশির বাপ এতদিনে মাটি ফুঁড়ে গজাল। তোমরা দেখে যাও, নিশির বাপ এল রানীচকের মেলায়।

নিশি মুখ সামলে কথা বলবি। লোচন এগিয়ে গেল।

বিনোদিনী হুড়মুড় করে নামল ! ছুটে এল সামনে। লোচন, ও লোচন, লক্ষ্মী ভাই আমার, এ মেলা-খেলা জায়গা। লোকে মজা দেখতে হাঁ করে আছে। দোহাই তোর, চুপ কর।

নিশি বলল, পথ ছেড়ে দাও পিসি। লোকে দেখুক, নিশির বাপ এসে নিশিকে ধরে পিটোচ্ছে এতদিনে। আহা, জন্মের দাবী জানাতে এলেন মহাপুরুষ এতদিন পরে ! জন্ম ! শুধু জন্মই দিতে পেরেছিলে ! এবয়সে আবার জন্ম দেবার জন্যে একটা পথের মেয়ে ধরে এনে ভুবনপুর আলো করলে।

বিনোদিনী বিব্রতমুখে বলল, আঃ নিশি, থাম্, চুপ কর।

কেন চুপ করবো ? বাপ ! কেমন বাপ যে এসে যখন পায়ের ধুলো নিলাম, বলল না, কেমন আছিস ? চুপ করে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল না তো, যা শুনেছি তা কি সত্যি মা ?···আর তো আমি কচি খুকিটি নই পিসি···ক্ষোভে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল নিশি। আসবার দিন ভোর বেলা যখন কাছে গেলাম, তখন তো এমন বাপের দাবী দিয়ে আটকে রাখল না। আজ কেন আর শাসন করা ? তোমার নিশি মরে গেছে।

মেলা ! সুতরাং লোক জমতে দেরী সয় না। গতিক দেখে লোচন নিজেকে সামলে নিল। বলল, ও থাক ! মরুক রানীচকের মেলায় হাবুডুবু খেয়ে। একটা শেষ কথা বলি—দিদি, তুমি যাবে ?

বিনোদিনী বলল, আমি গেলে ও কোথায় থাকবে রে লোচন ? অত ব্যস্ত

হোস্‌নে। চানটান করে আয়। খেয়ে নে। ওকে বুঝিয়ে আস্তেসুস্থে সব ঠিক করে নিচ্ছি।

লোচন বেঁকে বসল। নেয়েখেয়ে কাজ নেই। তুমি শেষ কথা বলো।

মাথা ঠাণ্ডা কর লোচন।

না।

একটু সময় দে ভাবতে।

না।

ভাববার সময় সত্যিই দিল না লোচন। ধনার গাড়ী আবার ফিরে গেল শূন্যবুকে। ধনা বেচারার চিবুক বিঁধে গেছে কণ্ঠনালীতে। দাঁত বেরিয়ে আছে—হাঁ বোজানোর নাম নেই। ছেলেবেলা থেকে সে বিনোদিনীর গাড়োয়ানী করছে। এমন খালিগাড়ি নিয়ে বারবার ফেরত তাকে কোনদিনই যেতে হয়নি। তাছাড়া, লোচন, বিনোদিনী আর ঐ নিশির এমন রূপ সে কল্পনাও করেনি কোনদিন। বিনোদিনীই হয়তো এর মূলে। একটা সাধের বিষগাছ লালন করছিল সবার অলক্ষ্যে। সেই বিষফল পেড়ে জোর করে নিশিকে আর লোচনকে গিলিয়ে দিয়েছে সে। নইলে এমন হয় কি?

দেবতা শ্যামচাঁদ ওখানে পথ চেয়ে বসে রইল ভক্তের প্রণাম পাবে বলে। পাবে না—তখন অভিশাপ দেবে ক্রোধে। মজা টের পাবে পাপিষ্ঠা বুড়িটা।

লোচনও ওইরকম ভাবছিল। ফিরে গিয়ে সেই পুরনো মাটির ঘরেই বাস করবে সে। বিনোদিনীর পাকা দালান শূন্য পড়ে থাক্। ঠাকুরঘর? ওটা দেবতাদের অধিকার—লোচন সে অধিকার যথাযথ মান্য করবে। মনোহর দাস বাবাজীর কীর্তন বায়না দেওয়া আছে। ভুবনপুর দিন গুনছে সে রাতটির। লোচন বঞ্চিত করবে না কাকেও। সবার সঙ্গে আড়ি চলে। দেবতা আর দশজনের সঙ্গে চলে না।

অথচ বুক হু হু করে ওঠে ধু ধু মাঠ চৈত্রমাসের বিকেলে। গাড়ির চাকায় কান্নার সুর বাজে।...তখন তো বাপের দাবী দিয়ে আটকে রাখলে না, তোমার নিশি মরে গেছে। লোচন বুক চেপে ধরে—তোমার নিশি মরে গেছে। বৃষ্টিধোওয়া রোদঘষা ঝকঝকে তকতকে পৃথিবী শ্মশান থেকে ফিরে অশুচির স্নান সেরে বসে থাকা মানুষের মুখের মত মনে হয়—যেন, তোমার নিশি তো আর ফিরবে না, যে মরে সে ফেরেনা, এই রকম কথা বলে। আর দিনাবসানে ধূসর হয়ে আসে চারিদিক। অন্ধকার আসে পেছন থেকে। হাত বাড়িয়ে লোচনকে ঘেরে। লোচনের মনে হয়, পেছন থেকে বিস্মৃতি এসে কালো মুখে গলা জড়িয়ে

খরে ফিস ফিস করে : তোমার নিশি বলে কেউ ছিল না তো !

দক্ষিণ থেকে হাওয়া যায় উত্তরে। লোচনের মনে হয়—কেঁদো না, নিশি নেই। সে এইসব ভাবে আর স্থির হয়। সোজা হয়ে বসে। মুখ তুলে আকাশ দ্যাখে। দেখতে দেখতে ঘাড় ফিরিয়ে ত্রয়োদশীর চাঁদ দেখতে পায়। জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আসে। বয়স্ক চাঁদের নির্বিকার জ্যোৎস্নার শান্তি। সেই শান্তি থেকে শান্তস্বরে উচ্চারিত হয় : দুঃখ করো না, নিশি নেই।

তারপর কখন ভুবনপুরের চেনামাটির পথ। গাড়ি গ্রামের কাছে এসে গেছে। হঠাৎ লোচন সামনের দিকে তাকায়। স্বপ্ন না ভ্রম না মায়া না মোহ—ছায়াঢাকা গ্রামের পথে, ঠিক যেখানে ঘরবাড়ি শুরু হয়েছে, একপাশে যেন আধেক দেখা আধেক না দেখা কে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কে যেন লোচনের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে প্রশ্ন করবে বলে।

অস্ফুটকণ্ঠে লোচন বলে উঠল—ও কে ? কে ও ?

আর তখনই অশান্ত চৈতালী হাওয়া এল ছাপিয়ে। গাছের পাতাগুলি ছায়াসমেত কাঁপতে লাগল। হাওয়ার মর্মরে কাঁপনে কথা বলে ভাঙ্গচুর হয়ে গেল সেই প্রতীক্ষাটি : কই, নিশি কই ! লোচন দুহাতে মুখ ঢেকে বলে উঠল—তাড়াতাড়ি চালা রে ধনা, রাত পুইয়ে এল যে।

সুবাসলতা এসেছিল পথ দেখতে তার মেয়ের ? লোচন বারবার ছইয়ের ভেতর পেছন ফিরছিল। ছায়া কাঁপছিল পেছনে। কই, আমার নিশি কই ? ভেঙে ভেঙে মর্মরধ্বনিতে আরেক বিলাপ ছড়িয়ে পড়ছিল : নিশি কই, নিশিলতা কই ! পাখি ডাকছিল কোথায়। নিশি কই, নিশিলতা কই !

লোচন শেষবারের মতো চোখ মুছল। নিশি বাপকে এতদিনে সব পাওনা কড়ায়গণ্ডায় শোধ করে দিল তাহলে।

॥ বারো ॥

জনকথায় আছে : চৈত্রের শীতে, জলচরা জীব মোষেরও শিঙ নড়ে যায়। তাতে বৃষ্টির পর ভেজা মাটি থেকে ঠাণ্ডা ভাপ উঠছে। সন্ধ্যে থেকে মেলার আশেপাশে এখানেওখানে আগুন জ্বালিয়ে হাত-পা সেঁকছে কারা। তেলে-ভাজার উনুন ঘিরে লোক থকথক করছে। শুধু ওখানেই নয়। মধ্যখানে ফাঁকায়

হাঁটবার চেয়ে দোকানে দোকানে আড্ডা দেওয়া অনেক আরাম। লোকগুলো তাই চারপাশে সেঁটে যাচ্ছিল ক্রমশ। যেসব দলের বায়না ছিল, তাদের মুখে যদিও হাসি ফুটেছে, আসরের অবস্থা দেখে সে হাসিও খুব ঠাণ্ডা ঠেকছে। সামিয়ানার নীচে যেন বরফের চাঁই—সুতরাং সদ্য মিলিটারী ক্যাপ ঘটিয়ে যে সেনাপতি সিংহাসন দখল করল, সে পরের দৃশ্যে হিহি করে কাঁপতে কাঁপতে কোনরকমে প্রস্থান করলে বেঁচে যায়। প্রম্পটার বসে আছে তক্তাপোষের পাশে নীচের জায়গায়। প্রবেশপথের মুখে। তাব পেছনে লোক। তাই আরামের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠছে—যুদ্ধ, যুদ্ধ !···তার মানে যুদ্ধ বাদ পড়ল ! রাজদরদী ক্রুদ্ধ মন্ত্রী টের পেয়ে গেছে ততক্ষণে, তলোয়ার ঘোরালে গায়ে ঘাম হতে পারে। অতএব পরের দৃশ্যে সেও তলোয়ার ঘুরিয়ে গেল। বইতে নেই—প্রম্পটার গজগজ করছে ! তাকে দুটাকা ঠিকে চুক্তিতে এনেছে। কথা বাদ গেলে সে দুঃখ পায়। কিন্তু মেলাখেলার আসর। যত রক্তচণ্ড, হাসিতামাসা, তর্জন-গর্জন, বুকফাটানো বিলাপ আর পরিশেষে ঘোরতর যুদ্ধ দেখানো যায় তত বই জমে ! দেখনদারী জায়গা তো ! উপরন্তু শীতের আসরে যেভাবে হোক সময় কাটানো নিয়ে কথা মানুষের। এতে ধরাধরি নেই। মন্তব্য নেই। কেবল বলে—জোরে, আরো জোরে। এ তো আর গ্রামের আসর নয়, ধীর শান্ত গতি হবে। বিদায় দৃশ্য বিলম্বিত লয়ে চলবে। এমন কি বেহালাদার হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে করুণ সুরে ছড় টানতে থাকবে। এ হচ্ছে মেলা। ঝুলে যাবার ভয় পদে পদে। তাই মধ্যে মধ্যে হাসির দৃশ্যের অবতারণা, বইতে থাক্ বা না থাক্। যদিও মা-ভগ্নীদের অভাব নেই, এটা মেলা। সুতরাং অশ্লীল খিস্তি যতো চালানো যায়, রি রি করে বই জমে। শেষে তবলচী বাঁয়াতে ডুডুম বাজিয়ে দ্যায়।···

অবশ্য কলকাতার যাত্রার কথা আলাদা। কলকাতার সবই ভালো। কারণ কলকাতা সারা বাংলা দেশের সেরা জিনিসটিই বেছে বেছে নিয়েছে। সে যা করে, তাই সুন্দর লাগে।

পীরপুরের নেতাজী অপেরা এই শীতের রাতের আসরে ওদিকে প্রচণ্ড যুদ্ধ করছে অমনি করে। এখানে নিশি কদিন পরে মাটির ওপর বিছানা পাততে গিয়ে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। হিম উঠছে ভেজা ঘাস থেকে। তখন বুদ্ধি করে ধনার গাড়ি থেকে কিছু খড় নিলে ভালো হতো।

বিনোদিনীকে যেন ভুতে পেয়েছে। আপন মনে বিড় বিড় করে কি সব বকছে সন্ধ্যা থেকে। কান পেতে শুনেও কিছু বোঝা যায় না। যাওয়া উচিত ছিল ওর। শ্যামচাঁদ প্রতিষ্ঠার বাসনা ছিল, বাসনা কি নির্মূল হবার ? ওই

মনের পোকা শেষে কুরেকুরে হাড়মাংসও খাবে।

লোচন যাওয়ার পর আর একচোট হয়েছিল। বিনোদিনী কিছু বলেনি। শুধু শুনে গেছে। শেষে নিঃশব্দে উঠে রানীচকের ওদিকে কোথায় গিয়েছিল। ফিরেছে একেবারে সূর্য ডুবিয়ে। ফিরে এসে বকবক করছে দুর্বোধ্য ভাষায়।

নিশি বলল, শোব কোথায় পিসি? আজও এখানে শোয়া হবে না। খুব ঠাণ্ডা উঠছে।

বিনোদিনী জবাব দিল না।

নিশি ফের বলল—পিসিমা!

বিনোদিনী স্তব্ধ। কোনও রকম শব্দই নেই।

হলো কী বুড়ির? নিশি বেরিয়ে এসে দেখল—বিনোদিনী জড়োসড়ো হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। সে ছুটে কাছে এল। গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে থাকল—পিসি, ও পিসি, পিসিমা!

বিনোদিনীর গায়ে খয়েরী র‍্যাপার। কপালে হাত রেখে নিশি চমকে উঠল। জ্বর হয়েছে যে! কী দারুণ গরম, এত শীতেও যেন আগুনের হল্কা বেরোচ্ছে। তাই বুঝি বিড়বিড় করছিল। নিশি গজগজ করে উঠল—যেমন এই ঠাণ্ডায় বাইরে বেরিয়েছিলে, তেমনি ঠ্যালা দ্যাখো এখন! চুলে পাক ধরেছে, বুদ্ধিশুদ্ধি একটুও হলো না!

সে টেনে তুলতে চেষ্টা করল বিনোদিনীকে। 'ওঠ, এগুলো সরিয়ে এখানেই বিছানা করে দিই।

বিনোদিনীর মুখ ডেলাইটের আলোয় ভীষণ লাল দেখাচ্ছে। অস্ফুট কাতরাচ্ছে এবার। নিশি ক্ষিপ্রহাতে বিছানা করে ফেলল। শুইয়ে দিল জোর করে। তারপর লেপটা এনে চাপিয়ে দিল।

তাড়াতাড়ি খাওয়াটা সেরে ফেলবার জন্য যখন সে ফের ভেতরে ঢুকছে, গোবরার উদয় তখন।

গোবরা বলল—ও পিসি, শুয়ে যে?

নিশি মুহূর্তে পেছন ফিরে একবার ওকে দেখল মাত্র।

কি গো, কথা বলছো না যে সব? ব্যাপার কী?

বেঞ্চে বসে কারা আসরের দিকে তাকিয়ে গান শুনছিল। পেছনে গোবরার কণ্ঠস্বর। জবাব তাদেরই একজন দিল এবার—পিসির জ্বর হয়েছে গোবর্ধনবাবু।

গোবরা দাঁত খিঁচিয়ে উঠল—থামো। তোমাকে প্রশ্ন করেনি কেউ।

লোকগুলি স্থির হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। দ্বিতীয় কথা বললে হয়তো চাটি

মেরে দেবে মাথায়।

নিশি বেরিয়ে এল। খাওয়া রোচেনি। হাঁড়িতে জল ঢেলে দিয়েছে। এসে গোবরার পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে গেল সে। বলল—ঝাঁপ ফেলবো।

গোবরা বলল—ঝাঁপ ফেলবে? কোথায়?

আমার ফাজলেমির সময় নেই। নিশি ঝাঁপের বাঁশটা ধরে একটানে নামিয়ে আনল একটা দিক। গোবরার তবু নড়বার নাম নেই। ঝাঁপ একপাশে কাত হয়ে থাকল বিশ্রীভাবে।

সে বলল, এই মেঘ, এই বৃষ্টি, এই রোদ। সে বাব্বা, এই বুঝি মেয়ে মানুষের ব্যাপার! কি অপরাধ করেছি, বলবে তো?

নিশি জবাব না দিয়ে ডেলাইটের গা হাতড়াতে থাকল। হাওয়া বের করে দ্যায় কোনটা ঘুরিয়ে যেন···কিছুক্ষণ চেষ্টা করেও সে পারল না। লম্ফটা জ্বলছে এককোণে। ফুঁ দিয়ে হঠাৎ নিবিয়ে কতকটা আপনমনে বলল, মিছিমিছি তেল পুড়িয়ে কি লাভ!

গোবরা বলল, এইতো পানওয়ালীর ক্ষমতার দৌড়! বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে মেলায় থাকবার প্রতিজ্ঞা করে—অথচ মেলার আলো কেমন করে জ্বালতে হয়, নেভাতে হয়, তাও শেখা নেই। তোমার ভুবনপুরে ফিরে যাওয়া উচিত ছিল নিশিলতা।

নিশি বিনোদিনীর পাশে নিঃশব্দে মাথা টিপে দিচ্ছে ততক্ষণে। এই লোকটার জন্যে সেদিন দুপুর রাত অব্দি বৃষ্টি-কাদা না মেনে সারা মেলা ঘুরে বেড়িয়েছে—ভাবতে অবাক লাগে। সে রাতে মনে হচ্ছিল—কতযুগ ধরে যেন একটা চরম প্রার্থিত কোন বস্তু সে খুঁজতে বেরিয়েছে আকুল হয়ে। পেলে জীবন ধন্য হয়ে ওঠে। তারপর কেমন করে সেই উদগত আগুনের শিখা জ্বলে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে গেল। এই বাইরের মতন এক গাঢ় হিম তার মধ্যে সঞ্চারিত হতে থাকল চারপাশ থেকে। কামনা-বাসনাহীন অদ্ভুত সময়। নিজের দিকে বিস্মিতভাবে চেয়ে থেকেছে নিশি। কেন এমন হয়েছিল সেরাতে! কে বেরিয়েছিল চুপিচুপি একটা খুনী হিংস্র নিষ্ঠুর মানুষকে কাছে বসে খাওয়াবে বলে? কি তৃপ্তি পেত কে জানে!

এখন সামনে তাকে দেখে কথা বলতে ইচ্ছে করে না আর। ঘৃণার দৃষ্টি বারবার চোখের পিচ্ছিলতায় ছলকে ছলকে ঝাঁপিয়ে আসে। নিশি অতিকষ্টে নিজেকে সম্বরণ করল। ঘৃণাতেও তৃপ্তি নেই। অথচ ও যদি আর না আসত, দেখা না দিত সারাজীবনের মতন, তাহলেও কি তৃপ্তি পেত নিশি? এমন কি

যদি ও এখনই হঠাৎ আর কথা না বলে চলে যায়, নিশি কি নির্বিকার মনে সেই সঞ্চারিত গাঢ় হিমের মধ্যে আত্মগোপন করতে পারবে? জমে যেতে যেতে আগুনের জন্যে রক্তেমাংসে চঞ্চল হয়ে উঠবে না?

নিশি অনুভব করল গোবরা এসে দাঁড়িয়ে আছে, এই আসা আর দাঁড়িয়ে থাকা তাকে কি পরিমাণে অস্থির করছে। শিরায় শিরায় রক্ত-স্রোতে অব্যক্ত গভীর চঞ্চলতা—অসংখ্য কীটানুকীটের মতন কি ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে এসে ঘিরে ধরছে সবকিছু। যাহোক কিছু করতে ইচ্ছা করে। হয় অপমান করে, নয় তো বরণ করে। হয় সুখী হয়, হাসে কিম্বা ক্রুদ্ধ হয়, আঘাত করে। যে কোন একটা চরম করার তীব্রতা তাকে ক্রমান্বয়ে পেয়ে বসেছে।

অথচ ব্যাপারটা এইরকম। পিঠের কোথাও চুলকোতে হয়—ভীষণ শিরশির করছে, হাতটা ঠিক সেই বিন্দুতে পৌঁছোয় না। যদি বা পৌঁছোয় সম্পূর্ণ করে চুলকোন যাচ্ছে না—তাই আকুলতা। শির-দাঁড়ায় ঝাঁকুনি দেওয়া। বারবার পিঠ নাড়া। ধনার বলদটা ওইরকম করে। লেজও পৌঁছোয় না। তখন শিরদাঁড়ার ওপর মাংস থিরথিরিঁ করে কাঁপায়।

নিশি দেখল, পিসির কপালে তার হাত ঠিকমতো কাজ করছে না। থেমে যাচ্ছে মধ্যে মধ্যে। হাতের আঙ্গুলে জোর নেই মনে হচ্ছে। নিশির মধ্যখানে দাঁড়িয়ে আরেক নিশি তাকে অন্য কোথাও ঠেলে ফেলে দিতে চায়। তাই সবটুকু শক্তি আর মনোযোগ সেইখানে লিপ্ত।

এ বড় আতঙ্কের কথা। তার নিজের ওপরে যেন নিজের কোন হাত নেই। সে যত এই কথা ভাবছিল, তত তার মনে হচ্ছিল—আগুনও কি তার মতন অসহায়? পোড়ানোতে যেন আগুনের কোন হাত নেই। আলোতে নেই। উত্তাপে নেই। ডেলাইটের কাঁচের চারপাশে গুচ্ছের পোড়া পোকা। ডেলাইটটা জ্বলে জ্বলে আলো আর তাপ বিকীরণ করছে চোখের সুমুখে। স্থিরদৃষ্টে তাকাতে গিয়ে চোখ ঝলসে গেল। তখন সে তাকাল এক মুহূর্তের জন্য গোবরার দিকে। গোবরার মুখের ওপর আবছায়া লাল নীল রঙের ঘূর্ণী। মুখটা স্পষ্ট দেখা গেল না।

গোবরা চুপচাপ তাকিয়ে তার মাথা টেপা দেখছিল। এবার বলল, বাড়ি গেলে না কেন নিশি? বাবা মনে কষ্ট নিয়ে ফিরে গেল।

এ খুনী গুণ্ডার কথা নয়! চোখ বুজে শুনলে এইকথা এই স্বর অন্য মানুষের। যে মানুষ সহজ সরল—মাটি থেকে যে রসগ্রহণ করা গাছের মতন স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠেছে। এমন করে চোখ বোজা কথা শুনলে সবই হয়তো

অন্যরকম লাগে। মানুষ আর তার কথায় আকাশপাতাল ফারাক হয়ে আসে। নিশি চোখ ফিরিয়ে সেই রকম শোনা শুনছিল।

তাছাড়া নিশি, এমনি করে মেলায় জীবন কাটিয়ে কোন সুখ নেই। সত্যি, আমাকে বিশ্বাস না কর, আমার এই কথাটার মূল্য তুমি দিও। কি হবে এই করে? ওই দ্যাখো পিসির অবস্থা—জ্বরে ভাবনায় ঢলে পড়েছে বেচারা। না ছেলেপুলে না স্বামী—রক্তের চিহ্ন কিছুই রইল না পৃথিবীতে। চোখ বুজলে সব শেষ। তুমিও কি এমনি শেষটার জন্যে আশা করে বসে আছো? এ শেষের কি দাম নিশি?

নিশি কি বলতে গিয়ে সামলে নিল। যা খুশী, বকবক করুক।

আজ নন্দ সরকার এইমাত্র মরে গেল···

নিশি মুখ না খুলে পারল না সঙ্গে সঙ্গে। অস্ফুটকণ্ঠে বলল—সে কি!

হ্যাঁ, খুব কষ্ট পাচ্ছিল। শরীরের ওপর অত্যাচার কম করেনি জীবনে। লিভার বলতে কিছু বাকি ছিল না মদ খেয়ে। একশোটা রোগ একসঙ্গে। মরণযন্ত্রণায় দিনরাত কাতরেছে। আজ বেঁচে গেল অবশ্য। দেশের লোক বলছে তারাও বাঁচল। পাড়াপড়শী কেন, সারা রানীচকের ঘুম ছিল না শেষের কটিরাত। দোতালায় শুয়ে চেঁচালে সারা গ্রাম ছড়িয়ে পড়ে। আর একদিন ওই নন্দ সরকার এই মেলার গোবরা হাড়ি ছিল! হ্যাঁ—ঠিক আমারই মতন পাপীতাপী। কিন্তু দ্যাখো নিশি, তাহলে মানুষের জীবনটা কি? সুখ কোথায় জীবনে? ভোগ তো কম করেনি ও?

কোত্থেকে বিশ্বাসী কারুর কাছে মদ খেয়ে আসেনি তো গোবরা? এমন করে কথা বলছে যেন ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ। ওই মুখে অশ্লীল খিস্তি আওড়াবে কখন?

নাকি মহাদেব ঠাকুরের আশীর্বাদে রাতারাতি স্বর্গ থেকে ফিরে এল সে। মহাদেব ঠাকুরের ওপর কোন লোকের যে এত ভক্তিশ্রদ্ধা রয়েছে, নিশি জানে না! সে আবার বলে—গোবর্ধন আমার ভিক্ষেপুত্র। ওকে মানুষ না করে মরছিনে! বল্লভ কাঁসারিকে সব জানিয়ে দিলে মজা টের পাওয়া যায়। তখন দেখা যায়, নিক্তি কোন দিকে টলে। পুরুতগিরি করে পেট চালানো হচ্ছে আজীবন, আর বল্লভ যদি একথোক টাকার লোভ দ্যাখায়—নিশির বিশ্বাস, মহাদেব ঠাকুর না টলে পারবে না! হয়তো—এমনও হতে পারে, আগে ভাগে টাকা খেয়ে বসে আছে। কেবল সুযোগের অপেক্ষা, নয়তো বল্লভের পাঠানো সেই অক্ষম পুরুষত্বহীন ভাড়াটে গুণ্ডাটার মতন সাহসে কুলচ্ছে না!···লোকটাকে

সেইদিন থেকে নিশি সইতে পারে না, যেদিন ঘুমন্ত গোবরাকে দেখছিল আর আচমকা সে এসে তাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ; অযাচিত উপদেশ ঢেলেছিল কানে। হতভাগা বুড়ো, পাপ তোমার চোখে, তোমার মনে।

তাহলে নন্দ সরকার মরে গেল। বিনোদিনী সেই খবর পেয়ে লোকলজ্জার মাথা খেয়ে বুড়ো বয়সে—তার বাড়ি গিয়ে দেখে এসেছিল তখন ? যখন সে সরকার বাড়ির দোতালার ঘরে ভীড় ঠেলে মুখ বাড়িয়েছিল, চারপাশের চোখেমুখে কি দৃষ্টি ফুটে উঠছিল, নিশি স্পষ্ট দেখছে। হয়তো ওই দৃষ্টিতেই আজ সারা মেলাও নিশির দিকেও তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু কি কঠিন কি নিষ্ঠুর অথচ সত্য কথা বলতে পারছে গোবরা হাড়ির মতন মানুষ। অথচ যা সত্য যা ন্যায়—তাতে নাকি সে ঘৃণার প্রচণ্ডতায় পেচ্ছাপ করে দ্যায়। নন্দ সরকারের মৃত্যু দেখে সেও ভয় পেয়েছে আজ। তাই যেন নিশিকে নয়—নিজেকে সে প্রশ্ন করছে—জীবন কি, সুখ কি ?

নিশির মাথাটা কেমন করে উঠল। তার মনে হলো, রানীচকের মেলায় চিরকালীন ছায়াটা আজ এই হিমাক্ত রাতে আধোঢাকা আলোর দেয়ালে সাপের মতন ফণা তোলা একটা প্রশ্ন হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। গোবরার রূপ ধারণ করে সে বলছে : সুখ কি, জীবন কি ? ছায়া স্থিরভাবে নিষ্পলক দৃষ্টিতে নিশির দিকে তাকিয়ে। সুখ কি, জীবন কি ?

নিশি অস্ফুটকণ্ঠে বলল, শ্মশানে নিয়ে গেল ? তুমি সঙ্গে গেলে না।

গোবরা বলল, কেন ? আলোর মুখোমুখি তার মুখচ্ছবি—তার সেই অদ্ভুত রূপটা বিষণ্ণতার ঠাণ্ডায় কেমন স্যাঁতসেতে দেখাচ্ছে। ওর মুখে সেই জ্বালা দেওয়া, আগুন নেই, আশ্চর্য স্নিগ্ধ একটা বিকীরণ মাত্র সঞ্চারিত হয়েছে ; দেখতে দেখতে নিশি বলল—খুব যে বুকে বেজেছে শোকটা, তাই বলছি।

আমি সব শোকদুঃখের বাইরে।

তবে যে কাঁদুনি গাইছো ?

গোবরা ঠাণ্ডা হাসল। সূক্ষ্ম গোঁফের রেখা একপাশে কুঁচকে গেল। সে বলল, তোমার জন্যে। তোমার মন্দ দেখতে খারাপ লাগে, তাই বলছি।

আমি কোন খারাপ কাজ করিনি।

গোবরা হাড়ির প্রেমে পড়নি তুমি ? এর চেয়ে খারাপ আর কী আছে, বলো তো ?

নিশির মনের ভেতর কোত্থেকে জ্বলন্ত উল্কা ছুটে এল তীব্র বেগে। সে ঝাঁঝালো স্বরে বলল, হ্যাঁ, গোবরাহাড়ি আমার সাত জন্মের নাগর—অগ্নিসাক্ষী

কল্পা সাতপাকের বর! অসভ্য ইতর কোথাকার! কী পেয়েছো আমাকে?

বলতে বলতে সে উঠে এল। তারপর গোবরাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল! ঝাঁপটা ফেলে দিল। গোবরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে না চলে গেছে বোঝা যায় না। নিশি বিনোদিনীকে জড়িয়ে ধরে তার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকল। এই সব অনাছিষ্টি মেলায় একটা করে ঘটছে। আর এই করার জন্যে সে মেলায় পড়ে আছে জেদ করে?

কিন্তু···কিন্তু কী করবে সে? কোথায় যাবে—শান্তি কই সুখ কই? ভুবনপুর ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পেছনের সঙ্গে তার যেন সকল যোগসূত্র ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়ে গেছে। আর সামনে যে জীবন সে অনুভব করছে: সেখানে ওই খুনাপাষণ্ড গোবরা ঠাণ্ডা রক্তমাখা হাতটা পেছনে লুকিয়ে প্রশ্ন করছে সুখ কি, জীবন কি?

নিশিরও যে তাই একই প্রশ্ন।

। তেরো ।

যে মৃত্যু স্বভাব নিয়ে আসে ধীরে শান্ত মৃদু স্রোতের মতন, তা তো গোবরার হাতের নাগালে নেই। মানুষের দেহ থেকে ওই স্বভাব মৃত্যুর উত্থান খুবই লৌকিক। আর গোবরা হিংস্র হাতে যে মৃত্যুর চুল ধরে মানুষের দেহের শয্যা থেকে টেনে তুলে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দ্যায়—তা অলৌকিক। দেহের মধ্যে একটা করে প্রতি-দেহ নিয়ে তারিণী মুখুজ্জেরা সংসারে চলাফেরা করছে। জন্মক্ষণ থেকে বহন করছে তাকে। হঠাৎ মুখোমুখি স্পষ্ট তাকে দেখলে তখনই হঠাৎ মনে পড়ে যায়, কে তার ঘরে ফেরার অপেক্ষায় বসে আছে! অথচ ভাবতে অবাক লাগে, আলোর নীচে ছায়ার অধিক ছায়া ওই প্রতি-দেহের একটা ইতিহাস রয়েছে—ইতিকাহিনীও রয়েছে প্রচ্ছন্নতায়। জীবনের ইতিহাস—আলোর বা স্পষ্ট গোচরতাময় জীবনের ইতিকাহিনী যখন আছে, তখন ওই অগোচর প্রতি-জীবন বা মৃত্যুরও একটা কাহিনী রয়েছে মানুষের। গোবরার মনে পড়ে একদিন সে কোন গ্রাম থেকে শহরের দিকে চলছিল। দীর্ঘ পাথুরে পথ। গ্রীষ্মের রোদে সেই পাথর গলছে। তাপ বেরোচ্ছে হু হু করে। জলের রেখার মতন উত্তাপময় রোদের কাঁপন—মনে হয়, একটা কাঁপানো কাচের আড়ালে শহরের প্রতিচ্ছবি দাঁড় করানো। নিষ্ঠুর তাপের জ্বালা, পেটে খিদে,

বুক ধুক ধুক করে—পরনে ছেঁড়া হাফপ্যান্ট, খালি গা, পায়ে জুতো নেই—গোবরা চলছিল টলতে টলতে। ছায়াবিহীন পথে তার আগে আগে একটা কুকুরও জিভ বের করে চলছিল। পথের পাশে ভাগাড়। কুকুরটা পাশ কাটিয়ে সে দিকে চলে গেলে গোবরা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল। ওই কুকুরেরও একটা আশার জায়গা রয়েছে—তার নেই কারণ ওই দূরের শহরে আর পৌঁছতে পারবে মনে হয় না। আঃ খিদে, রোদ, দূরের শহরের হতাশাময় প্রতিচ্ছবি, ছায়াহীন গলন্ত গরম পীচের কালো পথ! আর সেই দিন তার কাছে সেই অগোচর মৃত্যু স্পষ্ট হয়েছিল একবারের জন্যে। গোবরা ধরে ফেলেছিল—সে কবে থেকে তাকে এমনি করে বরাবর গোবরাকে নিজের মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাচ্ছে। এ জন্যে তারও লড়াইয়ের বিরাম নেই। জামবনে জাম পাড়তে গিয়ে আছাড় খেয়েছিল একদিন। ষ্টেশনে ট্রেনের চাকায় পিষ্ট হবার মুহূর্তে আশ্চর্য ভাবে বেঁচে গিয়েছিল।...এমন অনেক ঘটনা। সকলেই মৃত্যুর কাহিনী—আলোর কাহিনীর নীচে ছায়ারও কাহিনী। অথচ মৃত্যু ছাডা সবচেয়ে বড সখা কে আছে মানুষের! চরম দুঃখের মুহূর্তে, আঘাতে, সন্তাপে, অভিমানে, যখন সব দিক থেকে মানুষ অসহায়, ঈশ্বরও মুখ ফেরান, তখন এই প্রিয়তম প্রতিবেশী বন্ধু ছাড়া—আর কারও কথা ভাবে না কেউ। ঈশ্বর মুখ ফেরান, এ মুখ ফেরায় না। গোবরার মা বলত—ওরে গোবর্ধন, জলে সাঁতার দিতে নাই।...কেন মা?...ডুবে মরবি। বলত—রেললাইনে হাঁটিস নে অমন করে। ...কেন মা?...গাড়ির চাকায় পিষে যাবি। আকাশে মেঘ ডাকছে। কালো রক্তমুকুট মেঘ। শন শন ডাক বাজছে যেন আকাশের ডানায়। দুরন্ত ঘূর্ণীতোলা ঝড়, শিলাপাত, বৃষ্টি...ওরে গোবর্ধন, বেরোস্ নে!...কেন মা, কেন? মরে যাবি বাবা। মায়ের শীর্ণ হাত আকাশের বিদ্যুতের দিকে, বজ্রের দিকে, ঝড় বৃষ্টি শিলাপতনের দিকে।...দেহবিবরে কালসর্প বাস করে। গোবরার বড় সাধ—মহাদেব ঠাকুরকে আজ এতদিন পরে প্রশ্ন করে তোমরা দ্যাখো নি, তাই এত ভয়। আমি বারবার বেদের মতন নিপুণহাতে যে কালসাপটিকে টেনে বের করেছি। আমার সব ভয় ঘুচে গেছে। গোবরা ভাবে—এই যে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি মেলায়—ফিরে আর না আসতেও পারি তোমার অন্নের পাতে বসতে। কে মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছে—ফিরবেই! সে ভাবে, সেদিন শিবপুরে গেলাম, না ফিরতেও পারতাম আর রানীচকে! নিশির ঘরে যাই, কে জানে পথে, কি তার ঘরে অপেক্ষা করে আছে সেই কালসাপ ফণা তুলে! আজ দ্বিজু ঘোষাল সদরে গেল, তার দ্বিতীয়পক্ষ বড় আশা করে পথ চেয়ে বসে থাকবে। অথচ

দ্বিজু ঘোষালের ফিরে আসার কোন গ্যারাণ্টি আছে ?… মানুষকে কেউ গ্যারাণ্টি দ্যায়নি—একটি মাস কি এক মুহূর্তের জন্য বেঁচে থাকবার।… মহাদেব ঠাকুর বলে—মহাভারতে আছে যুধিষ্ঠির বকরূপী ধর্মকে বলেছিলেন, সব থেকে আশ্চর্য এই যে মানুষ বেঁচে থাকাটাই সার বলে জানে। অথচ মৃত্যু অনুসরণ করছে সতত।…নাঃ জীবনের কোন গ্যারাণ্টি নেই। গোবরা হাড়ে হাড়ে বুঝে ফেলেছে। তাই সে অত নিষ্ঠুর হতে পারে, ঠাণ্ডা রক্তে খুন করতে পারে। দয়ামায়া স্নেহ প্রেমপ্রীতির প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকায়। সে ভাবে—মানুষের জীবন নিয়ত একটা সংগ্রামে-দ্বন্দ্বে-আপোষী মনোভাব নিয়ে চলেছে। সে সংগ্রাম আর দ্বন্দ্ব, তার গোচরতার সঙ্গে অগোচরতার। লৌকিকের সঙ্গে অলৌকিকের। গ্রাম থেকে মানুষটি মেলায় এল, সে যদি হঠাৎ দৃষ্টিটা স্পষ্ট করে, সে কি দ্যাখেনা, যাওয়া আর ফিরে আসার পথে মুহূর্তে মুহূর্তে কত অলৌকিক ঘটে যাবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে ! স্পষ্ট কেউ দ্যাখে না, তবু মন বলে একটা কথা—তাই অন্ধকার আলপথে সাপের যাওয়াটি চোখ এড়ায় না।… আর সেই মন নামক থাকাটির জন্যেই যেন গোবরা হাড়ি মৃত্যুর আর জীবনের প্রকৃত চলচ্ছবি স্পষ্ট দেখতে পেয়েও আর কিছু আশা করে। এর বাইরে কিছু যত্ন লৌকিক-অলৌকিকের দ্বন্দ্ব থেকে দূরে। তারই অপেক্ষায় চেয়ে থাকা। তা কি জীবনেরও জীবন—যা জীবনমৃত্যুর অতীত—যার গভীর থেকে জন্ম নেয় সৌন্দর্য আর প্রেম ? তারই মুখ চেয়ে সে হয়তো একদিন মিলিটারী হাসপাতালে হঠাৎ ভোররাতে লাফিয়ে উঠে বসে বলেছিল আমাকে ছেড়ে দিন স্যার, আমি চলে যাবো। জানুতে বুলেটের দগদগে ঘা। ব্যাণ্ডেজ খুলতে অনেক দেরী। সে চিৎকার করেছিল, আমাকে ছেড়ে দিন আপনারা, আমি চলে যাবো। কোথায় যাবে তুমি ? কে যেন প্রশ্ন করেছিল সেদিন। গোবরা জবাব দিতে পারেনি। তাই তো, যাবে কোন চুলোয় ? মায়ের নামে পাঠানো মানিঅর্ডার একবছর আগে ফেরত এসেছে। ইওর মাদার ইজ নো মোর ইন দি ওয়ার্লর্ড ! ও কথার অর্থ সে বুঝতে পেরেছিল মুহূর্তেই। …আর কোথায় যাবে তবে ? মা বহরমপুর শহরের যে খুপটি ঘরখানিতে বাস করত, তা অন্যের দয়ার দান। ফিরে এসে দেখল, সে-ঘরে সাজানো আরামকেদারা, সোফা-কৌচ, গোলাকার কালো টেবিল, পাথরের উলঙ্গ মেয়েমানুষ। দেয়ালে। ঝকমক করছে শিকারী আর মরা হরিণ, বাঘ, ময়ূর আর সুন্দরীদের ছবি। মরচেধরা হুকগুলি আর দেখা যায় না। ওইখানে একটা ছবি ছিল, তার বাবার। মহাপুরুষের মতন মুখে হাসি·কশালা খচ্চর ! গাল দিত ছেলেবেলায়। মা ওকে তেড়ে আসত।

সেই ছবিটা কোথায়? সে প্রশ্ন করেছিল ফিরে এসে। জবাব পায়নি। পুরনো ছবি, সিঁদুরের ছোপে ভাঙা ফ্রেম লাল হয়েছিল, হয়তো খসে পড়েছে ঘর সাফ করার সময়, কাচটা ঢিল ছুঁড়ে কবে ভেঙেছিল গোবরা, কোণাকুণি একটা টুকরো আটকে ছিল মাত্র। হয়তো রাজমিস্ত্রীরা ফেলে দিয়েছে কোথায়। তারপর মিউনিসিপ্যালিটির মেথর এসে টবের গাড়িতে নিয়ে গঙ্গার ধারে ফেলে দিয়ে এসেছে।···তখন আশ্রয়দাতা দয়ালু মোহিনীবাবুর মাথার ঠিক পেছন দিকে পেপারওয়েট তুলে মেরে বসেছিল সে। ওইতে মোহিনী বোস দাঁত ছরকুটে পড়ে গেল। গোবরা লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। একদিন মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল তার। জগত্তারণ ভট্টাচার্য মোহিনী বোসের মারাত্মক শত্রু শুনেছিল। রাজনীতির দ্বন্দ্ব। ফিরে এল শহরে। দেখা করল তার সঙ্গে। বোল পেল। এমনি করে যেন চাবিকাঠি খুঁজে গেল আত্মরক্ষার। সেই চাবি এখনও ব্যবহার করছে। মরচে পড়ে না একটুও।···

মানুষের বুড়ো হওয়া সে অনেক দেখেছে। দেখেনি বুড়ো মানুষের স্বভাবমৃত্যুর দৃশ্য মুখোমুখি। নন্দ সরকারকে দেখতে গিয়েছিল সে। কেন গিয়েছিল? হঠাৎ নন্দ সরকার খাবি খাচ্ছে শুনে কেন বা সে কৌতূহলে অস্থির হয়ে উঠেছিল? নাকি তার পরিচিত মৃত্যুর আকৃতি প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার ইচ্ছা মাত্র?

দেখে ফিরে এল, তখন, আশ্চর্য, তখন সে অদ্ভুত ভয়ে কাঁপছে। নিথর হয়ে আসছে রক্তস্রোত। মাথার খুলির ভেতর ঠাণ্ডা হাতের থাবা পড়েছে কার।

একদিন রাতে রেললাইনে একটা লোককে শুইয়ে রেখেছিল সে। হাত পা বাঁধা, লাইনের সঙ্গে আটকানো। মেল ট্রেন হঠাৎ থামতে পারল না। অনেকদূরে গিয়ে থামল। মুখে রুমাল গোঁজা, চোখ ফেটে বেরিয়ে আসছে। ট্রেনের আলোয় প্রতিটি মুখভঙ্গী প্রত্যক্ষ করছে সে। অতি কাছে পাশের লাইনের ওপর সে বসে আছে।···মরতে এত ভয় কেন রে? সে ফিসফিস করে বলেছিল।···তারপর ট্রেনটা আসবার মুহূর্তে সে সরে এসেছিল। গলাকাটা শরীরটা, বদ্ধ পা, বিকটভাবে হাঁটু ভর করে উঠতে চেষ্টা করছে, পড়ে যাচ্ছে। কাঁপতে কাঁপতে আবার ওঠবার চেষ্টা করছে। নিষ্পলক তাকিয়ে দেখছিল সে অবিচলিত দৃষ্টিতে।

অথচ নন্দ সরকারের চোখে মুখে কি গাঢ় প্রশান্তি দেখে এল আজ! মুখ উঁচু করে দেহ সোজা রেখে সে শুয়ে থাকল! অতি স্পষ্ট কাঁপন। শব্দহীন, শান্ত, সহজ প্রস্থান। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বরণ করার মোহ দুই স্থির চোখে তার।

গোবরা আর সহ্য করতে পারল না। ছুটে পালিয়ে এল তখনই। এ অসম্ভব, এ হতে পারে না! তার মায়ের জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট লাঞ্ছনা অপমান ছিল! সেও কি মৃত্যুর সময় একান্ত কাম্যকে বরণ করার মোহ চোখে নিয়ে নিবিড় প্রশান্তিতে ঢলে পড়েছিল?...তা অসম্ভব, হতে পারে না।

সে বুঝতে পারছে এতদিনে একটা সহজ, সাধারণ, স্বাভাবিকতার কাছাকাছি পৌঁছনর চেষ্টা করছে সে নিজের অগোচরে। নিহত জননেতা তারিণী মুখুজ্জে যেন অনবরত ফিস ফিস করে বলছে, ভাবতে আশ্চর্য লাগে, ওরা আমার পথ চেয়ে বসে রয়েছে! সে-রাতে নিশি যখন এল, সে আর নিজেকে চুপ করিয়ে দিতে পারে নি। স্পষ্ট করে বলছে, তারও ওই রকম পথ চাওয়া মানুষের কথা ভাবতে ভালো লাগে। তাই কি সে নিশির পেছনে কুকুরের মতন ঘুর ঘুর করছে এতদিন ধরে? কি বিশ্রী মানুষের মন, নিজের কাছে বার বার ধরা পড়ে, তবু কি সংকোচ আর জড়তা। হাস্যকর আত্মগোপনের প্রয়াস!...এমন কপট তো সে কোনদিন ছিল না!...এই বুঝি তবে সেই ভালোবাসা, প্রেম, পীরিতির ইন্দ্রজাল! প্রেম, ভালোবাসা, পীরিতি! দেহকে দেহের অধিক মনে হয়। রক্তের হাত পেছনে লুকিয়ে পড়ে! প্রেম, ভালোবাসা, পীরিতি!

গোবরা বাঁশীটা পেড়ে নিয়ে ফুঁ দিতে হঠাৎ মড় মড় করে ভেঙে ফেলল। ভোজালিটা তক্তাপোষের নীচে আবর্জনার ভেতর থেকে টেনে বের করল। নিশির না-নেওয়া সেই বইগুলোর ওপর কোপ বসাতে থাকল উন্মত্তের মতন! তারপর টুকরোগুলো ফেলে দিল জানালার বাইরে। বাইরে জ্যোৎস্না ঝকমক করছে। ছেঁড়া কাগজগুলো সাদা পাখির ঝাঁকের মতন ছড়িয়ে পড়ল ঠাণ্ডা মাটির ওপর। নিশির বিদ্রূপের হাসিকে, তার উজ্জ্বল সাদা দাঁতগুলিকে নিঃশব্দে জ্যোৎস্নায় উন্মোচিত হতে দেখল যেন সে।

উদ্‌ভ্রান্ত গোবরা টর্চ আর ভোজালিটা নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল মেলার পেছনের দিকে। দোকানের আড়াল দিয়ে চলতে থাকল সে। নিশিদের দোকানের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হলো তার। একবার দম নিয়ে সে এগিয়ে এল। ঝোপের বাঁশে দড়ির বাঁধনগুলো ভোজালির সাহায্যে কাটতে থাকল ক্ষিপ্রহাতে। তারপর সন্তর্পণে টিনের দেয়ালটা একটু তুলে ভেতরে গলে গেল। টর্চ জ্বালল।

বিনোদিনী লেপের ভেতর ডুবে আছে। নিশি তার পাশে শুয়েছে। মুখটা একপাশে কাত হয়ে আছে তার। গলার নীচে বুকের ওপর সাদা পাথরের সেই হারটা। ঘুমন্ত বুকটা কাঁপছে তালে তালে। খোঁপাটা এলিয়ে চুলগুলো

তক্তাপোষের নীচে ঝুলে পড়েছে।

ভোজালি তুলল গোবরা। নিশির ঠোঁট কাঁপছে ঘুমের ঘোরে। স্বপ্ন দেখছে নাকি? বাইরে অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্যে একটি লোকও আজ নেই। নিঃশব্দ নির্জন হয়ে গেছে মেলা। আসর কখন শেষ হয়ে গেছে।

ভোজালি তুলে দেখল, টীনের ছাদে ঠেকে যাচ্ছে। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে হিসেব করতে থাকল সে। আর্তনাদের মুহূর্তে নিঃশব্দ করার মতন আঘাত দিতে হলে কতখানি উঁচু থেকে এই ভারী ছোরাটার কোপ বসানো যায়। না, কষ্ট দেবেনা নিশিকে। ও যে পীরিতের মেয়েমানুষ! সে-রাতে সারা মেলা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল বৃষ্টিতে ভিজে—আর পেছনে নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করছিল গোবরা, নিশি জানে না। আচমকা ভয় দেখাতে ইচ্ছা করছিল, পারেনি। তাহলে তো সঙ্গে এসে পাতে বসতে হয়! রক্ষিতা মেয়েমানুষের প্রাপ্য আদর আর ভালোবাসা দিতে হয়। তা কি পারা যায়—নিশিকে?

টর্চ নিভে গেল, হঠাৎ আঙুল বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু কি লাভ গোবরা হাড়ির? এতদিন যতগুলি হত্যা সে করেছে, লাভালাভ বিচার করেনি। এ মুহূর্তে লাভের প্রশ্ন হুড়মুড় করে বসে মুখোমুখি তাকাচ্ছে। কি লাভ? চারপাশ থেকে নির্জন শব্দহীন মেলা তাকে এই প্রশ্নের হাত বাড়িয়ে ঘিরে ধরছে। গোবরা, তোর লাভ কি?

গোবরা দেখল এতদিন পরে জীবনে সে একটা চরম পরীক্ষার মুখোমুখি হচ্ছিল। এই হত্যা সাঙ্গ করতে পারলে তার দায়িত্ব মোচন হতো।

কিন্তু এতদিন সব হত্যা সে নিজেকে বাইরে রেখে সাঙ্গ করেছে। জড়িয়ে পড়েনি।

আর আজ এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সে ঘোরতর লিপ্ত হয়ে পড়ছে। জড়িয়ে পড়ছে হননের রক্তে, আর্তনাদে, মাংসের ফাটলে, যন্ত্রণায়। সে নিজেকে এই উপসর্গগুলো থেকে আগের মতন মুক্ত রাখতে পারছে না।

সুতরাং ফিরে আসতে হয়। বেরিয়ে এসে ফের দড়িগুলো যথাযথভাবে বেঁধে ফেলতে হয়। আর বাইরের ফাঁকা জ্যোৎস্নাময় মাঠে দাঁড়িয়ে মনে হয়, বুক হাল্কা হয়ে গেছে। একটা গুরুতর দায়িত্ব তার কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সে অস্বীকার করার ক্ষমতা অর্জন করল এতদিনে।

অপরূপ প্রফুল্লতায় প্রসন্নতায় গোবরা হাড়ি হন হন করে হাঁটতে থাকল নিজের ঘরের দিকে। বল্লাসামলানো হাতের প্রতি সাহসী চোখে তাকাচ্ছিল সে। মত্ত ঘোড়াটা ছেড়ে দিল যেন মাঠে—এতদিনের বিব্রত ঝাঁকুনি লাগ

সওয়ারীপনা থেকে রেহাই পেয়ে গেল। এবার নিজের পায়ে হাঁটতে চেষ্টা করবে সে।

॥ চৌদ্দ ॥

রোদে বেঞ্চের ওপর শুয়েছিল বিনোদিনী। জ্বর ছাড়ে নি। তাই রোদ বেশ মিঠে লাগে। সে শুয়ে শুয়ে তার টাটে বিব্রত নিশিকে দেখছিল। মশলাপাতি ফুরিয়ে এসেছে। সিগ্রেট-পান-বিড়ির অবস্থাও তাই। নারকেল-বাড়ির বরজ থেকে যে লোকটা এখানে পান যোগান দ্যায়, সে অবশ্য প্রতিদিন এসে খোঁজ নিয়ে যায়। বিনোদিনী বলে, এখন থাক্। পরে নেবো। ফরিদ বিড়িওয়ালাকেও ওইরকম বলা হয়েছিল। আর প্রতিটি জিনিসের যোগানদার তো আজকাল কম নেই। দোকানে বসে সব মেলে। শহর থেকে লোক আসে রিকশোয় মাল চাপিয়ে নিয়ে। এসে দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়ায়। আগের দিনে বিনোদিনী নিজে যেত, নয়তো কাকেও টাকা দিয়ে পাঠাত মাল আনতে। আজকাল কত সুবিধে।

কিন্তু দোকান অচল হতে চলেছে, তবু মনের দিক থেকে সাড়া নেই। চোখের ওপর যেমন নিজের জীবনকে ক্ষয় হতে দেখল, এখনও তাকিয়ে তাকিয়ে যেমন দেখছে, তেমনি এই দোকানটা আস্তে আস্তে শূন্য হয়ে যাচ্ছে। আর মনে হচ্ছে এই শূন্যগর্ভ হওয়ার পেছনে তার কোন হাত নেই। মনে হচ্ছে—টাটে বসাটা ক্রমশ উদ্দেশ্যহীন হয়ে উঠল। বিনোদিনী শুয়ে শুয়ে এইসব ভাবছিল।

নিশি অমনোযোগে কিছু লক্ষ্য করে নি। এতদিনে লক্ষ্য করে সে ভুরু কুঁচকে মেলার চারপাশে তাকাচ্ছে। অর্ডার সাপ্লাইয়ের রিকশোগুলো হয়তো এসেছিল, কখন চলে গেছে। সে মশলার কৌটোর ঢাকনা খুলছে, সিগ্রেটের বাক্সো উবুড় করে ফেলছে, কাঁচবসানোর টিনের ভেতর বিড়ির ভাঙ্গা টুকরোগুলো সন্তর্পণে তুলে ফেলছে। নিপুণ গিন্নিপনা তার চালচলনে।… হতভাগী মেয়েকে আস্তে আস্তে গিলে ফেলেছে মেলার রাক্ষসটা।

নিশি বিনোদিনীর শুয়ে থাকা দেখে বলল, রোদ লাগিও না। জ্বর বাড়বে। ওবেলায় ওষুধ এনে দেব, খেও।

কর্ত্রীঠাকুরাণীর কণ্ঠস্বর! বিনোদিনী চুপ করে থাকল। ওষুধ আনলে কি

হবে? ওষুধ সে কোনদিনই খায় না। এ তার চিরকেলে ভালুকজ্বর। হুট করে আসে, হুট করে যায়। কিন্তু এবারের জ্বর শরীরকে শিলনোড়ায় মশলাগুঁড়ো করে ফেলেছে যেন। গায়ে-গতরে খুবই ব্যথা। নড়তে কষ্ট হয়। লোচনের সঙ্গে চলে গেলেই ভালো হত। দেবতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে—কতদিনের সাধ।…দেবতাকে অগ্রাহ্য করা নয় শুধু, সারা ভুবনপুর, তার পরিচিত পৃথিবী—সর্বত্র বিনোদিনী কী ছোট হয়ে গেছে! লোকে হয়তো বলছে, ওর আবার জাতটাত আছে নাকি? ও ক্রেস্তান নয়তো মুসলমান, ছত্রিশ জাতের গায়ে গা মিশিয়ে জীবন কাটিয়েছে! বেশ্যারা যেমন ব্রত করে, তেমনি ওর ঠাকুরঘর করা। অথচ লোচন জানে না, নিশি জানে না, কেউ জানতে পারল না—বিনোদিনী মনে মনে শ্যামঠাকুরের চরণে মুহূর্তে মুহূর্তে কত গোপন কান্না কাঁদছে সেদিন থেকে।…এ আমার পাপ, আর কারুর নয়। যত শাস্তি দিতে হয়, আমাকে দিও, ওই অবোধ কচি মেয়েটাকে নয়। মহাদেব ঠাকুর সেদিন এসেছিল। সব শুনে তিরস্কার করছিল সে। প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিচ্ছিল। মানুষের জীবনে এ পাপের তুল্য নেই। তুমি কি নাস্তিক হয়ে গেলে বিনোদ? সাতকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছো, এখনই তো মানুষের ভগবানের দিকে মুখ ফেরানোর সময়! আর শ্যামচাঁদ পৃথিবীতে নররূপী ভগবান। ওই ভুবনপুরেই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুন্দর কাহিনী আছে একটা।…শ্যামচাঁদ তখন যুবাপুরুষ। নসীপুরে রাস-পূর্ণিমায় ঝুলনযাত্রার উৎসব। বৃদ্ধা মা, ঘরে রুগ্না হয়ে শুয়ে আছে।…ওরে শ্যামচাঁদ, আমার বড় সাধ ছিল বাবা, প্রভুকে দর্শন করে আসি। সারা জীবন ধরে দর্শন করছি—কোন বছর বাদ পড়েনি। এবার যে পারছিনে!…শ্যামচাঁদ বললেন—মা, তুমি চোখ বোজ। মা চোখ বুজল। শ্যামচাঁদ ফের বললেন, মা, এবার তুমি খোলো। মা চোখ খুলল। আর একি দেখল সে…তারই ঘরের মধ্যে নবদূর্বাদলঘনশ্যাম বিপিন-বিহারী নন্দকিশোর অধরে মধুর হাসি, হাতে মোহন বেণু, মাথায় চাঁচরচূড়া, পরনে পীতধরা,…সেই বৃন্দাবন কানন, ধীরপ্রবাহিনী যমুনা, তমালকদম্বতরু, ফুল্লজ্যোৎস্নাময় রাত…যেদিকে তাকায় দ্যাখে লীলাচঞ্চলা বলিব্যাকুলা গোপিনীরা!…মা চীৎকার করে উঠল। দুহাতে চোখ ঢাকল। শ্যাম, শ্যামচাঁদ, আর না বাবা, আর না!…সে কি মা?…হ্যাঁ বাবা, আমি তোকে দেখতে চাই। দুঃখিনী মায়ের ছেলে সেই শ্যামাকে।…রাস দেখবে না?…আমি তোকে চাই। তোকে দেখব শুধু।…কিন্তু আর তো তা হয় না। বাসনা তো নিক্ষিপ্ত শরের মতন। ফিরিয়ে আনা যায় না। যে বাসনা একবার করেছ, আর ফেরাবে কেমন

করে? বাসনা তোমার কালের পথে চলে গেছে তার লক্ষ্যে।…মায়ের বুকফাটা কান্নায় গোপিনীরা চলে গেল, যমুনা শুকিয়ে গেল, চাঁদ তার জ্যোৎস্না নিয়ে ক্ষয় হলো…কোথায় সে লীলাময়তা, উৎসবচঞ্চলতা, বংশীধ্বনি,…সকলই হারাল। কেবল রইল ওই অপরূপ মূরতিখানি। মা মুখ তুলে অশ্রুজলের মধ্যে দেখল প্রস্তরীভূত দেবতাকে, তার আদরের ধন একমাত্র পুত্র শ্যামা নিষ্পলক মধুর হাসিটি মাত্র অধরকোণে রেখে স্থির হয়ে গেছে। অন্যরূপে অন্য মহিমায় লীন হয়ে গেছে সে। আর পাথরের বুকে মাথা ঠুকে ঠুকে রক্তাক্ত শরীরে লুটিয়ে পড়ল মূর্ছিতা হতভাগিনী মা।—সে শুধু তার ছেলেকে ফিরে চাচ্ছিল। দেবতাকে নয়। সে মূর্ছা আর ভাঙেনি।

তাহলে দ্যাখো, বাসনাবাণ ফেরানো যায় না।

কিন্তু ঠাকুর, একটা প্রশ্ন করি। মায়ের কি পাপ হয়েছিল? মা কি নরকগামিনী হলো তাতে?

এ বড় দুরূহ প্রশ্ন বিনোদ। এর জবাব দেওয়ার সাধ্য মানুষের নেই। কিসে পাপ কিসে পুণ্য কোনদিনই মানুষের জানবার কথা নয়।

বিনোদিনী চুপ করেছিল। মহাদেব ঠাকুর ফের বলেছিল, ওই হয়। মানুষ যে আসলে কত ছোট্ট, তার প্রমাণ ওই দ্যাখো, ওই কাহিনী! ঈশ্বরকে মুখে চায়, মনে নয়। কেন? না, ঈশ্বর এত বড়ো, তা ধারণ করার শক্তি মানুষের তো নেই। যদি দেখবার ভাগ্য কখনও হয়, সে সইতে পারে না। অদেখা অধরাকে দেখলে ধরতে পারলেই তা নিমেষে তুচ্ছ হয়ে ওঠে তার দেখা আর ধরা জিনিসগুলোর পাশে। মানুষ মাঝে মাঝে ভগবানের সঙ্গ চায়, সব সময় নয়। কারণ সে হাঁফিয়ে ওঠে। এ পাপ মানুষের জন্মগত। বিরাট মাঠের মধ্যিখানে যেতে যেতে তুমি কেবল ভাবো, কত শীগ্গীর গাঁয়ে পৌঁছবো! মানুষের রক্তে আছে ক্ষুদ্রতার বীজাণু। সে খুবই সংকীর্ণ, বিনোদ। কিন্তু… কিন্তু মাঝে মাঝে আমি একটা ভাবি।…বাৎসল্য বড়ো না ভগবৎপ্রেম বড়ো? আমার কোন সন্তান নেই। ঘর নেই। স্ত্রী নেই। একদিন সকলই ছিল। সংসারের সকল স্বাদ আমি পেয়েছিলাম। আজ মাঝে মাঝে শুধু ওই প্রশ্ন ওঠে। আমি বিব্রত হই তাতে।…বিনোদিনী বিস্মিতভাবেই তাকিয়েছিল তার দিকে।…. ওই নরকের চেলা পাপিষ্ঠ গোবরাটা আমাকে কম বিব্রত করে না বিনোদ। জানি, তার হাতে মানুষের রক্ত, সে যখন আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাবা বলে ডাকে, আমার সব গোলমাল হয়ে যায়। আমি তখন বুঝতে পারি, ওর ডাক, মুখের হাসি, উপস্থিতিটা আমাকে কুয়োর মধ্যে গড়িয়ে ফেলছে। অথচ আমি

অসহায়। কিছুতে আটকাতে পারছিনে নিজের পতনকে। ওই পতনের স্বাদে সর্বাঙ্গ শিউরে উঠছে। বাবা!···একদিন এমনি ডাক আমি শুনেছি। সেই শোনার শক্ত বাঁধন আজও কাটল না। আমিও কম হতভাগা নই, বিনোদ!

বিনোদিনী আস্তে আস্তে বলেছিল, আমারও! ঠাকুর, আমারও!

আজ থেকে কতবছর আগের কথা। স্বপ্নের মতন দূর ধূসর মোহময়। আটমাসের গর্ভিণী বিনোদিনী! রূপপুরের মেলায় দোকান খুলেছে। লজ্জার কথা, ওই দোকানেই অকালে প্রসব হলো মেয়ে। খবর পেয়ে মন্মথ এল সঙ্গে সঙ্গে আর সেবার শীতের মেলায় তিনদিন ধরে বৃষ্টি। মেলা নির্জন ছিল। মন্মথ ভালোমানুষের মতন তার সেবাশুশ্রূষা করল। ধাই ডেকে আনল। রাতে শুয়ে থাকল। বিনু, তোমার চাঁদমুখের ছাপ পড়েছে এমুখে, দ্যাখো। বিনোদিনী দেখেছিল একবার। অথচ বিপদের রাতে কালঘুম চোখে জড়িয়ে আসে। শোবার সময় যখন বলল, বিনু, তোমার আসন ফাঁকা যাবে না আরেক বিনোদ টাটে বসবে। কি কপাল তোমার! বিনোদিনী শুধু বলল, আগে বাঁচুক। ওকে আমি লেখাপড়া শেখাবো ইস্কুলে। মন্মথর কুটিল হাসিটা সে দেখতে পায় নি! বিপদের রাতে কালঘুম চোখে আঠা মাখিয়ে দ্যায়। চেতনা হারায় দেহ। সকালে বিনোদিনী হাহাকার করে উঠেছিল শূন্য কোল দেখে। মন্মথ একদিনের মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে। আর জীবনে দেখা হলো না মন্মথর সঙ্গে। খোঁজখবর নিয়েছিল লোচনকে পাঠিয়ে। লোচন ফিরে এসে বলল, মেয়েটা যে রাতে নিয়ে গিয়েছিল, সেই রাতটা পোহানোর আগে পুলিশ বাড়ি ঘিরে ওকে ধরে নিয়ে যায়। ডাকাতের মামলায় আসামী ছিল। আর মেয়ে? তার কোন পাত্তা নেই। পাত্তা গেল আরও একদিন পরে। উত্তর সীমান্তে পদ্মার তীরে গাড়োয়ানরা কবাট চৌকাট নিয়ে মেলায় আসছিল। হরিণপুরের ব্রীজের কাছে একটা বাচ্চার মুণ্ড গাড়ীর চাকায় থেঁৎলে যায়। ধুলোয় বৃষ্টি পড়ে কাদা জমেছিল। কাদায় পোঁতা ছিল সেটা! পুতুলের বেশী বড় নয়।···আরও অনেক খবর আনল। মাথাটা কুকুরে টানতে টানতে জঙ্গলের দিকে নিয়ে গেছে। ধড়টা এখনও দেখা যেতে পারে।··· বিনোদিনী চুপ করে বসে থাকতে পারে নি। রিকশো করে অসুস্থ শরীরে চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করতে গেল মাত্র। নাঃ, আর কোন চিহ্ন নেই। থলথলে কিছু রক্ত চাকার দাগে পড়ে আছে মাত্র। জঙ্গলটা ভাইবোনে তন্নতন্ন খুঁজেও মুণ্ডুটা পাওয়া গেল না। বিনোদিনীর মেয়ে না হতেও পারে। কিন্তু কি দুঃখ, পেটের মেয়ে এত নেমকহারাম দ্যাখো, স্তন থেকে ছাড়িয়ে নিলে, অথচ কাঁদল না! বাপকে

দেখে বুঝি ভুলে গেল কাঁদতে। নাকি কালঘুম চোখে নেমে ছিল। মন্মথর শয়তানী থেকে বাঁচতে পারলনা—এই খেদ বুকে কুরে কুরে শব্দ করে পোকার মতন। নিশিরাতে শব্দ ফোটে।

তারপর লোচনের বৌ সুবাস প্রসব করল নিশিলতাকে। বিনোদিনীর মন ভরে নি তাতে। মন কি ওই দিয়ে ভরে? সুবাস মরে গেলে সে ভেবেছিল নিশির কথা। কিন্তু বড় ভয়, মন্মথ ফিরে এসে আবার যদি ওকেও মেরে ফেলে! নিশি অনাদরে বেড়ে উঠেছিল। তবু পারল না বিনোদিনী। মন্মথ কবে ফিরে এল জেল থেকে। লোকমুখে শুনল। আর এ কী ফেরা! নাকি পথে পথে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। পরনে চটের টুকরো। বিড়বিড় করে কী বলে। শিশু কোলে দেখলে হাততালি দিয়ে হা হা হাসে। বলে—পালা পালা, গাড়ি আসছে! থেঁৎলে দেবে। লোকমুখেই শোনা, মন্মথ গলায় দড়ি বেঁধে গাছে ঝুলেছিল। বিনোদিনী তখন বলেছিল—পাগল না তো, সেয়ানা পাগল। পাগল কখনো গলায় দড়ি দিয়ে মরে না। উঃ, বাঁচলাম জন্মের মতন।

মন্মথ মরে গেলেও নিশির ওপর ওই ধরনের আকর্ষণটাও কেন কে জানে মরে গেল নিঃশেষে। কেবল দেখাশোনা-খবরদারীটাই করত সে। আজ নিশি যুবতী মেয়ে, আজ তার ভুলুণ্ঠিত টাটটাকে তুলে ধরতে যাচ্ছে যোগ্য মর্যাদায়! তবু মন ভরেও ভরে না। একটা ফাঁক থেকে যায় কোথায়।

বেঞ্চে রোদ কড়া হয়ে এল। গায়ে ঘাম জমছে বিন্দুবিন্দু। জ্বর ছেড়ে গেল নাকি? বিনোদিনী দেখল, নিশি নতুন করে টাট সাজাচ্ছে। ন্যাকড়ায় ছবি মুছছে, জায়গা বদলে দিচ্ছে। নেমে এসে দূরে দাঁড়িয়ে একটুখানি দেখছে। ফের গিয়ে জায়গা বদলাচ্ছে।

ছোট্ট কাঠের বাকসোয় পয়সা রাখা হয়। নিশি বাকসোর ডালা খুলে পয়সা গুনছে এবার। বেচাকেনা একেবারে বন্ধ প্রায়। এতদিনের বেচাকেনার টাকা ভেতরে বাকসে রয়েছে! আরও কিছু পুজি অবশ্য আছে! যা জমিয়েছিল সারাজীবনে, সবই লোচনকে ঘর-দোরের জন্য দিয়েছিল বিনোদিনী।

নিশিকে পয়সা গুনতে দেখে এবার বলল— কি হবে রে?

নিশি চোখেচোখে তাকিয়ে বলল, দরকার আছে। টাকাপয়সাগুলো কোথায় রেখেছো? দেখছিনে যে?

বিনোদিনী হাসবার চেষ্টা করে বলল, ভেতরে বাকসোতে। কিন্তু টাকা কী হবে?

নিশি গম্ভীর মুখে বলল, মাল মশলা কিনতে হবে। সব ফুরিয়ে গেছে।

বিনোদিনী উঠে বসল আস্তে আস্তে। নগদ দাম না দিলেও চলে। বিক্রী করে দিতে হয়। চেনাজানা আছে তো!

তা নয়। নিশি নগদানগদি কারবার করবে। কারুর সাতেপাঁচে নেই সে। কেউ টাকার জন্যে এসে ধর্না দেবে, সেটি হবে না। তুমি বিনোদিনী, অনেক লীলা জানতে! চোখের ঠারে মুচকি হাসিতে, অনেক দাম হয়তো শোধ করেছো। আমি নিশি, নিশিলতা, আমার রক্তেমাংসে অন্য ধাতু আছে।

সত্যিসত্যি ভালুক জ্বর। বিকেলে বেশ শক্ত সমর্থ মানুষ, টাটেই সারাক্ষণ বসে আছে। খদ্দের এলে কথা বলছে। বলছে, কাল এসো বাবা, কাল। মোহিনী পান, রজনী পান, কামিনী ভুলানো, মুখরঙ্গিনী, মুখবিলাস—সব পাবে। নিশি কান পাতে। কত নাম বানিয়েছে, কত চালাকী জানে পিসি! রঙ সুপুরী, মিষ্টি খয়ের, পিপারমেণ্ট আর দুচার রকম মশলার এদিক ওদিক করে নামের ফিরিস্তি সাজায়। পানে মোদক দিয়ে বলে, মোহিনী পান। কড়া জর্দাও মেশায়। তবে চুন খয়েরের অনুপানে একটু হাতের কায়দা রয়েছে। ওইটি শিখলেই সব শেখা শেষ। রাঁধুনীর হাতের যেমন মহিমা, এতেও তো তাই!…ও সব শিখে ফেলবে নিশি! পাপিষ্ঠ গোবরাটা এলে আগে তার ওপরেই পরীক্ষাটা হয়ে যাবে একহাত।

সুতরাং নিশি বিনোদিনীর গায়ে হাত রেখে জ্বর পরীক্ষা করে বলল, কাল মাগুর মাছের ঝোল করে দেব। ভাত খেও। আজ এবেলা পাঁউরুটি আর দুধ এনে দিই।

পাশে বসে খাওয়াল সে। বিনোদিনী কচি মেয়ের মতন মুখ নেড়ে গিলছে। গিলতে গিলতে চোখে জল আসে। চতুর নিশির চোখ এড়ায়নি, ও পিসি তুমি কাঁদছো? বিনোদিনী চোখ মুছে বলল, না তো। কাঁদবো কেন মা? বুড়ো বয়সে তোর সেবা পেলাম, ভাগ্যি। কে পায়!

একটুখানি চুপ করে থেকে নিশি বলল, তুমি অন্তত একবেলার জন্যে ভুবনপুরে ঘুরে এস পিসি।

কেন রে?

ঠাকুরকে প্রণাম করে এসো। নৈলে অমঙ্গল হবে!

হঠাৎ নিশিকে অবাক করে বিনোদিনী হেসে উঠল। মুখের খাবার ছিটকে পড়ল। •কি হবে রে? নরকবাস? এ্যাঁ? নিশি, সংসারের নরকে সারাজীবন পুড়ছি, বিধাতা আর কি পোড়াবে, মা? এখন এ নরক থেকে যত তাড়াতাড়ি বাঁচি, সেই পথে তাকিয়ে আছি।

পিসি! নিশি অস্ফুটকণ্ঠে বলল। একি কথা বিনোদিনীর মুখে! গোবরা হাড়ির কণ্ঠস্বর অবিকল। অবিকল ওই কথা। ওই ভঙ্গী! ওকথা বলো না। পাপ হবে। নিশি বিড়বিড় করে উঠল। তোমাকে আমি পাঠাবোই।

বিনোদিনী চুপ করে থাকল।

॥ পনেরো ॥

ভুবনপুরের ঠাকুরঘর, শ্যামচাঁদ, সকলই কি শুধু মুখের সাধ তবে? মনের নয়? এ মেলায় আসবার দিন কল্পতরু বটের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পিসি কী ইচ্ছে করেছিল জানতে সাধ হয় বড্ড।

মেলাচর মানুষগুলি কেমন অদ্ভুত যেন। সংসারে মানায় না ওদের। ওই বুড়ো ফজল চাচা নমাজে বসে কাঁদে। ও কান্নার অর্থ মেলাচর ছাড়া আর কেউ হয়তো বোঝে না। না ঘাটের না ঘরের, ভাসমান জীবন, পরগাছার মতন গাছ থেকে গাছে, তাদের ঈশ্বর অন্য ঈশ্বর। অবোধ মন সাধ করে সংসারী মানুষের ঈশ্বরের কাছে মন নিবেদন করতে চায়। আসলে বিশ্বাসই নেই। ও শুধু সাধ মেটানো।

সকালে নিশি বেরিয়ে গিয়েছিল কোথায়। ফিরে এসে বলল, বাব্বা, কি দেশ! একখানি গাড়ির জন্যে কতজনকে বললাম, সবাই মুখে বলল, দেখে দিচ্ছি, দাঁড়িয়ে থেকে আমার পা ধরে গেল। কেউ ফিরল না।

বিনোদিনী বুঝতে পেরেছে। নিশির কথা সহজে কেউ শুনবে না। অক্ষম ঈর্ষায় সব জ্বলছে মনে মনে। এমনি করে তার জন্যও কত জ্বলেছে। শেষে ভুবন-ভুলানো অপরূপ হাসি, মিষ্টি কথা, একটু তোয়াজ, ব্যাস্ সব সুড়সুড় করে পায়ের চাকর নেড়ীকুত্তার মতন লেজ নেড়েছে। নিশি যে তা জানে না! জানলেও, তা করবে না, যে জেদী মেয়ে। নিজের প্রতি যেন সবসময় সতর্ক। তাই গোবরার মতো লোককেও ভয় করে না সে। কথা শুনিয়ে দ্যায়! ওই করে কি কাজ পাওয়া যায় কারুর কাছে।

তবে বিনোদিনীর ক্ষেত্রে নন্দ সরকার ছিল। তার গোঁসাই ছিল। আরও অনেক নামজাদা পুরুষ ছিল। বাজে লোককে অনুরোধ করার দরকার হয়নি মোটে।

নিশি গোবরার কাছে যাক্ না। উচ্ছেদের নোটিশ পেয়ে যেমন সে-রাতে গিয়েছিল! বিনোদিনী মুখে বলল, নিশি, গাড়ি-গাড়ি করে বেড়াস্ নে বাছা, থাক্। যখন যাবার ভাগ্যি হবে, ঠাকুর ঠিকই আয়োজন করে দেবে।

কতকটা সেইরকমই হয়ে গেল যেন। নন্দ সরকার যা করত, গোবরা কোন মুখে তা না করে পারে! গরুগাড়ি নয়, তেজী মোষের গাড়ি। নিশি তার কাছে যাবার কথা মনেও ভাবেনি, অথচ তার আগে সে নেপথ্যে সব প্রস্তুত করে পাঠিয়ে দিয়েছে একেবারে। কে পাঠাল গাড়ি?

বিনীত গাড়োয়ান নম্রকণ্ঠে বললে, গোবর্ধন বাবু।

কার গাড়ি?

রানীচকের মাখন ঘোষের।

কে মাখন ঘোষ?

বিনোদিনী জবাবটা দিল, মাখন ঘোষের নাম শুনিস্ নি? সেই পোড়াকায়েত বলে নামডাক? সোমত্ত সুন্দরী বৌ চিতেয় উঠেছে, অমনি পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেখানে। পুড়ে গতর-মুখ সব কুচ্ছিত হয়ে গিয়েছিল। তাই লোকে বলে, পোড়াকায়েত। আসলে ওটা হচ্ছে, মাগপোড়া কায়েত। সেটা তো সবটা বলা যায় না, তাই পোড়াকায়েত।

এত বৌপাগল হতভাগা আবার গোবরার সঙ্গে জুটল কি করে? নিশি বিদ্রূপে হেসে উঠল!

কি আপদ, গোবরার দোকানের পেছন থেকে উদয় সঙ্গে সঙ্গে। সর্বচর একেবারে। বলল, জোটে। নৈলে ভুবনপুরের ধোয়াফুলটি গোবরার জন্যে? মেলায় পড়ে থাকে কী জন্যে? কেন বা বৃষ্টিকাদায়··

রেগে নিশি কী বলতে গিয়ে খিলখিল করে হেসে ফেলল! বেহায়ার ওপর রাগ করে লাভ নেই। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, কত ভাড়া দিতে হবে গাড়ির?

গোবরা বলল, ভাড়া না দিলেও চলে। আমার বলে দেওয়া গাড়ির ভাড়া কোন কালেই লাগে না, তা তো ভালোই জানো! তবে ওকথা জিগ্যেস করছো কেন?

নিশি বেঁকে বসল। না। বিনিভাড়ার গাড়িতে পিসি চাপবে না।

গোবরা আরো এগিয়ে এসে বলল, ভাড়া নয়, বরং দুটো টাকা ওই গাড়োয়ানটাকে দিও। শালা মাগপোড়াটা তো একটা কানা-কড়ি ওকে ঠেকাবে না! আমার কথায় যাকে সামনে পেয়েছে, ধরে এনেছে। হয়তো ঘরে

ছেলেপুলে রয়েছে বেচারার, আসতে যেতে সারাটি দিন যাবে। আর কিছু খোল কেনার পয়সাও দিতে পারো। রাক্ষুসে মোষ, পাহাড় গিলে খায়। গাড়িতে এক বোঝা খড় তুলে দিয়েছি কায়েতের খড়ের পালা থেকে।

একসময় বিনোদিনী গাড়ি চেপে বসল। বলল, তুইও সঙ্গে গেলে পারতিস নিশি। গোবর্ধন দোকান দেখবে।

নিশি নাক খুটতে খুটতে বলল, ভুবনপুরে? কপালে থাকলে যাবো, দিদি। ভেবো না। তুমি তো ঘুরে এসো একবার।

গোবরা বলল, সেকি? নিশি যাবে না?

না।

একা থাকবে মেলায়?

কেন? তুমি তো আছো। নিশি মুখ ফিরিয়ে বলল।

গোবরা বলল, তা আছি। কিন্তু·

কিন্তু কী?

কিছু না। থাকতে চাও, থাকো। গোবরা চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

বিনোদিনী বলল, যাবো আর আসবো। ভাবিস্ নে মা। শুধু প্রণাম করে চলে আসবো। দেখবি, ভোরে কাককোকিল ডাকবার আগেই পৌঁছে গেছি।

নিশি গাড়িটার চলে যাওয়ার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল। সেও যেতে পারতো। কিন্তু যাবার পথে কাঁটা পড়ে গেছে যেন। সহজপথে আর কোনদিন যাওয়া যাবে না। কলঙ্কিনী নিশির মুখ দেখবার জন্যে হয়তো ভুবনপুরে অস্থির প্রতীক্ষা সুরু হয়ে গেছে এতদিনে। তার কানকাটা সৎমাও তাকিয়ে আছে। নিশির বড় ভয়—গেলে আর তার আসা হবে না। কে যেন হাত বাড়িয়ে আছে ধরবার জন্য।

গাড়ি তো চলে গেল গন্তব্যস্থানে। উত্তরপ্রান্তে ওই কল্পতরু বটগাছটা যদি হঠাৎ নির্মূল হয়ে যায়—যেমন শূন্য আর রিক্ত দেখাবে সারা মেলা, প্রাঙ্গণ, রুদ্রদেবের মন্দির, তেমনি একটা শূন্যতা নিশির চারপাশে তখন ঘিরে ধরল।

যেন ছায়াবিহীন রুক্ষতার মধ্যে নিজেকে বড একা মনে হয়। মাথায় অনন্ত নীল মহাকাশ, রোদ খুবই উজ্জ্বল, প্রান্তরে বসে আছে কি প্রতীক্ষায়। •

ভুবনপুরে লোচন ছিল মাথার ওপর ছায়া বিস্তার করে। যত দূরেই থাক্, তবু ছিল তো! রানীচক মেলায় যখন এল তখন বিনোদিনী কল্পতরু বটের মতন ঘিরে ধরেছিল নিশিকে।

রোদ আছে, বৃষ্টি আছে, আছে ঝড় বজ্র শিলাপাত। তাই আশ্রয় ছাড়া কেউ বাঁচেনা। ওটা মাটির মতন কঠিন একটা আশ্রয়—যার গভীরে রোপিত মূল-জীবনকে সোজা রাখে।

একটি বেলার জন্যে গেছে, অথচ মনে হয় কতযুগ আগে। সময় কাটে না। নিশি বিকেল অব্দি শূন্যমনে শুয়ে রইল। টাট সাজানো হয়ে গেছে। মাল-মশলায় ফের পূর্ণ হয়ে উঠেছে দোকানটা। খদ্দেরও সাড়া দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নিশি ঝাঁপ খোলে না। পিসিকে যে সে এত ভালবেসে ফেলেছে, একটুও বুঝতে পারেনি এতদিন! এখন তার মন কেমন করে। নানা দুর্ভাবনায় অস্থির হয়। সন্ধ্যা অব্দি ঠাণ্ডা লাগিয়ে এল বাইরে, সারারাত জ্বরের মধ্যে কেশেছে, পথে বেড়ে গেল না তো অসুখ? যদি আবার জ্বর আসে, গাড়ির ভেতর চুপ করে শুয়ে থাকবে। মাথা টিপে দেবার কেউ নেই। জল চাইলে গাড়ির চাকার শব্দে গাড়োয়ান শুনতে পাবে না হয়তো!

সন্ধ্যার ছায়া রোদের বিকেল মুছে দিল। আলো জ্বলল মেলায়। শুয়ে শুয়ে সে কল্লোলিত মেলার চপলতা অনুভব করছিল। মাইকের গানের গর্জন, নাগিন-বাঁশির সুর, শিশুর কান্না, নাগরদোলায় পাক গুনছে এক-দুই-তিন-চার ···শুনতে শুনতে নিশির মনে হলো কি যেন চোখের ওপর অবহেলায় হারিয়ে যাচ্ছে। কেউ এসে তাকে বলছে না—এই নিশি, ওঠ এখনও শুয়ে আছিস? বাইরে দেখে যা···

যেন কেউ তাকে ডেকে দেবে, এই প্রতীক্ষায় নিশি ক্রমশ অস্থির। দোকানের পেছনে পায়ের শব্দ শুনলে সে উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে। কেউ আসুক। এসে বলুক, ও নিশি, ওঠ তো! লেবুতলার মোহন হোক্‌না সে, ক্ষতি নেই। পাগলী মেয়ে সাবিত্রীও আসুক, কানের দুলটা রাখা আছে, পরিয়ে দেবে। গলার হারটা নিজের পছন্দ বলে নিয়েছে। চাই কি তাও খুলে তার গলায় পরিয়ে দেবে।···নয়তো আর কেউ আসুক, পিসির কোন চেনা মানুষ।

চেনা মানুষ আসছে বাইরে। কিন্তু ওকি কথা? পিসি, বিনোদপিসি! দোকান বন্ধ কেন? না—নিশিকে যেন আজ কেউ চেনে না। এমনকি যদি লতিফ ঠিকেদার এসে ডাকে, ওগো নতুন মানুষ, নতুন হাতের পান দাও দিকি··· নিশি ধুড়মুড় করে উঠবে!

মেলাটা যেন কখন অজ্ঞাতসারে তার বাইরে সরে গেছে। নিতান্ত পরের মতন, দূরের দৃশ্যের মতন। যেন কোন তীর্থে কি উৎসবে যাত্রার লোকারণ্য থেকে কখন সে পিছিয়ে পড়েছে, কোলাহল কানে আসে, তবু পথ খুঁজে পায় না।

আর কি অভিমান, কি দারুণ অভিমানের আবর্ত বুকে ঘুরপাক খায়। কণ্ঠনালী কাঁপে। নাসারন্ধ্র কাঁপে। আয়ত্তের বাইরে থেকে নিজের চোখের কোণে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে দ্যাখে নিশি। এ মেলায় তার মুখ চেয়ে কেউ বসে নেই। কেউ ভাবে না, সেই নতুন মানুষটি কই? সেই নতুনের সবটুকু নতুনত্বকে গোবরাহাড়ি যখনই ঘিরেছে, সবাই ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেছে।

বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল নিশি। বাইরে আসর থেকে গানের সুর ভেসে আসে। রাত গভীর হতে থাকে। চিৎকার ঝিমিয়ে আসে। কেবল কোন মাতালের জড়িত কণ্ঠস্বর—হয়তো জুয়াড়ীদের জুয়ার আড্ডা থেকে ভেসে আসে: এ ভরা যৌবনজোয়ারে, মানে কি মানা মন বঁধুয়ারে।

তখন নিশি উঠল।

বালতিটা বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে মুখ ধুলো। আসর শেষ হয়ে গেছে। সামিয়ানার নীচে একটা মাত্র ডেলাইট রেখে বাকিগুলি সরিয়ে নিয়ে গেছে। পরিত্যক্ত আসরের তক্তাপোষে কারা ঘুমোচ্ছে বিশৃঙ্খলভাবে—হয়তো দূর গ্রামের মানুষ। ভোর হলে ফিরে যাবে ঘরে। একটা কুকুর কী শুঁকে শুঁকে ঘুর ঘুর করছে—তার ছায়া বিরাট হয়ে নড়ে বেড়াচ্ছে মেলার মাঠে। আম-বাগানের ওদিকে প্রোফেসর সামন্তর তাঁবুর দরজা থেকে কে হ্যাসাগটা খুলে নিচ্ছে এতক্ষণে। ঠাণ্ডা কমেছে আজ। তবে শিরশিরে হাওয়ায় শীতবোধ হয়। দোকানের পেছনে দাঁড়িয়ে শুনল, দূর মাঠের পথে অস্ফুট আলাপ—মেলা থেকে দল বেঁধে ফিরে যাচ্ছে কারা।

এ মুহূর্তে মোহনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেও নিশি যে কতখানি খুসি হতো। হতভাগা সেই দিন থেকে আর আসে না। গোবরা তার কাণ্ড শুনে হয়তো আরও মজা পেয়ে গিয়েছিল, তাই হয়তো লোকমুখে আরেকদফা শাসিয়েছে। লেবুতলার লোক আসার তো বিরাম নেই।

আকাশে চাঁদ—ক্ষয়ের রেখা ফুটেছে তার। জ্যোৎস্না ছড়ানো নিরাবরণ মাঠ সামনে। এখনই এই মাঠের পথে অকারণে হেঁটে যেতে ইচ্ছে করে! হারিয়ে গেলে শান্তি। কেউ এসে ডাকলে, নিশি এমন করে চলে যেতে পারে একমুহূর্তে—সব কিছু থেকে দূরে, আরও অজানায়। সেই বড়ো মঙ্গল।

ঢিবির ওপর গিয়ে বসতে ইচ্ছা করে নিশির। কিন্তু কপা এগিয়ে হঠাৎ থামল। আবছা আলোয় কারা বসে আছে ঝোপের পাশে। চকিতকণ্ঠে নিশি বলে উঠল, কে, কে?

একজন মুহূর্তে সাঁৎ করে সরে গেল ঝোপের আড়ালে। অন্যজন উঠে

দাঁড়িয়েছে। চলে যাচ্ছে না। হঠাৎ পাথর হয়ে গেছে যেন। নিশি ফের অস্ফুষ্টকণ্ঠে চিৎকার করল—কে, কে ওখানে।

মূর্তিটা এতক্ষণে নড়ে উঠেছে। পা ফেলবার চেষ্টা করছে? উঠে দাঁড়িয়েছে, তাই জ্যোৎস্না পড়েছে তার গায়ে। মুহূর্তে নিশি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল! মেয়ে মানুষ মনে হচ্ছে—

সে আরও খানিক দ্রুত এগিয়ে বিস্ময়ে বলে উঠল, সাবি!

সাবিত্রী। কুসুমগ্রামের সেই আধপাগলী সাবিত্রী। হাতে শালপাতার ঠোঙা—অভুক্ত সন্দেশ কিছু!

প্রচণ্ড ক্রোধে নিশি ঠাস করে গালে চড় মারল। সাবিত্রী ককিয়ে উঠে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তখন উন্মত্তের মতন নিশি তার পিঠে পাছায় লাথি মারতে থাকল। তোর মরণ হয় না হতচ্ছাড়ী, বেশ্যা, পাপ কোথাকার···

সন্দেশগুলি ছড়িয়ে পড়েছিল। একসময় নিশি থামলে সাবিত্রী দুহাতে কুড়োতে থাকল সেগুলি। তারপর ভাঙ্গা ঠোঙাটা বুকের কাছে ধরে নিঃশব্দে মেলার দিকে এগিয়ে গেল।

নিশি হাঁফাচ্ছিল দাঁড়িয়ে। এর পর কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছিল না।

সাবিত্রীকে যেতে দেখে সে তখন তাকে অনুসরণ করল। মেলায় ঢোকবার মুখে হঠাৎ সাবিত্রী পেছন ফিরল। তার মুখে আসরের ডেলাইটটার আলো এসে পড়েছে। নিশি দেখল একটুও কাঁদছেনা সে। কাঁদবার কথাও হয়তো নয়। মামীর কাছে লাথিঝাঁটা খাওয়া গতর, পাথর হয়ে গেছে। আর মজার কথা, সে যেন হাসছে। দাঁতগুলি দেখা যাচ্ছে। নিশি হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, হাসছিস্? লজ্জা করে না হাসতে?

সাবিত্রী বলে উঠল, আমার বেলায় যত দোষ! আর তুমি···তুমি যে···

কী? কী আমি? নিশি ছুটে এল হাত মুঠো করে। আশ্চর্য, পেটে পেটে এত! একটুও বোঝা যায় না। পিসি যেমন বলে, পাগল অনেক রকম। সব চেয়ে মজার পাগল, যারা সেয়ানা পাগল। মাছের মুড়ো নৈলে ভাত খায় না, মাগ না হলে শোয় না!

তেড়ে যাওয়াতে সাবিত্রী চুপ করে গেছে। নিশি ফের মুখ ভেংচে বলল, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। থেতলে মুখ ভেঙে দেব ছুঁড়ির।

ইস্, মুখ ভাঙবে। ভাঙলেই হলো। তোমার কী করেছি আমি!

ওরে বাবা! এর যে মুখ ফুটে গেছে এবার। বুলি শিখেছে হারামজাদী! নিশির গা ঘিন ঘিন করছিল। বাউরী ছোটজাতের মেয়ে। ও ছাড়া আর

ভবিষ্যৎ কী? কিন্তু···কৌতূহল মাথার ভেতর দিকে কুটকুট করে কামড়ায়। কি জ্বালা! লোকটা কোন মহাপুরুষ যে এই অসাধ্য সাধন করেছে, জানতে ইচ্ছা করে! সে কতকটা বিনোদিনীর কণ্ঠস্বরে বললে, এখনও কথা বলতে লজ্জা করে না তোর? গলায় দড়ি দিগে বটগাছে, নষ্টা মেয়ে! পেটে বাচ্চা হয়ে গেলে তখন কি করবি?

খোলাখুলি জানিয়ে দেওয়াই ভালো, নিশির এই রকম চেষ্টা মাত্র। হয়তো অবোধ মেয়ে, ফলাফল কী বোঝেনা। তার মাথার ওপর তো বিনোদিনীর মত কেউ নেই যে ওর খোলা কথাটা শিখিয়ে রাখে! বীণাদির মতনও কেউ নেই হয়তো। যার বাচ্চা হওয়া দেখে সে সব কিছু টের পেয়ে যাবে।

কিন্তু সাবিত্রী জবাব দিল, তুমি কি করবে? তুমি যে গোবরা হাড়ির সঙ্গে···

নিশি চড় তুলতেই ছুটে পালাল বটতলার ওদিকে। খানিক গিয়ে ফিরে এল নিশি। উঃ, কি ভয়ঙ্কর কথা ও শিখেছে, বলতে পারছে নির্দ্বিধায় নিশির মতন মেয়েকে। যেন এই কঠিন হিংস্র কথাটি মেলার দোকানপাঠ মাটি ও বাতাসেরও জানা হয়ে গেছে। সর্বত্র জ্বল জ্বল করে ফুটছে রক্তলাল অক্ষরে।

কিন্তু এ জবাব যেন ইচ্ছে করে শোনা। সাবিত্রীর মুখেও না শুনলে তার চলত না? নিজের ওপর ঘৃণায় নিশি অস্থির ততক্ষণে। ছি, ছি, কি দরকার ছিল ওই বেশ্যাটার ব্যাপারে নাক গলানোর! নিজের কুৎসার কথা নিজের কানে শুনতে গেল সে!

ফের ভালো করে মুখ ধুল রগড়ে। মুছল। খিদে পেয়েছিল একটু আগে। এখন কোথায় হারিয়ে গেছে তা। লম্ফের আলোর সুমুখে বসে পায়ের তলা খুঁজতে থাকল নিবিষ্টমনে। ছোটাছুটি করতে গিয়ে কাঁটা ফুটে গেছে। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর থুথু দিয়ে ব্যথার জায়গাটা আঙুলের সাহায্যে সাফ করবার সময় হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল নিশি। হাসির চপলতায় ভেঙে পড়ল। মা গো, মেলার আড়ালে কী সব চলে দ্যাখো! পিসির কথা একটুও মিথ্যে নয়। যেই গেছে, লোকটা লাফিয়ে উঠে ভোঁ দৌড়। হায় রে, পীরিতি, তোর গলায় দড়ি জোটে না? রাতবিরেতে মাঠে ঝোপের পাশে, সাপখোপের ভয়ও নেই, না বাসর ঘর, না ফুলের সাজ, শুকনো কাঁকুরে মাটির ওপর···একটা আধপাগলী মেয়ে, শুধু নিঃশব্দে নিজের দেহটিকেই সঁপে দিতে জানে মাত্র, আর সে-সমর্পণ তুচ্ছ কিছু সন্দেশের জন্যে। পীরিতি, প্রেম ভালবাসা! বীণাদির মতন বরের চরণ বুকে নেওয়ার কিছুই সে জানে না। বীণাদির মতন বরের কথা

বলতে আবেশে তার চোখে ঘোর লেগে বুজে যায় না চোখের পাতা।

আরও খানিক একা হেসে অস্থির হলো নিশি। কেউ যে ছাই সুমুখে নেই যে বলে বুক হাল্কা করে। মেলায় এ আশ্চর্য নতুন ধরনের মজাটা আর কেউ দেখতে পেল না গো!

ছুঁড়ি বলে কিনা, তুমিও যে গোবরা হাড়ির সঙ্গে···! হতভাগী, গোবরার সঙ্গে আমি কি করি? তোর মতন মিষ্টির লোভে, ওই কাঁটাঝোপের পাশে পাথুরে ধারালো মাটিতে···আমি কি তাই করি? আমি···আমি···

হাসি চাপতে না পেরে নিশি উঠল। কোনরকমে চটের পর্দার ওপর টিনখানি আটকে দিয়ে সে মেলার পেছন ঘুরে দ্রুত এগোল। তারপর গোবরার ঘরের জানালায় গিয়ে ফিস ফিস করে ডাকল, এই, এই, শুনছো? নিঃশব্দ হাসিতে সে এত টলে পড়ছিল যে ভাঙা গরাদটা আঁকড়ে ধরতে হলো।

গোবরা ঘরে নেই। শূন্য তক্তাপোষের ওপর চাঁদের আলো চকচক করছে।

মুহূর্তে নিশির সব চঞ্চলতা জমে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এতক্ষণ উচ্ছ্বাসের জলে ভেসে থাকা তার দেহমন টুপ করে অতলে তলিয়ে যাচ্ছে যেন। মাটি আঁকড়ানোর চেষ্টা চলেছে সবটুকু অস্তিত্বে।

ধীর আড়ষ্ট ক্লান্ত পা ফেলে ফেলে ফিরে এল নিশি। ভোরের প্রতীক্ষায় শুয়ে থাকল। বিনোদিনী ফিরে আসবে বলেছিল কাক কোকিল ডাকবার সময় হলে। গাড়ির চাকার শব্দ শোনবার জন্যে উৎকর্ণ নিশি উপুড় হয়ে শুয়ে থাকল বিছানায়

তারপর কখন মেলার জগতে আলোর সূর্য এসে পৌঁচেছে। বাইরে শিশুকণ্ঠের খিলখিল করে হাসি. গোবরার গলা, আ চু···চু···চু·· এই, ব্যস···ওরে গুগু···। ব্যাপার কী? চোখ খুলে নিশি হুড়মুড় করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। চটের পর্দার ফুটোয় তাকিয়ে সে দেখল, গোবরা একটা ন্যাংটা বাচ্চার সঙ্গে খেলা জুড়েছে। বাচ্চাটা নিতান্ত কালো কুচ্ছিত ছোট্ট বাঁদরের সমান উঁচু, কেবল হাঁটি-হাঁটি পা পা দশা, দুহাত তুলে গোবরার দিকে টলতে টলতে এগোচ্ছে। গোবরা কুঁজো হয়ে হয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ তাকে তুলে নিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। ছেড়ে দিয়ে ফের পিছু হটছে। অর্থাৎ হাঁটা শেখানোর তালে।

দৃশ্যটা ভীষণ খারাপ লাগল নিশির। সে তার মা-বাবাকে খুঁজল চারপাশে

তাকিয়ে। তারপর দেখল পাশেই কালিঝুলি ন্যাকড়া জড়ানো গতরে একটা মেয়ে বসে আছে। বড় বড় ভাঙ্গাচোরা হলুদ দাঁত বের করে সেও হাসছে। মেলায় এমন ভিখিরী বা পাগলী কম জোটেনা। হয়তো তাদেরই কেউ। কিন্তু ও পাষণ্ডটা আবার হঠাৎ কী মজা পেয়ে গেল এমন খেলায়! রাতে নিশি যে খেলা দেখেছে, তার তুলনায় এ আরও অসম্ভব।

অবিশ্বাস্য বলেই খারাপ লাগছিল নিশির। বাইরে রোদ পড়েছে মেলার বিরাট উঠোনে। এদিকের দোকানের ছায়া আধখানা ঘিরে আছে উঠোনটা। সামিআনার নীচের দিকটা গাভীর তলপেটের মতো ঝুলে আছে। রাতে যে দূর গ্রামের মেয়েপুরুষগুলো রানীচকে কুটুমবাড়ি আশ্রয় নিয়েছিল, এখন সকালে তারা ঘরে ফেরার পথে মেলায় এসেছে কেনাকাটা করার জন্যে।

নিশি আরও দেখল, তাদের বেঞ্চে একটা লোক মুখ ফিরিয়ে বসে গোবরার কাণ্ড দেখছে আর নিঃশব্দে হাসছে। কারণ তার পিঠের দিকটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

না। শুধু সে নয়, আরও বহু লোক চারপাশ থেকে দেখছে আর অমনি করে হাসছে।

নিশি মুখ বিকৃত করল। এমনি হয় সংসারে। ভয়ে হোক, ভক্তিতে হোক মানুষ যাকে পাঁচজনের একজন বলে জানে, সে পিঠ চুলকোলেও তারা হাঁ করে দ্যাখে। বলে: ডান পিঠ চুলকোচ্ছেন, দ্যাখো, দ্যাখো। আদিখ্যেতা, সঙ, ভূত, যত সব! নিশি মনে মনে গাল দিল। যেন কি পুরানো বীর এলেন কলিকালে, চরণপূজো করে জীবন সার্থক করো।

কিন্তু বিনোদিনী এল না তো! অসুখ বাড়ল নাকি? খবরও এলনা ভুবনপুর থেকে। নিশি বেরোতেই বেঞ্চের লোকটা মুখ ফেরাল এদিকে! মধুকাকা তুমি। নিশি বিস্মিতভাবে বলে উঠল।

ভুবনপুরের প্রতিবেশী মধু হাজরা। তবে ঠিকই খবর এসেছে বিনোদিনীর।

ডেকেছিলাম বারকয়। সাড়া পেলাম না মা। ভাবলাম বাইরে গেছো কোথাও···মধু হাজরা বলল।

কি লোক তুমি! পর্দা তুলে ভেতরটা দেখতে হয়। নিশি হন্তদন্ত হয়ে বলল। পিসির খবর কী? এলনা যে?

তোমার পিসি খবর পাঠিয়েছে। আজও আসা হচ্ছে না। সেদিন কেত্তন শোনা বাদ গেছে, তাই ফের লোক পাঠিয়েছে আজ। মনোহর দাশকে পাওয়া যাবে কিনা কে জানে। দশটি রাতের আগাম বায়না হাতে···নিশি হাসতে

গিয়ে সামলে নিল, ও! পিসি গিয়ে বুঝি বেশ জমে উঠেছে। বেশ তো, ইচ্ছে না করে আসবে না। কে মাথার দিব্যি দিয়েছে আসতে! আমি বেশ চালিয়ে নেব।

মধু হাজরা বলল, লেবুতলায় মেয়ের বাড়ি আসবার কথা ছিল আমার। জানতে পেরে খবরটা আমাকে দিয়েই পাঠাল। তাহলে আসি মা।

নিশি এত ক্ষুব্ধ হয়েছিল যে এক কাপ চা খেতে বলার কথাও মনে আসে নি। মধু হাজরা চলে গেলে সে বিচলিত হলো একথা ভেবে। বলবে কী! গাঁয়ের মেয়ে, প্রতিবেশী, মেলায় দোকান খুলেছে। গেলাম তো এক চুমুক চা খেতেও বলল না। কিন্তু মধু হাজরাও কেমন নির্বিকার দ্যাখো। কোন ভালমন্দ কুশলপ্রশ্ন নেই। তার কোন বিস্ময় নেই যে তার ছেলেবেলা থেকে চেনা মেয়েটি একি নতুন জীবনে এসে পড়েছে! নিতান্ত একা!

থাক্ বিনোদিনী ভাইয়ের বাড়ি। যতকাল খুশী, থাক না, নিশির কোন অসুবিধে হবে না। বরং ওর আর আসবারই দরকার নেই। নিশি একা যুবতী মেয়ে মেলার দোকানে পড়ে থাকবে। এ মেলা ফুরোলে তারপর ফের অন্য মেলায় চলে যাবে। যতকাল বাঁচে, এমনি করে দিন কাটাবে।

এই অব্দি ভেবেই হঠাৎ দমে গেল নিশি।

মেলায় একা এ বয়সের মেয়ে দিনযাপন করছে নিঃশঙ্কভাবে। কোন ক্ষতি তার হবে না এখানে।—কথাটা তলিয়ে দেখলে ওই গোবরার চেহারাই ফুটে ওঠে, নিশির চোখে ফোটে, ভুবনপুরের লোকের চোখে ফোটে। রানীচকে মেলার লোকও দেখতে পায়। দ্যাখে বিশেষ করে বিনোদিনী আর লোচন। এই সকল দেখার মধ্যে একটা নিশ্চিন্ততার ভাব রয়েছে। নিশির কোন ভয় নেই, কারণ গোবরা তার শিয়রে। নিশিকে কেউ ছুঁতে পারবে না। কারণ সে গোবরা নামক কাল-সাপের মাথার মণি। আর তাই লোচন আর বিনোদিনী অনায়াসে ভুবনপুরে বসে বাড়ির উঠোনে মনোহর দাসের কীর্তনের আসর নিয়ে মেতে উঠেছে। তাই মধু হাজরাও নির্বিকার মুখে খবর দিয়ে কেটে পড়ল। একবারও ভাবতে পারল না যে, নিশি এখানে অসহায় হতেও তো পারে। তার মনে দুঃখকষ্ট ভয় থাকতেও পারে, বিনোদিনী যখন পাশে নেই!

কিন্তু তারপর? রানীচকে মেলার দিন ফুরিয়ে এলে ময়নাহাটে পীরের মেলা শুরু। হয়তো সবাই জেনেছে, নিশি যেখানে যাবে, তার বাহন ওই যমটাও সঙ্গে সঙ্গে যাবে। তাকে ঘিরে রাখবে। কেউ ছুঁতে পারবে না ওই সাতশো পুরুষ রাক্ষসের প্রাণভোমরাটিকে, যা গোবরা নামক সাপের কুণ্ডলীতে সোনার

কৌটোয় রাখা।

বিনোদিনী মাঝে মাঝে কপালে করাঘাত করে বলত, এই আমার অদেষ্ট, ধিক্, ধিক্ দিই রে। মুড়ো ঝাঁটা মারি বিধাতাপুরুষের মুখে! আর সেই অদৃষ্ট নিশির। সেই ভাগ্যের রেখাজালে সে জড়িয়ে পড়েছে কালক্রমে।

তবে আর কী! ভেসে পড়ি অজানার উজোনে। বুকে বল আনি। কোমর বেঁধে লেগে যাই কাজে।···নিশি সত্যি-সত্যি কোমরে আঁচল জড়াল। লোকে যা ভেবেছে, তা সত্য হোক্—ক্ষতি কী? গোবরার মেয়েমানুষ—হ্যাঁ গোবরার মেয়েমানুষই নিশি। সমুদ্রে শয়ন যার, শিশিরে কি ভয় তার? আজ সে হরেকরকম মশলা মিশিয়ে নতুন একটা পানের খিলি বানাবে, থাকে থাকে সুন্দর করে থালায় সাজাবে, বলবে নিশিলতা পান। নতুন খিলি। দেব নাকি? দাম? দাম পুরো একটি টাকা।

নিজের নামের পানের খিলি। কি গরবে গরবিনী নিশি আকুল হলো ক্রমান্বয়ে, ঝাঁপ তুলে বাঁশের খুঁঠি লাগিয়ে দিল অক্লেশে। তারপর গোবরাকে ডাকল, এদিকে এসো তো একটুখানি, কাজ আছে।

সারা মেলা হঠাৎ যেন মুখ ফিরিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। গোবরাকে দেখছে। তারপর নিশিকেও দেখছে।

বাচ্চাটা কোলে নিয়েই গোবরা আসছে। আ মর্, ছেলের বাপ হবার সাধ নাকি হতভাগাটার! নাকি বিশ্বশুদ্ধ লোককে জানাতে চায়, গোবরা মানুষকে মরণ দিতেই শুধু জানে না, জন্মো দিতেও জানে। নির্লজ্জ। নিশির মনে এই সব কথার উদয়। তখন সে মুখ নত করে রাখল। যে হাতে রক্ত মেখেছে, সেই হাতে একটা নিষ্পাপ শিশুকে সে ধরে আছে। কে জানে কি মতলব তার, ভয় করে, বড্ড গা কাঁপে, হয়তো গোবরার ভেতরে পাপের দেবতা এখনই লাফিয়ে উঠে লাল চোখে তাকাবে! বলবেঃ এ্যাই গোবরা, মার, আছাড় মার, এক্ষুণি হাড় গুঁড়ো করে দে রে শালা। নৈলে মরবি, নির্ঘাৎ মরবি। নিশি অনুভব করল, গোবরা যত অগ্রসর হচ্ছে ছেলেটি কোলে নিয়ে, তত প্রতিটি পা ফেলার শব্দে যেন বলির বাজনা বাজছে। যেন আস্তে আস্তে এই সকালের প্রসন্ন আলোর মেলাব্যাপী আস্তে আস্তে শতশত প্রচ্ছন্ন কংকাল রক্তজিহ্বা লক লক করে কাঁপছে। চারপাশে বাজনা বাজছে। সামনে পাপের বিগ্রহ। গোবরা আসছে। কোলে উলঙ্গ শিশু। আর রক্তলাল চঞ্চল আগুনের শিখার মতো হাজার লোল রসনা কেঁপে কেঁপে বলছে, বলি দে, বলি দে, বলি দে, বলি দে রে বলি দে······

না। গোবরা আঙুল পাকিয়ে তুড়ি দিতে দিতে ওই রকম কি একটা তালে তালে বলছে বাচ্চাটাকে। নিশি শুনছে: বলি দে, বলি দে, বলি দে রে বলি দে……

নিশি উদভ্রান্ত ভাবে চিৎকার করে উঠল—ফ্যালো, ফেলে দাও এক্ষুণি, ফ্যালো বলছি…

॥ ষোল ॥

কিছুদিন থেকে এটা লক্ষ্য করছি। আমার চার পাশে যেন একটা মন্ত্রপড়া গণ্ডী ঘেরা ছিল—বলে দেওয়া হয়েছিল—বাইরে যেও না, সাবধান! অথচ কুয়ার মধ্যে বাস যত নিরাপদই হোক্, ভালো লাগছিল না। কারণ তার আগে যে বাইরেটা আমি দেখে নিয়েছি ছেলেবেলা থেকে! বড় কষ্টে লোভটা অবশ্য সামলে নিচ্ছিলাম! বেড়া না থাকলে লোকে গ্রাহ্য করে না! ভয় পায় না। বলবে—আরে ধুর্, এই তো তোমার-আমার মত লোক গোবরা হাড়ি। ওকে ভয় করার কী আছে! তাই মেলামেশা করতাম না খোলাখুলি। বটতলার জুয়াড়ীরা সে দিন সাহস করে ডাকল—আসুন গোবর্ধনবাবু, একটু তাস খেলা যাক্! শুনছি সামন্ত প্রফেসরের কাছে তাসের যাদু শিখছেন আজকাল। আগে হলে চাঁটি মেরে দিতাম মাথায়। পারলাম না। খেলতে বসলাম। ওরা আমার আনাড়ী খেলা দেখে হেসে বাঁচে না। আর বলে, এ তো মানুষ মারা নয়, এতে বহুত বুদ্ধির খেল রয়েছে। বোঝ ব্যাপারখানা! এমন করে তাচ্ছিল্য—এ সাহস তারা পেল কোথায় কে জানে। প্রহ্লাদটাও দেখি বলে—গোবর্ধনবাবু, হরিপুরের অনন্ত ওঝা বলছিল, টাকা নিয়ে কাজ করেন নি। কমপ্লেন করছিল। ছিঃ, এটা কি উচিত হয়েছে? কাজের জন্যেই তো আপনাকে দেওয়া…শালার গালে চড় মারতে গিয়ে থামলাম। আমাকে গুরুজনের মতো তিরস্কার করার সাহস হয়েছে তার! কেন? না—আমি, আজকাল আড্ডা দিই তার সঙ্গে। নিশি, তুমি ভুল শুনেছ, বুঝেছও অনেক ভুল। আমি মিছেমিছি বসে কোথাও আড্ডা দিই নে।

আর আশ্চর্য, কাল একটা রাস্তার ছোঁড়া আমাকে, শুধু মানুষ খুন করলেই হয় না, এই দ্যাখো…। তার মানে ও ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল। আমারও খানিক সখ হলো—দেখিনা একবার সুতো ছেড়ে! এ খোঁটা বুকে বাজে, মাইরি। আমি শুধু ওই একটি কাজ ছাড়া সংসারে যেন অচল। অচল টাকা যেমন শেষ অব্দি ভিখিরীতেও নিতে চায় না—তেমনি দশা হয়ে যায় নাকি ভাবছি।…তাই জেদ

চড়ে যাচ্ছে মাথায়। গোবরা হাড়ি শুধু মানুষ মারতে পারে? আর কিছু নয়? ওরে শালারা, গোবরা তোদের মতন ছেলেপুলের বাপ হতে পারে, মেলায় দোকান খুলতে পারে, মাগের জন্যে শহর থেকে শাড়ী ব্লাউস স্নো সাবান কিনে আনতে পারে···দালান বানিয়ে সুখের সংসার ফাঁদতে পারে—এ যেন অসম্ভব তোদের কাছে। আমাকে একটা লেবেল মেরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যেন। খাঁটি মানুষমারা কল—ভেজাল প্রমাণে হাজার টাকা পুরস্কার! রেগেমেগে একটা কিছু করে বসলে—ধরো মেলাটা জ্বালিয়ে ছাই করে দিলে—লুঠপাট করে ফেললেও কি অন্যকথা বলবে কেউ? সেই একই বাণী দেবে মহাপুরুষগণ, গোবরা ওই ছাড়া আর পারে কী? অথচ সবই পারি। রানীচকে একটা মেয়েস্কুল করার জন্যে মণি বাঁড়ুয্যে শহরে দৌড়াদৌড়ি করে জুতোর শুকতলা ক্ষইয়ে দিল। গাঁয়ের শালারা কান দ্যায় না, কারণ মণি যে অন্যপার্টি'র লোক। বেশ তো—তোরা নিজেরা কর। তা করবে না—চাঁদা দিতে হবে যে! যদি বা করে, স্বার্থ আছে স্কুলঘর তৈরীর টাকায় মোটা ভাগ বসাবে। মণি বাঁড়ুয্যে তাই সেদিকটাও যাতে না হয়, নিজের তদ্বিরে হন্তদন্ত হচ্ছে। অথচ স্কুল হলে সকলের মেয়েই পড়বে-টড়বে। মণি শালাকে মেরে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু হাত ওঠে না। এক মহাপুরুষ তারিণীকে মেরেছি—এখন এ যদি আবার হাউমাউ করে বলে—ওগো বাবাজীবন গোবর্ধন, আমার মেয়ে চুলের ফিতে আনতে বলেছিল. এই দ্যাখো, লাল সিল্কের ফিতে কিনেছি—মেয়ে পথ তাকাচ্ছে। মাইরি নিশি, এমন কথা কোন মানুষ খুন হবার সময় বলেনি কোনদিন। বললে, কি হতো কে জানে।

সেবারে রেললাইনে বেঁধে একটা মানুষ মারলাম। তার কোমরে একটা বটুয়া ছিল। তাতে কিছু খুচরো পয়সা, কখানা হাতচিঠি, কয়েক-খিলি পান, জর্দার কৌটো, আর দুগাছি মকরমুখো সোনার বালা। এই বালা দুগাছি দেখে রোম শির শির করে উঠল। মাগের জন্যে বুঝি? মাগী তো ওদিকে খবর পেয়ে চুল এলিয়ে পতিপ্রাণধনের জন্যে মন্দোদরীবিলাপ করতে থাকবে। সেই সময় হঠাৎ বালা দুটো পেলে নাকের জল চোখের জল মুছে পতিশোক সামলায় না বালা দ্যাখে, বালা দ্যাখে না কাঁদে, দেখবার জন্যে প্রাণমন আকুল। দিয়ে এলাম এক সুযোগে। যা ভেবেছি, তাই। ও গেল, গেল। এটাতো পেলাম। সর্বনাশের বানে যখন সব ভেসে যাচ্ছে, মুড়ো ঝাঁটাগাছখানা আটকেও কি সুখ পায়! মানুষ এত ছোট্ট—এত সহজে তুষ্ট জীব, নিশি। এমনি করে দেখবার সুযোগ দিয়েছি, আর মানুষের ওপর ঘৃণাও যত জন্মেছে, তাকে শুকনো কাঠির

মতন মুট করে ভাঙবার সাহস আর শক্তিও তত বেড়েছে। রূপপুরের বংশী বোষ্টমকে খুন করেছিলাম তখন সে মাতাল। তারপর গেলাস আর বোতলটা দিয়ে এলাম তার বাড়িতে। সকালে সেই নিয়ে কি হুটোপুটি—সামাল দে, সামাল দে, লুকো—এ নিশ্চয় গোবরা হাড়ির কাজ। মেরে-টেরে জানিয়ে দিয়ে গেছে, বংশী বোষ্টম কোথায় কী করছিল। হ্যাঁ নিশি, এই রকম একটা বিশ্বাসও লোকে আমার জন্যে রেখেছে। আমি নিজে পাপী—তবু নাকি পাপীটাপী মানুষ ছাড়া মারি নে। কেবল তারিণী মুখুজ্জের কথা আলাদা। ওই ব্যাটাই আমার মাথাটা খেয়ে গেল মরবার সময়। ওই আধসের খেজুর গুড়, লাল ফিতে, কখানা বই···

তা যা বলছিলাম—রানীচক মেয়েস্কুলের কথা। ধরো যদি আমি বলি, নে, আমি টাকা দিচ্ছি। ভয়ে নেবে না। যদি কারও ঘাড় ধরে আদায় করে দিই। তারপর স্কুল গড়ে ওঠে, ভয়ে কেউ সেখানে মেয়ে পাঠাবে না পড়তে। ওরে বাবা, গোবরা হাড়ি স্কুলের পেছনে ছিল, তাও আবার মেয়েস্কুল—শালা লম্পট এবার দেখছি কন্যারত্নদের ওপর চোখ দিয়ে বসেছে। তুমি কি রানীচকের ভেতরে কখনও গেছ নিশি? গেলে দেখতে—পোস্টাপিসের কাছে বাঁকের মুখে একটা টিউবওয়েল রয়েছে। গোড়ায় মার্বেল পাথরে লেখা আছে: শ্রীমতী মায়ারাণী দাসী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, সন তেরশো···মেয়েটা কে জানো? শহরের বাগান পাড়ায় একসময় বেশ্যা ছিল। এইরকম আরো অনেক আছে। আমিও ওসব পারি। কিন্তু তা করে কি লাভ? যারা করে, তারা নিজের দোষের ওপর ঢাকনা দিতে চায়। আমার ওপর কোন ঢাকনা দিতে আমি চাইনে। অথচ শালাদের দেখাতে ইচ্ছে করে—আমিও ওটা পারি। আলবাৎ পারি। কি পারি না আমি? আর এই থেকে রোখ চড়ে যাচ্ছে মাথায়। কিন্তু যে পাখির ডানা ছিঁড়ে—নয় তো রঙ মাখিয়ে ফের ছেড়ে দেওয়া হয়—জাতে নেয় না। খাঁচার গণ্ডী ছাড়লেই তার বিপদ। ঠুকরে মেরে ফ্যালে বুনো পাখির দল।··· তবু কি নেশা দেখ—আকাশে উড়বো, গাছে বসবো, ফলফুল পাতায় ঠোঁট ঘষবো ··· ইচ্ছে করে দিই নিজের ওই কুমতলবের ওপর ভোজালি ঝেড়ে!···

কিন্তু সত্যি কি আমার ডানা ছেঁড়া, ডানায় রঙ? নিশি, তুমি বলো। আমার গণ্ডীটা ভেঙে যাচ্ছে একটু একটু করে। বাইরে মিশছি। ভড়ং চলে যাচ্ছে একটু করে। গুণ্ডাদের ওই তো একটা দুর্ভেদ্য বর্ম—লোকের ভয় দিয়ে তৈরী তাদের বুকের পোষাক। গোবরা গুণ্ডার জাঁক একটু করে ধুলোয় খসে পড়ছে যেন। চোখে তাকিয়ে দেখছি, তবু ঠেকাতে পারিনে। কি নেশার বান

ডেকেছে—স্রোতে অসহায় হয়ে ভেসে যাচ্ছি।

নিশি, লোকে বলে—আমার সাগরেদের তো অভাব নেই। তাই ভয়টুকু এখনও টিকে রয়েছে। আমার সাগরেদদের ভয়ে ওরা এখনও আমার ক্ষতি করার সাহস রাখেনা। আমার ভয়ে নয়।···সেই সাগরেদ কারা জানো? মুখোমুখি তাদের সঙ্গে আমার কোন সংযোগ নেই। আমি তাদের সকলকে চিনি না। সত্যি চিনি না নিশি। তবু দেখি আমার ওপর আঘাতের সম্ভাবনা দেখা দিলে অমনি তারা খোলস ছেড়ে বেরোয়। চারপাশে ঘিরে দাঁড়ায়। এরা সকলেই কিন্তু মার্কামারা খুনী বা বদমাইস নয়। বরং মূর্খ বলতে পারো। তারা মনে মনে গোবরার পুজো করে। তারা আমাকে বীরের আসনে বসায়। গণ্ডগোলের মুহূর্তে তাদের আবির্ভাব। মিটে গেলে ফের অন্তর্ধান। আমিও খুঁজে ফিরি না তাদের! জানি, তারা আছে, তারা থাকবে, ব্যস্।···এ ব্যাপারটা প্রথম টের পেলাম কবে জানো? কবছর আগে রূপপুরের মেলায়। রূপপুর শহরের পাশাপাশি। সেখানে তখন আমাকে অনেকে এমন করে চেনে না। তখন সবে নতুন নাম ফুটছে। একজনের সঙ্গে গণ্ডগোল বেধে গিয়েছিল, তুচ্ছ কথা প্রসঙ্গে। মনে পড়ে না এখন। দলবল মিলে মারে আর কী! সেই সময় হঠাৎ দেখি জনতিনেক ছোকরা, পরনে ময়লা ফুলপ্যান্ট, গায়ে মেমসায়েব মার্কা জামা, চুল মেয়েদের মতন আঁচড়ানো, রুখে দাঁড়িয়েছে আমার দুপাশে, সামনে। দেখেই চিনলাম মহাপ্রভুদের। একজনকে পকেট মারার দায়ে লোকে পিটতে যাচ্ছিল স্টেশনে, ভোজালি বের করে ছাড়িয়ে এনেছিলাম। মানুষের ওই এক দোষ নিশি। তুচ্ছ দু একটা আধুলি হয়তো পকেট মেরেছে, কি এমনি মিছেমিছি সন্দেহ, চারপাশ থেকে দে মার। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যে লোকটি শার্টের হাতা গুটিয়ে নেতা সেজেছে, সে কিন্তু বাড়িতে মা-মাগকে উঠতে বসতে পেটাচ্ছে, বুড়ো বাপকে লাথি মেরে মদের পয়সা নিতেও পিছ পা নয়। সে আবার পাপীতাপীকে ধোলাই করার জন্য ব্যস্ত।···ওই তিনজনের আরেকজনকে শহরের গলিতে চুরির দায়ে মারবার চেষ্টা চলছিল। অন্যজন হোটেলে চাকরী করত। সে হোটেলে খেতে গেছি, দেখি থালাচুরির জন্য গোঁফ টেনে ছিঁড়ে ফেলছে বেচারার।···কে হলপ করে বলতে পারে, ওরা ঠিক ঐ চুরিটিই করেছে কিনা! যদি বা করে, সামান্য ক'টাকার জিনিস, অন্যদিকে যে হাজার জায়গায় মানুষ ঠকছে, মার খাচ্ছে, ধনমান চুরি যাচ্ছে, সেই শোধ ওখানে তোলবার তাল। নিশি, যখন দেখি ভীড় করে একদল পাগলা মানুষ একজনকে ঠেঙাচ্ছে, সে শত দোষের দোষী হোক, খুন চেপে যায়

মাথায় ! ডাণ্ডা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ছাড়িয়ে আনি। শালা, তোর রাখবার দোষে জিনিস খোওয়া যাবে, নিজের দোষটি ঢাকতে অন্যকে পেটানো কেন ? …নিশি, জীবনে কারুর কাছে যা বলিনি, তোমাকেই বলছি। মধুপুরের ওদিকে পুলিশ একটা গ্রামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। খবর পেয়ে দেখতে গেলাম। আমাকে ওরা চেনে। কিছু বলল না। চোখের সুমুখে দেখলাম, একজন হাঁটু গেড়ে বসে বন্দুক ছুঁড়ল, আট বছরের একটা বাচ্চা বাড়ি থেকে পুলিশ দেখতে বেরিয়ে এসেছিল পথে। তক্ষুণি মাটিতে পড়ে মুখ ঘষতে থাকল। আমি মহাপুরুষ নই। মানুষ মারা আমার ব্যবসা। কিন্তু ছেলেটি পড়ে যাবার সময় সেই যে চিৎকার করেছিল, মা, মা গো…আমার মনে পড়ছিল, একদিন আমিও অমনি করে আঘাত খেয়ে ডেকেছি, মা মা গো…রোস্ শালা। মজা দেখাচ্ছি। আমি মানুষমারা সাঁড়াশি। তারপর একদিন সেই কনস্টেবল স্টেশন থেকে ফিরছে। সঙ্গে বোধ করি যুবতী বৌ। হাতে সুটকেশ আর কোলে বাচ্চা। বাঁকের মুখে এসে সামনে দাঁড়ালাম। যেহাতে গুলি করেছিলে, সেই হাতে তোমার বাচ্চা।… কেঁদে অস্থির।…আমি…মেসিনের পার্ট গোবর্ধনবাবু… আমার ডিউটি আমি করেছি।…ফিরে এলাম। সত্যিতো ওর কি দোষ ? আর আমার ? আমারও তো দোষ নেই। খুন করায়, আমি খুন করি।…তা বড়বাবুর কানে তোলে নি। জানে, তাহলে আর মাগের সঙ্গে শুয়ে সুখ পাবার ফুরসত থাকবে না জীবনে। প্রাণের ভয় বড় ভয়। মানুষ কত সহজে কাবু হয়, দ্যাখো তাহলে। কত সহজে তারিণী মুখুজ্জের কথা মনে পড়ে যায়, আমার পথ তাকিয়ে ওরা বসে আছে। তখন সব জলাঞ্জলি দিয়ে উলঙ্গ মানুষটা বেরিয়ে আসে চোখের সুমুখে।

নিশি, আজ রাতে আমি একবার বেরোতে চাই। হেসোনা, তীর্থে যাচ্ছি না। কিন্তু তুমি জেগে থাকবে তো ? ফিরে এলে তখন তোমার হাতে ভাত খাবো। শুধু আলুভাতে ডালসেদ্ধ, একটা ডিমও দিও ইচ্ছে হলে।

গোবরা অন্ধকারে মিশে যেতেই নিশি ফিরে এল বটতলা হয়ে ঘুরপথে। এখনও কৃষ্ণাতিথির চাঁদের দেখা নেই। ঢিবির কাছে আসতেই কে ডাকল, নিশি নাকি ?

নিশি চমকে উঠে বলল, কে !

আবার কে ! মোহন, লেবুতলার মোহন। এগিয়ে এসে বলল, গোবরাকে কোথায় এগিয়ে দিয়ে এলে ?

নিশি ঝাঁঝালো স্বরে বলল, কেন সে খোঁজে কাজ কি তোমার ? বাঘের

পেছনে কেউ লেগে থাকে, তেমনি করে ঘুরছো কি আশায় ?

মোহন অন্ধকারে হাসছে। কেউ যে আশায় ঘোরে !

নির্লজ্জ কোথাকার ! নিশি দ্রুত চলে এল মেলার দিকে। দোকানে এসে দেখল, বিনোদিনী পা ছড়িয়ে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে বসে আছে।

বিনোদিনী নিশিকে ফিরতে দেখে বলল, এখনও রান্না চাপালিনে, খাবি নে ?

একটু পরে চাপাচ্ছি। তোমার খিদে পেলে বলো, দোকান থেকে লুচি এনে দিই।

থাক্। এখন খিদে নেই। বিনোদিনী হাত নাড়ল। তারপর ফের বলল, পোড়া চোখে কত জেগেছি, আর আজ ঘুম যেন আঁকড়ে ধরছে। আমি একটু শোব রে নিশি ?

নিশি একটু হাসল। বারণ আছে নাকি ? যাও না, ভেতরে শোও গিয়ে। আমি বসছি।

বিনোদিনী নামল টাট থেকে। কাল একটিমাত্তর রাত্ জেগেছি, তাতেই যেন ঘুমের সাগরে ভাসছি সারাদিন। এখনও টান দ্যাখ্ না···

ভুবনপুরে কীর্তন শুনেছে, সারাটি বিকেল ইনিয়েবিনিয়ে কতবার বলেছে। পাছে আবার সেই গল্প শুরু করে নিশি তাড়া দিল, চুপচাপ শুয়ে থাকো কিন্তু। বকবক করোনা।

না মা। স্বপনের ছবি দেখে এলাম, স্বপনেই তা ফুরুলো। আবার কী ? এখন তো ঠায় জাগরণের ব্রতো।

আবার ! নিশি কপটভাবে ধমক দিল।

বিনোদিনী সুড়সুড় করে ভেতরে ঢুকে গেছে। আশ্চর্য, মানুষ শক্তিমান হোক, পাপী হোক, খুনী গুণ্ডা হোক, কি অবোধ, কি অবুঝ ! কোথাও যেন তার একটা কোন্ জনমের হারানো সুখ, হারানো আলোর ব্যাপার আছে, হঠাৎ তার একটুখানি ঝিলিক দেখলেই মুহূর্তে অবশ হয়ে ঢলে পড়ে। হয়তো সব মনে পড়ে যায়। চিনতে পারে। হারানো শিশুর সুমুখে মায়ের চেনা আঁচলটুকু যেমন অস্থির করে শিশুকে !

নিশির মধ্যে সে ওইরকম দেখেছে বলছিল। আর নিশি ? নিশিও কি···

কে জানে কি দেখেছে ওই মুখের রেখায়, ওই কণ্ঠস্বরে। কানে বাজে : নিশি, তুমি জেগে থাকবে তো ? আজ তোমার হাতে ভাত খাবো।—সেরাত্তে অন্ধকারে জলেকাদায় যাকে খুঁজেছে ব্যাকুল হয়ে, শুধু মনে হয়েছে, একজনকে খেতে বলেছিল, সে এল না, এ বিপুল পরাজয়ের লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল

তাই যত আকুলতা, আমার মান রাখার মতো করে তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসে পাতে বসানো চাই, সে আজ নিজমুখে বলে গেল, এসে খাবো আলুভাতে ডালসেদ্ধ, একটা ডিম। আজ আর অন্য কথা নয়। শুধু মনে হয়, একজন এসে খেতে চাইবে।

নিশি উনুন ধরিয়ে দিল মুক্ত আকাশের নীচে। দিগন্তে ক্ষয়িত চাঁদ। ম্লান জ্যোৎস্নায় বড় বিষণ্ণতা। কানে বাজেঃ যতবারই খাই, কতক্ষণ ধরে গা ছমছম করে। বিষ দ্যায়নি তো? আমাকে বিষ খাওয়ায়নি তো?

আজ গোবরা এসে খাবে। খাবার পর একটুও গা ছমছম করবে না তার। খুবই নিশ্চিন্তে ঘুমোবে। তখন নিশি তাকে··

নিশি বলেছিল, একবার দাঁড়াও তো!

কেন নিশি?

না। মুখ ফুটে বলতে তো পারেই নি! কী একটা তীব্র আবেগকে মুহূর্তে সামলে নিয়েছিল নিশি! শুধু বলেছিল, এমনি। তোমাকে একবার দেখবার ইচ্ছে হলো।

গোবরা হেসেছিল, আমাকে কি দেখতে পাচ্ছ নিশি? আমি যে অন্ধকারের মানুষ।

আর কেউ না পাক্, আমি তো দেখতে পাই।

মিথ্যে বলো না। আলো থেকে অন্ধকারে হঠাৎ গেলে চোখ ধাঁধিয়ে যায় একবারে। কিছু দেখা যায় না। ফারাক করা যায় না একটা থেকে অন্যটা। ইচ্ছে হলে পরখ করতে পারো এক্ষুণি।

নিশি আরও সরে গিয়েছিল কাছে। এতকাছে—গোবরার নিশ্বাসের উষ্ণতা চেপে ধরছিল তার ঠাণ্ডা মুখ। হঠাৎ কী একটা আবেগে তার বুক ফুলেফুলে উঠছিল। সে শান্ত থাকার চেষ্টা করে শুধু বলেছিল—অন্ধকার আমার ভালো লাগে। একথার এমন সুর—যেন ঝর্ণাধারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাথরের উপর। ছলছল কলকল ধ্বনি তাকে ঘিরেছে। কিন্তু ওটা পাথর। স্তব্ধ।

নিশি!

বলো।

কোথায় যাচ্ছি, জানতে চাইলে না তো?

জেনে কি লাভ?

তখন গোবরা দ্রুত পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করেছিল।

নিশির ফের তাকে ডাকবার ইচ্ছে—মনে হয়, কি করতে চাচ্ছিল যেন বাকী

থেকে গেল তা। এই অন্ধকার রাত, নির্জন মাঠ, আকাশ-ভরা তারার নীচে, ভয়ঙ্করের হাত ধরে সুন্দর কিছু যেন আসতে চাচ্ছিল—এল না, হলো না! শুধু বুক তোলপাড় হলো, রক্ত চঞ্চল হলো—অব্যক্ত প্রদাহে সারা শরীরে জ্বালা ধরে থাকল—কিছু ঘটল না।

নিশি আর কিছু ভাবতে পারে নি। কেউ পারে না তা। স্খলিত পায়ে মেলার পেছন ঘুরে রুদ্রদেবের বটতলায় গিয়েছিল। তারপর মুহূর্তের বিহ্বলতায় ভেঙ্গে পড়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শিলাগুলিতে মাথা লুটিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলেছিল, যেদিন প্রথম এসেছিলাম, কোন ইচ্ছে নিয়ে প্রণাম করিনি। আজ ইচ্ছে করছি। আজ যেন আমার মান বাঁচিয়ে দিও, বাঁচিয়ে দিও রুদ্রদেব।

খবর বাতাসের মুখে ছোটে। সেই খবর এল সকাল বেলায়। দোকানের পেছনের ঘরে থালায় বাড়া ভাত খড়িখড়ি, আলুসেদ্ধ ডিম শুকিয়ে কাঠ, নিশি হেলান দিয়ে বসে আছে। কখন রোদ ফুটল একটু করে, রাতজাগা চোখের পাতা বুজে এল। তারপর বাইরে মেলার প্রাঙ্গনে কারা উচ্চকণ্ঠে খবরটা জানিয়ে দিল।

প্রতিটি দোকান থেকে লোকজন ছুটে বেরিয়ে পড়েছে। কানাকানি তারপর :

হল্লা, উল্লাস, মেলার প্রাঙ্গনে বড় ভীড়, কানপাতা দায়। প্রহ্লাদ মনের আনন্দে ছেলেমানুষের মত দুহাত তুলে ধেই ধেই নাচছে। নাচতে নাচতে আসছে দ্বিজু গোমস্তা। ছুটে আসছে সেই বল্লভ কাঁশারি। জয় বাবা রুদ্রদেব, জয় বাবা দর্পহারী, বারোটা পাঁঠা দোব বাবা···কারা বেলুন ফাটাচ্ছে ফটাফট্। নাগিনবাঁশী বাজছে। রুদ্রদেবের মন্দিরের ওদিকে অপটু হাতে কে ঢাক বাজাতেও শুরু করেছে। জয় বাবা ধর্মদেব কি জয়!

ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি···সেই ভৈরবী।

আল্লাহু আকবর···ফজল মিয়াও অসময়েই অজু করে নমাজে বসতে যাচ্ছে। এতদিন পরে এক নিশ্চিত শান্তির সলিলে অবগাহনের পালা রানীচক মেলায়।

নিশি সোজা হয়ে বসল। বিনোদিনী নেই। কখন বাইরে বেরিয়েছিল। এতক্ষণে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল। এই সাতসকালেই স্নান করেছে। ভেজা চুল, ভেজা কাপড়—ধুলোকাদায় মাখামাখি, বাবার নামে গড়াগড়ি দিয়ে এসে ডাকছে—অ নিশি, নিশি রে!

কি হলো পিসি, কী হয়েছে? ওরা সব অমন করছে কেন?

যা, এক্ষুণি চান করে বাবার থানে গড়া খেয়ে আয় এলোচুলে।

কেন পিসি, কেন?

ওরে মুখপুড়ী, বাবা তোকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন রে!

নিশি ছুটে এসে বিনোদিনীর কাঁধে ঝাঁকুনি দিল—কি হয়েছে, কি হয়েছে পিসি?

কি হয়েছে, তা মোহন এসে বলল। সে টাটের সামনে এসে পর্দা তুলে গুঁজে দিল ওপরে। তারপর একগাল হেসে খবরটা বলল।

ফেউ ডাকলে লোকে টের পায়, কাছেপিঠেই বাঘ আছে। রাতে ফেউ ডেকেছিল শিবপুরে। লোকে টের পেয়েছিল, বাঘ এসেছে। তারপর—

তারপর আর কি! ছেলেবুড়ো যুবা-যুবতী সবাই মিলে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছিল বাঘটাকে। যে যা পেয়েছিল হাতে, দা বঁটি কাস্তে কুড়ুল সড়কী বল্লম ইচ্ছেমত ঝেড়েছিল। তবু পাপিষ্ঠের মরণ নেই। বলে—জল, একটু জল—

তখন এক যুবা তার মুখে পেচ্ছাপ করে দিয়েছে। তারিণী মুখুজ্জের দায়-দায়িত্ব কাঁধ থেকে খালাস করেছে শিবপুর। কিন্তু সেখানে কি করতে গেল পাষণ্ডটা? নাকি উদো পাকড়াশীকে খুন করতে? তাহলে তারিণীর বৌকে রাতদুপুরে জাগাল কেন? উদো পাকড়াশী বলেছে, ও বাবা বনের জন্তু, কখন কার মাথায় থাবা দেয়, ঠিক নেই। আপদ গেল। তারিণী মুখুজ্জে আর শিবপুরে কোনদিন জন্মাবে বলে মনে হয় না, কালের লক্ষণ এই রকমই দেখা যাচ্ছে। সুতরাং মিছেমিছি ঘরে ডাককুত্তা পুষে লাভ নেই।···কিন্তু কি আশ্চর্য! আচমকা রাতদুপুরে তারিণীর বৌকে ডেকে কি কথা বলতে চেয়েছিল গোবরা? রহস্যটা বোঝা যায় না। নাঃ, হারামজাদা আত্মহত্যার পথটা বেছে নিয়েছিল ভালো।

অ নিশি, চান করে আয় বাছা···বিনোদিনী হাসিমুখে বলল, যাক্, এবার আর তোর ভয়ডর থাকছে না—বেড়া না ঘুরে যেখানে খুশী! এরপর যাবো ময়নাহাটের মেলা, তারপর বামনাবাদ, তারপরে পাঁচগুঁড়ী, বর্ষায় নশীপুরে ঝুলনের মেলা··

দোকানের পেছনে এসে দাঁড়াল নিশি। বেণীবাঁধা চুল খুলতে থাকল। লাল ফিতেটা খুলে আঙুলে জড়াল! গোবরা বলত, ওটা আমার চোখে খচখচ করে বেঁধে। দোহাই নিশি, ওটা পরোনা। অথচ নিশি কোনদিনই ফেলেনি। গোবরা এলে তাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে বেণী খুলেছে কবরী থেকে। নিশি!

আর কে! মোহন, লেবুতলার মোহন।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল শুধু। কথা বলল না নিশি।

কাজটা ভালো করিনি? তোমাকে কেমন বাঁচিয়ে দিয়েছি, বলো। শালার পেছন পেছন ঠিকই হাজির হয়েছিলাম। দেখি, কোথা যায়।

সরে এল নিশি। মেলার প্রাঙ্গনে উদ্দাম হল্লা। তার দিকে তাকিয়ে ওরা হাসছে। বেঁচে গেছে মেয়েটা, কালের গ্রাস থেকে বড্ড বেঁচে গেছে।

মন্দির প্রাঙ্গণ পেরিয়ে সেই ভাঙা ঘরটার কাছে এল সে। দেখল, মহাদেব ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছে ভেতরে। স্তব্ধ, হতবাক, পাষাণের মতো দাঁড়িয়ে শূন্য তক্তপোষটা দেখছে। কী খুঁজছে? চোখের জলে গাল ভেসে যাচ্ছে লোকটার!

নিশি নিঃশব্দে ফিরল। মানুষ মলে কাঁদবার লোক থাকেই; কেউ না কেউ থাকে। কিন্তু অমন করে মরবার জন্য যে সে চলে যাচ্ছে, হতভাগিনী নিশি কেন বুঝতে পারেনি তখন! জানলে—নাঃ, জানতে তো চায়নি।

বিনোদিনী সেজেছে। ধবধবে সাদা থান পরনে। ও নিশি, চান না করেই চুল বাঁধছিস যে?

নিশি চুল বাঁধল। প্যাঁটরা গোছাল। তারপর প্যাঁটরাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। মুখ নীচু করে রইল কিছুক্ষণ। অন্ধকারের সঙ্গে আলোর ভালোবাসা কি এমনি? আলো কি অন্ধকারকে এমনি করে হারিয়ে দেয়? নাকি আলোর কামনাতুর রাহুর আহ্বান থেকে সরে আলোকেই হারিয়ে দেয় সে?

কি হল রে, কোথায় যাচ্ছিস?

ভুবনপুর।

নিশি! ক্রুদ্ধ চিৎকার করে উঠল বিনোদিনী। তারপরই অবাক হলো। দ্রুত এগোল ভাইঝির দিকে। অ পোড়ারমুখি, তুই কাঁদছিস! কেন কাঁদছিস?

নিশি পা বাড়াল। বিনোদিনী কাঠ হয়ে টাটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মেলাশুদ্ধ লোক হাঁ করে দেখছে। আর দেখছে মোহন, লেবুতলার সেই মোহন। স্তব্ধ হতবাক! দেখছে, নিশি মেলা পেরিয়ে যাচ্ছে ধীর শান্ত পায়ে।

আর সেই সময় ত্রাণকর্তা রুদ্রদেবের বটের শাখায় কোত্থেকে অশান্ত হাওয়া এসেছে দাপিয়ে।

চৈত্রের হলুদ পাতার রাশি নিশির দেহের ওপর চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে— ঝর ঝর সর সর খর খর। যেন ঝরার মুহূর্তে একটা চাপা নিশ্বাসিত অস্ফুট সংলাপ শেষবারের মত উচ্চারিত হয়ে চলেছে চলার পথের চারদিক থেকে—ও নিশি, জেগে থাকবে তো!